বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা

প্রথম খণ্ড : আদি ও মধ্য যুগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি.-এইচ. ডি.

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা ৭০০ ০০৭

তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকা

তৃতীয় সংস্করণে বইখানিকে এম, এ শ্রেণীর ছাত্র ও বিশেষজ্ঞ পাঠক গোষ্ঠীর পক্ষে অধিকতর উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে উহাতে তিনটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। প্রথমটিতে দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রন্থ সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রতি বাংলা—সম্পর্কিত ভাষায় রচিত হইয়া বাঙালীর মানস রুচি ও সাহিত্য সাধনার পরোক্ষ পরিচয় বহন করে তাহাদের আলোচনা করা ও বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ধারার সহিত সংযোগসূত্র দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক মনোভাবের প্রথম পদধ্বনি লক্ষ্য করার প্রয়াস হইয়াছে। তৃতীয়টিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও ভাবধারার প্রভাবটি অনুসরণ ও পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা গিয়াছে। আশা করা যায় এই সংযোজনার ফলে গ্রন্থটির অপূর্ণতা আরও কিছুটা দূর হইবে। গ্রন্থটির আরও উন্নয়নের জন্য অধ্যাপক মণ্ডলীর সাহিত্যানুরাগীদের সমস্ত সঙ্গত প্রস্তাবই কৃতজ্ঞচিত্তে গৃহীত হইবে। ইতি

বিনীত

১লা জুলাই, ১৯৬৭

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকা

আমার 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা'র পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসারে তৃতীয় বার্ষিক ডিগ্রি কোর্সের আবশ্যিক (Compulsory) বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাংলা সাহিত্যের কেবল আধুনিক যুগ নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য আমার বইখানি তিনখণ্ডে বিভক্ত হইয়া বাহির হইল। প্রথম খণ্ড—**আদি ও মধ্যযুগ,** দ্বিতীয় খণ্ডে—**আধুনিক যুগ** এবং অনার্স-এর ছাত্র-ছাত্রী, এম. এ. ও বাংলা সাহিত্যের সাধারণ অনুরাগী পাঠকের জন্য সমগ্র বইখানি **স্বতন্ত্রভাবে** মুদ্রিত হইয়াছে। আশা করি এইরূপ ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠকই অতিরিক্ত ব্যয়ভার হইতে মুক্ত হইবেন। আদি ও মধ্যযুগ বিষয়ক খণ্ডটি সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে পুনর্লিখিত হইয়াছে এবং আধুনিক যুগবিষয়ক খণ্ড পরিবর্ধিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি সুধীজনের ও অধ্যাপকমণ্ডলীর স্বীকৃতি ও অনুমোদনলাভে ধন্য হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে উহার আরও উন্নতিবিধানের ইচ্ছা রহিল। এ সম্বন্ধে সুধীজনের উপদেশ-নির্দেশ সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি

বিনীত

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১, সাদার্ন এভিনিউ

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা'—বইখানি প্রথমে উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসারে পরিকল্পিত হয়; দুই-একটি অধ্যায় লেখা হইবার পরে দেখা গেল যে, স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে গেলে ইতিহাস যদি বা থাকে, সাহিত্যরসকে প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিতে হয়। সাহিত্যের অন্তরে যুগে যুগে যে ভাব-ভাবনা ক্রিয়াশীল, তাহাদিগকে হয়ত পারম্পর্য-সূত্রে গাঁথিয়া, পরিবর্তন-ক্রমের সহিত অন্বিত করিয়া ইতিহাস-ধারার অঙ্গীভূত করা যাইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-কৃতির সহিত প্রত্যক্ষসম্পর্কবর্জিত হইলে এই ইতিহাস-বিন্যাস-প্রয়াস একটা নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতাবোধেরই সৃষ্টি করিবে এইরূপ আশঙ্কা হয়। এইজন্যই গ্রন্থখানি প্রথম পরিকল্পনা অনুযায়ী শেষ করিতে পারিলাম না। প্রথম খণ্ড কোনমতে সারিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে আসিয়া আমার বিবেক-বুদ্ধি ও ঔচিত্যবোধ সাফ জবাব দিয়া বসিল। আধুনিক যুগে আসিয়া গ্রন্থখানি কাজে কাজেই আর স্কুলপাঠ্য পুস্তক থাকিল না, অপেক্ষাকৃত পরিণত সাহিত্যবিচারমূলক গ্রন্থের পর্যায়ে পড়িয়া গেল। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে পরিকল্পনা ও মানের (standard) দিক দিয়া একটা অসামঞ্জস্য রহিয়া গেল। আগামী সংস্করণে এই ত্রুটিসংশোধনের ইচ্ছা রহিল। আপাতত এই অপূর্ণতার জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

সাধারণতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কোন সুনির্দিষ্ট সাহিত্যিক আদর্শ-অবলম্বনে লেখা হয় না। ইহা হয় তথ্যপঞ্জীসংকলন নয়ত সমাজচেতনা-প্রসূত ভাবাদর্শের রেখাঙ্কনের রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে সাহিত্যের আনুষঙ্গিক তথ্য ও তত্ত্বই প্রধান হইয়া বিশুদ্ধ সাহিত্যরসাস্বাদন গৌণ হইয়া পড়ে। হয়ত মৌলিকতাহীন, প্রথাবদ্ধ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে কবির বৈশিষ্ট্য গোষ্ঠীচেতনার সর্বগ্রাসী প্রভাবে প্রায় অবলুপ্তই থাকে; সাধারণ লক্ষণ ও প্রথানুবর্তন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে আবৃত করিয়াই রাখে। তথাপি মনে হয় যে, এখন সাহিত্যের ইতিহাস নূতন প্রণালী ও দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখার সময় আসিয়াছে। এ বিষয়ে যাঁহারা নূতন তথ্য ও উপাদান আবিষ্কার করিয়া, নূতন নূতন গ্রন্থের পরিচয় দিয়া, সাহিত্যসৃষ্টির পিছনকার তত্ত্বসম্ভারের সন্ধান দিয়া পথিকৃতের কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া ও তাঁহাদের অসাধারণ কৃতিত্বের

যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়া নূতন ভাবে আলোচনার সূচনা করা বিধেয়। হয়ত একের চেষ্টায় এই সুবৃহৎ কাজ সম্পন্ন হইবার নহে—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসের ন্যায় এই দুরূহ কার্য-সম্পাদনে বহু পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে। এইরূপ একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পরিকল্পনা-রচনা অদূর ভবিষ্যতের একটি অবশ্যকর্তব্য কার্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। আমার বইখানি এই নূতন রীতি-প্রতিষ্ঠার একটা অক্ষম, অসম্পূর্ণ প্রয়াস বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থরচনায় যাহাদের কাছ হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে স্নেহাস্পদ শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী ও ডাঃ শ্রীহরিপদ চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহারা আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বাংলা সাহিত্যের একটি পূর্ণতর ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা আছে। জানি না এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইবে কিনা। যদি আমার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন না-ও হয়, তবে যাঁহারা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান ও অনুরাগ উভয়েরই অধিকারী তাঁহাদিগকে এই ভারগ্রহণের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

এই গ্রন্থের উন্নতিসাধনের জন্য অধ্যাপকমণ্ডলী ও সাহিত্যানুরাগী সকলের নিকটই প্রার্থনা করিতেছি। এই নির্দেশ অনুসরণে হয়ত বর্তমান সংস্করণের ত্রুটি-অপূর্ণতা কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হইতে পারে।

৩১, সাদার্ন এভিনিউ
কলিকাতা ২৯
বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৯৫৯

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড : আদি ও মধ্যযুগ

বিষয় — পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় : বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিভিন্ন যুগে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ ১-১২

প্রাগার্য উপাদান—আর্য প্রভাবের তিনটি ধারা—(১) প্রথম, খ্রীঃ পূঃ ১০ম-৯ম শতক—(২) দ্বিতীয়, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ-৭ম শতক—(৩) তৃতীয় খ্রীঃ পূঃ ৩য়-২য় শতক—(৪) বিমিশ্র প্রাকৃত খ্রীঃ পূঃ ৩য়-২য় হইতে খ্রীঃ অঃ ৪র্থ শতক ও খ্রীঃ অঃ ৪র্থ হইতে ৮ম শতক—(৫) অপভ্রংশ (খ্রীঃ ৮ম—১২শ)—(৬) নব্য ভারতীয় আর্য ভাষারূপে পূর্ব-ভাষার উদ্ভব (খ্রীঃ ১২শ—১৪শ শতক)—বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিশিষ্ট লক্ষণ—আদিযুগ—মধ্যযুগ : বিশিষ্ট লক্ষণ—বাংলায় ব্রজবুলি সাহিত্য—আধুনিক যুগ—নূতন শব্দ গঠন ও বিদেশীয় প্রভাব—বাংলা শব্দের শ্রেণীবিভাগ—তৎসম ও তদ্ভব শব্দ—বিদেশী শব্দ—বাংলা উপভাষা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : চর্যাপদের সমকালীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্ট রচনাবলী ... ১৩-৩০

নূতন তত্ত্বসন্ধানের গুরুত্ব—(ক) **সংস্কৃত**—প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষা—প্রাকৃত—সংস্কৃত-চর্চা আরম্ভ—জয়দেবপূর্ব কৃষ্ণকথা—শিলালিপি ও রাজপ্রশস্তি—খণ্ডকাব্যের প্রসার—সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত—সদুক্তিকর্ণামৃত—অমরপ্রবাহ—প্রকীর্ণ কবিতায় রাধাকৃষ্ণপ্রেম—শৃঙ্গারপ্রবাহ—প্রেমধারণার ক্রমশুদ্ধিসাধন—জীবননিষ্ঠার নিদর্শন—আর্য সপ্তশতী—পবনদূত ও গীতগোবিন্দ—লক্ষ্মণসেনের রাজধানীর রুচিশিথিলতা—(খ) **প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্ট সাহিত্য**—বাঙালী অন্তরের প্রাকৃত-প্রবাহ—গাথাসপ্তশতী—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বাভাস—

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রাকৃতে বস্তুরসস্ফূরণ-নিদর্শন—অবহট্ট—প্রাকৃতপৈঙ্গলের গুরুত্ব—প্রাকৃতপৈঙ্গলের রচনাবৈশিষ্ট্য—প্রাকৃতপৈঙ্গলে কৃষ্ণকথা—ঐশ্বর্যমাধুর্যের সমন্বয়—প্রাকৃতুর্কী যুগের নিদর্শন—রচনার ঐতিহাসিক পটভূমি—যুদ্ধাদি বর্ণনার চিত্র।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ চর্যাপদ ৩১-৩৬

বাংলা ভাষার আদিম রূপঃ সহজবাদের কাব্য-প্রয়োগ—সন্ধ্যা ভাষা—নিম্নতম সমাজের পরিচয় ও প্রাধান্য—শব্দ-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য—চর্যাপদে প্রযুক্ত প্রবচন—চর্যাপদে বাঙলা দেশ ও বাঙালীর পরিচয়—চর্যাপদের কাব্যোৎকর্ষ।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ... ৩৭-৪৯

বড়ু চণ্ডীদাস—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পটভূমি

তুর্কী-আক্রমণে বাঙালী-জীবনের বহুমুখী বিপর্যয়—তুর্কী-আমলে সংস্কৃত-অনুশীলন—হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রতিযোগিতা—এই দুই যুগের সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কারে হিন্দুর আত্মরক্ষার নানা প্রচেষ্টা—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনার কাল—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী—পৌরাণিক ও গৌড়ীয় রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর সহিত পার্থক্য—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ও কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যোৎকর্ষ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমা—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও ছন্দ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নূতন আখ্যান ও আধ্যাত্মিকতা—**বিদ্যাপতি**—বিদ্যাপতির কাল—ব্রজবুলি—বাংলা সাহিত্য ও বিদ্যাপতি—বিদ্যাপতির বহুমুখী প্রতিভা ও রচনাবৈচিত্র্য বৈষ্ণব পদাবলী ও বিদ্যাপতি—বিদ্যাপতির মৌলিক ভাবকল্পনা-বিদ্যাপতির বিরহ ও ভাবসম্মিলনের পদ—বিদ্যাপতির প্রেমের আদর্শ ও ক্রমবিকাশ—বিদ্যাপতির সার্বভৌম ধর্মচেতনা—বিদ্যাপতির খাঁটি পদ বিচার—ক্রান্তদর্শী কবি বিদ্যাপতি।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ মঙ্গলকাব্য ৫০-৮২

মঙ্গলকাব্যের আদি ভাব-প্রেরণা—মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী—মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি—মঙ্গলকাব্যে স্ত্রী-দেবতার

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রাধান্যের তাৎপর্য—মঙ্গলকাব্যে বণিক ও নিম্নশ্রেণীর প্রাধান্য—মঙ্গলকাব্য সৃষ্টিতে উচ্চশ্রেণীর আগ্রহ—বাঙালীর ভক্তিময় মানসিকতা—মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর উদ্ভব-রহস্য—চণ্ডীর উদ্ভব-রহস্য—মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি-কাল—মঙ্গলকাব্যের পট-ভূমিতে সমাজমন—ধর্মাদর্শের অধোগামিতার কারণ—ধর্ম-ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য—চণ্ডীদেবী-র কল্পনায় ক্রমবিবর্তন—মনসা-চরিত্র-কল্পনার সমাজমনের ভয়ার্ত রূপ—মঙ্গলকাব্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের আভাস—মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ—মঙ্গলকাব্যে সমাজমনের ছবি—(ক) **ধর্মমঙ্গল কাব্য**—পূজা-নিস্পৃহ প্রাচীন মিশ্রদেবতা ধর্মঠাকুর—ধর্মপূজার সার্বজনীন রূপ ও অলৌকিক বিশ্বাস—ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিকত্ব—ধর্মমঙ্গলে রাঢ়ের জনজীবনের প্রতিচ্ছবি—প্রাচীনতম বিষয়বস্তুর অত্যাধুনিক কাব্যরূপতার হেতু—ধর্মমঙ্গলের কবিগোষ্ঠী—ঘনরাম—(খ) **মনসামঙ্গল**—মনসামঙ্গল প্রাচীনতর রচনা—মনসা-মঙ্গলের আদিরূপ ও কাল—আদি কবি হরিদত্ত—হরিদত্তের পাঁচালির ত্রুটি—হরিদত্তের কাব্যের সম্ভাব্য রূপ—নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্ত—নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের তুলনা—বংশীদাস—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ—জগজ্জীবন ঘোষাল—মনসামঙ্গলের ফলশ্রুতি—মনসামঙ্গলের মানবিক আবেদন (গ) **চণ্ডীমঙ্গল**—চণ্ডীর বিচিত্র রূপ ও রূপান্তর—চণ্ডীমঙ্গলে মানবিকতা—চণ্ডীমঙ্গলে জীবন্ত সমাজ—চণ্ডীমঙ্গলে প্রাণবন্ত চরিত্র—চণ্ডীমঙ্গল-রচনায় মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিযুগল—চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি—চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিযুগল—দ্বিজ মাধব—মুকুন্দরাম—অভয়ামঙ্গল—চণ্ডীর নানা নাম—(ঘ) **শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য**—শিব ও মঙ্গলকাব্য—শিবায়নের প্রবর্তক কবি—রামেশ্বরের শিবায়ন—মঙ্গলকাব্যের কৃত্রিম সম্প্রসারণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ রামায়ণ ও মহাভারত ... ৮৩-৯১

রামায়ণ—কৃত্তিবাস—কৃত্তিবাসের কালবিচার—কৃত্তিবাসের চৈতন্যপূর্বতা বিচার—কৃত্তিবাসের ভাষা—কৃত্তিবাসের বাঙালী

বিষয় — পৃষ্ঠা

দৃষ্টি—অন্যান্য কবি—**মহাভারত**—মহাভারতের কবি—মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক—রামায়ণ ও মহাভারত—কৃত্তিবাস ও কাশীরাম—রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্র তুলনা—রামায়ণে গার্হস্থ্যরস—মহাভারতে রাষ্ট্রীয় সংঘাত—কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের রচনারীতির পার্থক্য।

সপ্তম অধ্যায়ঃ শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী … ৯২-১০৯

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার তত্ত্বকথা ও পীঠভূমি—শ্রীচৈতন্য-জীবন বাঙালীর বহুমুখী আত্মপ্রকাশের অক্ষয় উৎস—শ্রীচৈতন্যের জীবনকথাঃ কৈশোর-লীলা—মধ্য-লীলা ও সন্ন্যাস-গ্রহণ—অন্ত্যলীলা—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব—চৈতন্য-ধর্মের সংগঠকমণ্ডলী—ষড়্‌ গোস্বামী ও বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা—**জীবনী কাব্য ও কৃষ্ণমঙ্গল**—ভাগবতের অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণবিজয়—চৈতন্য-জীবনীতে ঐতিহাসিক সত্য-নির্দেশ—সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্য-জীবনী—চৈতন্যভাগবত—চৈতন্যমঙ্গল—গোবিন্দদাসের কড়চার ঐতিহাসিকতা—চৈতন্য-চরিতামৃত—চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর দেবমূর্তি—লোচন-দাসের সহজ মানবীয়তা—কৃষ্ণদাসে দার্শনিকতা ও অধ্যাত্ম তত্ত্ব—**চৈতন্যোত্তর ভাগবত-কাহিনী**—ভাগবতের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য—শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা—ঐশ্বর্য-বর্ণনা—মাধুর্য-লীলা—অনুবাদে স্বাধীন কল্পনা—চৈতন্য-লীলায় প্রভাব—সংস্কৃতির ত্রিবেণী-ধারা।

অষ্টম অধ্যায়ঃ বৈষ্ণব পদাবলী … ১১০—১১৮

পদাবলী-সাহিত্য—বিদ্যাপতি ও চৈতন্যোত্তর পদাবলী—গৌরচন্দ্রিকা—বাঙালী জীবনের বিশুদ্ধ কাব্যময় প্রকাশ পদাবলী—চৈতন্যের সমসাময়িক পদকর্তাগণ—চৈতন্যোত্তর পদাবলীর মূলতত্ত্ব—চৈতন্যোত্তর শ্রেষ্ঠ পদকর্তাগণ-তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি—গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস—জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস—পদাবলী সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ ও সংকলন-গ্রন্থ-

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রকাশ—দীন চণ্ডীদাস—মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ—বৈষ্ণব পদের সৌন্দর্য ও গৌরব—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা ও বৈষ্ণব পদ।

নবম অধ্যায়ঃ শাক্ত পদাবলী ১১৯—১২৮

মোগল আমলের শান্তিময় পরিবেশ ও বৈষ্ণব সাহিত্য—রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে শক্তি-সাধনার প্রবণতা—অন্তরজীবনে—মাতৃ-তন্ত্রের প্রাধান্য—শাক্ত পদাবলীর উৎস—তন্ত্রের ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রভাব—শাক্ত পদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলী—রামপ্রসাদ—অন্যান্য শাক্তকবি—শাক্ত পদাবলীতে জীবননিষ্ঠা—প্রার্থনা-পদে আত্মপ্রত্যয় রূপবর্ণনায় গতানুগতিকতা——গঠন-সংকেত ও রূপকপ্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য—বৈষ্ণব কবিতায় সম্প্রদায়গত আবেগ, শাক্ত কবিতায় ব্যক্তিগত আবেদন—আগমনী ও বিজয়ার চমৎকারিত্ব ও ক্ষণস্থায়িত্ব।

দশম অধ্যায়ঃ বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গীত ১২৯—১৩৩

লোকসঙ্গীতের উৎস ও পরিচয়—বাউল গান—বাউল গানের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও কাব্যোৎকর্ষ—কবিগান—পাঁচালি—দাশরথির বৈশিষ্ট্য।

একাদশ অধ্যায়ঃ নাথ-সাহিত্য ১৩৪—১৪১

নাথ-সাহিত্যের উৎস ও স্বরূপ—নাথ-সাহিত্যের কাহিনীদ্বয়—হিন্দুধর্মাদর্শ ও নাথ-সাহিত্য—গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন—গোরক্ষবিজয়ের আদি কবি ও রচনাকাল—গোরক্ষবিজয়ে তত্ত্বোপদেশ প্রাধান্য—গোরক্ষবিজয়ে মানবিকতা—বাঙালীর প্রকৃতিজাত গৃহপ্রীতি—ময়নামতীর গানের সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা—গোপীচন্দ্র পালার লৌকিক রূপ—গোপীচন্দ্রের গানের কবিগোষ্ঠী ও কাব্যমূল্য—আদিম জীবনবোধের বিস্ময়কর কাব্যরূপ।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ আরাকানের মুসলমান কবিগোষ্ঠী ১৪২—১৫৬

মুসলমান পৃষ্ঠপোষণায় হিন্দুকবিদের কাব্যরচনায় স্বাধীনতা—আরাকানে বাংলাচর্চার পটভূমি—পৃষ্ঠপোষকদ্বয়ের রচিত কাব্য-

বিষয় পৃষ্ঠা

বৈশিষ্ট্য—পৃষ্ঠপোষকদ্বয় ও কবিযুগলের ব্যক্তি-পরিচয়—রোসাঙ্গ রাজসভায় প্রভূত বঙ্গসাহিত্য-প্রীতি—আলাওলের বিচিত্রজীবন—সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্য—লোর-চন্দ্রানীর প্রারম্ভিক প্রশস্তি—চন্দ্রানীর ব্যর্থ দাম্পত্য জীবন—লোর ও চন্দ্রানীর মিলন—বামনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও মৃত্যু—চন্দ্রানীর মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভ—ময়নাবতী ও রতনা—বৈষ্ণব প্রভাব—মনন-স্বাতন্ত্র্য—লোর-চন্দ্রানীর শেষ অধ্যায় ও আলাওল—দৌলত কাজীর কবি-কল্পনাবৈশিষ্ট্য—আলাওলের অসাম্প্রদায়িক মিলনাকৃতি—আলাওলে অধ্যাত্মরস—আত্মবিলোপের সাধনা—কবির ভূয়োদর্শন—অন্যান্য রচনার প্রচার গুরুত্ব।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ ময়মনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ১৫৭—১৬৬

গীতিকাগুলি লোকসাহিত্য না আধুনিক রচনা—রূপকথা-ধর্মী সাহিত্যের গুরুত্ব—গীতিকায় ধর্মনিরপেক্ষ জীবন ও সমাজ-চিত্র—স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দাম প্রণয়াবেগ—প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের একাত্মতা—রূপ-বর্ণনায় প্রকৃতি-প্রাণতা—প্রেমাকৃতির সার্থক প্রয়োগ—বৈষ্ণব পদের সমধর্মী—প্রেমের বিচিত্র চিত্র—বিশুদ্ধ প্রকৃতি-চিত্র—মৌলিক শব্দসম্ভার—অকপট জীবনবোধের কাব্যচিত্র—গীতিকাদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য ও মূল্য।

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ ভারতচন্দ্র ১৬৭-১৭৮

চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলের পার্থক্য—কাহিনী—অন্নদামঙ্গলের কবি—চণ্ডীদেবীর অন্নদামূর্তিতে বিবর্তন—কাহিনী-বিন্যাসে পূর্বানুসৃতি ও স্বকীয়তা—কাশীখণ্ডের অনুসরণ ও অন্নপূর্ণা-মূর্তি—ব্যাস-চরিত্রে ধর্মবিরোধের আভাস—ভারতচন্দ্রে অলৌকিক দৈব-মহিমা ঘোষণার অসুবিধা ও অবিশ্বাসযোগ্যতা—বিদ্যা-সুন্দর-কাহিনীর অন্তর্ভুক্তি অপ্রাসঙ্গিক—অন্নপূর্ণা রূপকল্পনায় যুগপ্রয়োজনপ্রেরণা—ভারতচন্দ্রের রীতি মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্য-বিরোধী—বাহ্যরীতির অনুকরণ ও দেব চরিত্রের দুর্গতি—

বিষয় পৃষ্ঠা

কৌতুক ও হাস্যরস—স্থূল কুরুচি ও অনন্যসাধারণ শিল্পকৃতি—প্রথাজীর্ণ উপমান-প্রয়োগে মৌলিকতা—অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য—ভাবোপযোগী ধ্বনিময় শব্দের প্রয়োগ-দক্ষতা—ভাবগভীরতা ও কল্পনা-সমুন্নতির অভাব—কুরুচি ও অশ্লীলতা ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত নহে, যুগগত ত্রুটি।

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ অষ্টাদশ শতকে আধুনিকতার পূর্বলক্ষণ · ১৭৯-১৯৫

অষ্টাদশ শতকের ইংরাজি সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠা—সর্বপ্রকার অসাধারণত্বের প্রতি প্রতিকূল—ফরাসী বিপ্লব ও ইউরোপীয় রোমান্টিকতার সূচনা—যুক্তিবাদের পুনরাবর্তন—অষ্টাদশ শতকের বাংলার সামাজিক পটভূমি—কৃষ্ণচন্দ্রের কাল ও দেবনির্ভরতায় সংশয়—প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা—যুগশক্তির প্রভাব ও দেশের নব-অদৃষ্ট—রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ে আধুনিকতার উপাদান—বিশৃঙ্খল সূচনা—বেনিয়া-সংস্কৃতির সংস্পর্শ—সাহিত্যে অতীতের অনুবর্তন—ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা—যুগপ্রভাবে চণ্ডীদেবীর চরিত্রগত পরিবর্তন—ভারতচন্দ্রের ইতিহাসবোধ—ব্যঙ্গ ও শ্লেষ প্রয়োগে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র—রামপ্রসাদের সূক্ষ্ম মানসনির্যাস—গঙ্গারামের বিস্ময়কর ঐতিহাসিকবোধ—ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংযোগ—পুরাণ ও ইতিহাসের পরস্পরসাপেক্ষতা।

ষোড়শ অধ্যায়ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ১৯৫-২১৬

পাশ্চাত্য প্রভাবের ক্রমবিবর্তন—প্রথম যুগের গদ্যচর্চা—রামমোহনের ধর্মচেতনায় পাশ্চাত্য আদর্শ—হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও বাঙালী চিত্তে উহার প্রভাব—ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল—মধুসূদনের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের সমীকরণ—নাট্য-সাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাব—নাট্যকার মধুসূদন—পরবর্তী নাট্যধারা—মধুসূদনের কাব্যপরিকল্পনায় পাশ্চাত্য প্রভাব—

বিষয় | পৃষ্ঠা

মহাকাব্যের আদর্শ—প্রাচীন ও আধুনিক মহাকাব্যের তুলনা—আধুনিক মহাকাব্যে মধুসূদন—মধুসূদনের অন্যান্য কাব্য—মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাশ্চাত্য প্রভাব—বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস—বঙ্কিমচন্দ্রের গার্হস্থ্য উপন্যাস—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবকল্পনায় পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতিক্রিয়া—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ—প্রাচ্য-প্রতীচ্য ভাবদৃষ্টির সমন্বয়—রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক প্রভাবের স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস—আধুনিক বাংলা সাহিত্য—আন্তর্জাতিক—ভাববস্তু গ্রহণের উপায়—সাম্প্রতিক বৈদেশিক প্রভাব-গ্রহণের অন্তরায়—আধুনিক সাহিত্যের স্বভাব।

আদর্শ প্রশ্নাবলী ২১৭-২২৩

কাব্য-সঞ্চয়ন ঃ আদি-মধ্যযুগ ... ২২৫-৩২০

চর্যাগীতি - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বিদ্যাপতির পদাবলী—চণ্ডীদাসের পদাবলী—গোবিন্দদাসের পদাবলী—জ্ঞানদাসের পদাবলী—রামায়ণ—মহাভারত—ভাগবত—মনসামঙ্গল— চণ্ডীমঙ্গল—ধর্মমঙ্গল— অন্নদামঙ্গল— শিবায়ন— শ্রীচৈতন্যভাগবত— শ্রীচৈতন্যমঙ্গল —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—গোপীচন্দ্রের পাঁচালি—গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস—আরাকানের মুসলমান কবির কাব্য—পূর্ববঙ্গগীতিকা—পাঁচালি—কবিগান—বাউল গান।

শব্দসূচী ৩২৫

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিভিন্ন যুগে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ

১

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে "অ-নাস," "খর্ব" ও কৃষ্ণকায় জাতি দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ আরও দক্ষিণে সঞ্চরণ করিতে করিতে ভারতের পূর্বভাগ হইতে সুদূর অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারই নাম হয় অস্ট্রিক জাতি। ইহারই ভারতস্থিত শাখার নাম কোল বা মুণ্ডা। ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে আবার ইহার নাম প্রাগ্-দ্রাবিড়-প্রাগার্য জাতি। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে ভারতের পূর্বদিকের প্রদেশগুলিতে প্রাচীন আর্যভাষার অনুপ্রবেশের পূর্বে এই কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীর নানা উপভাষা প্রচলিত ছিল। এখনকার বাঙলাদেশ তখন যে-সকল অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, সেই অঞ্চলগুলি সেই নামের উপভাষার প্রচলন-ক্ষেত্র ছিল। এই আঞ্চলিক নামগুলি ছিল—"রাঢ়, গৌড়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ" ও "ডবাক" ইত্যাদি। আর্যগণ ইহাদের "দাস, দস্যু, নিষাদ" প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে আবার ইহাদের "ব্রাত্য" ও "ব্রাত্যক্ষত্রিয়" আখ্যাও হইয়াছিল।

প্রাগার্য উপাদান

১। বাংলা ভাষা নবীন ভারতীয় আর্য-ভাষা হইলেও ইহার শতকরা চুয়াল্লিশটি শব্দ এই কোল বা মুণ্ডা-গোষ্ঠীর। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে নব্যভারতীয় আর্যভাষার পূর্ব-শাখায়, বিশেষভাবে বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়ায় প্রাগ্-দ্রাবিড়-প্রাগার্য উপাদান প্রচুর। চলিত-বাংলায় বধির বুঝাইতে "কালা," একচক্ষু বুঝাইতে "কানা," অলস বুঝাইতে "কুঁড়ে," বাক্‌শক্তিরহিত বুঝাইতে "হাবা", "বোবা," ("গুঙ্গা"), খঞ্জ বুঝাইতে "খোঁড়া" (লেঙড়া), 'পর্যুসিত' বুঝাইতে "বাসি" প্রভৃতি শব্দ অতি পরিচিত। ইহাদের প্রতিশব্দ বা প্রতিরূপও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবিষ্ট উপজাতীয় বিভিন্ন উপভাষায় উপলব্ধ হইয়া থাকে। বাঙালীর

প্রাত্যহিক জীবনের ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার, সমাজ-ও সংস্কৃতি-বাচক বহু শব্দই মূলতঃ এই ভাষাগোষ্ঠীর। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কিছু শব্দ, ধাতু ও প্রত্যয়াদির উল্লেখ করা যাইতেছে—

[ক] বিশেষ্য শব্দ—তম্+বল>তাম্বুল, কলা, কদলী, ডাব, বাঁশ, জঙ্গল, জাঙ্গাল, জাং, ডাগর, ডাক, ডানা, ডাল, চাল, গণ্ডা, বুড়ি, টাকা, ডোবা, খোকা, খুকী, টাট, ঠোঙা, ঝুড়ি, ঝাঁকা,, ঝুল, ঝুলি, আড়া, আড়ি, মাল ইত্যাদি।

[খ] ধাতু—√টল্, √ডুব্, √পার্, √শুদ্>শুধ্, √টান্, √কাঁড়া, √ঝুল্, √ডাক, √টেক>টেঁক √টিক-টিঁক, √ঠেল ইত্যাদি।

[গ] প্রত্যয়[১]—উপসর্গ[২]—"নে"—নেতড়া, নেকড়া, নেকড়ে; "নি"—নিশুম্ভ, নিকষা; "আই—আঙ্গ"—আইমা, বড়াই—বঢ়াঙ্গ;—"আড়—আড়া"—আড়বাঁশী, আড়ক্ষেপা ইত্যাদি।

[ঘ] প্রত্যয়—অনুসর্গ[৩]—"টী—টি"—বধূটী>বউটী—বউড়ী, হাবাটি—হাউড়ী, দুহিতাটী>ঝী-আড়ী, শশ্রূটী<শ্বাশুড়ী—শাউড়ী, পিচ্ছোডিকা>পিচ্ছোডী>পিঁচুটি; "চী—চি"—বেঙাচি, শাকুচী, কচি, কঞ্চি, 'কুরুচি>গুলচী; "অরু—আরু"—গোরু, শজারু, সাঁতারু, সরু, বোমারু; "অড়া—আড়া"—হাবড়া, সোমড়া, নেতড়া; "অড়—আড়"—ভাঙ্গড়, খাদাড়, বাদাড়; "অর—অরা"—তোমরা, আমরা; "অক্—ওক"—দিব্বোক, রুদ্রোক, কুম্ভক, তোহ্মাক, আহ্মক>তোমাকে, আমাকে, "অল—আল"—দঙ্গল, জঙ্গল, বঙ্গাল ইত্যাদি।

[ঙ] শব্দের ও বাক্যের মাত্রা—"টা—টি"—ঘটিটা, বাটিটা; "না"—"বাঁধ না তরীখানি আমারি এ নদীকূলে।" (কুমুদরঞ্জন); "খন"—যাব'খন, দেব'খন ইত্যাদি।

কোল বা মুণ্ডা-গোষ্ঠীর শাখাগোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠী মন্-খের ভাষা-গোষ্ঠীর কিছু কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় রহিয়া গিয়াছে। কম্বল-এর কম্, তম্লুক্-এর তম্ অংশ; লুঙ্গি, তালৈ, আমুই ইত্যাদি শব্দ।

২। বাংলা ভাষায় তিব্বত-ব্রহ্মণ গোষ্ঠীর কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায়। এই শব্দগুলি "দার্জিলিঙ্, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ভোট, চটী, লামা" ইত্যাদি।

---

১ নূতন শব্দ গঠনের জন্য মূল শব্দের প্রতি যে-সমস্ত Particles বা খণ্ড-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাদিগকে ব্যাপক অর্থে **প্রত্যয়** বলা হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত যাহা যুক্ত হইয়া প্রাতিপদিক-গঠনের সহায়তা করে তাহাই **প্রত্যয়**। পাণিনির মতে প্রত্যয় পঞ্চবিধ, সুতরাং তাহার পঞ্চবিধ উপযোগিতা আছে।

২-৩ Pater Schmidt কর্তৃক ব্যবহৃত Prefix ও Postfix-এর অনুবাদ-রূপে যথাক্রমে 'উপসর্গ' ও 'অনুসর্গ' ব্যবহার করা হইয়াছে।

৩। বাংলা ভাষায় দ্রাবিড়-উপাদান খুব অল্প নহে। সংস্কৃতের মধ্য দিয়া ও প্রত্যক্ষভাবে দ্রাবিড়-বর্গের কয়েকটি ভাষার শব্দসমূহ বাংলা ভাষায় আসিয়া গিয়াছে। "মীন, নীর, মলয়, নারায়ণ, নারিকেল" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত হইয়া বাংলায় আসিয়াছে; আর, "উলু, কড়বা, পিলে, মোট, মুটিয়া" প্রভৃতি শব্দ প্রত্যক্ষ-ভাবে বাংলায় আসিয়া গিয়াছে। স্থানীয় নামের শেষে যে "জোল" (নাড়াজোল), "গুড়ি" (ময়নাগুড়ি), "ভিটা" (বালুভিটা>বাল হিটা>বালুটে), "কুণ্ড—কুণ্ডা" (সীতাকুণ্ড, মানকুণ্ড) প্রভৃতি দেখা যায়, সেগুলিও দ্রাবিড়ীয় ভাষা-গোষ্ঠীর।

২

৪। এইরূপ কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠী, দ্রাবিড়ীয় ও তিব্বত-ব্রহ্মণ-গোষ্ঠীর সহিত বিমিশ্র অবস্থায় খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম—৯ম শতকে আর্য দিগ্বিজয়-কারী ও উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের দ্বারা আর্য-ভাষা প্রথম বাঙলা দেশে আসে। মহাভারতের সভাপর্বে (৩০শ অধ্যায়) ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য-প্রভাবের তিনটি ধারা : (১) প্রথম খ্রীঃ পূঃ ১০ম—৯ম শতক

এই সময়কার আর্যভাবার (উদীচ্যার) প্রভাবের প্রমাণস্বরূপ পাই, "সুন্দরবন" (<স্মুন্দ্‌বন<সমুন্দরবন<সমুদ্রবন), "তমলুক" (<তমোলুক, তমুলুক<তম্মলক্ক<তম্মলপ্প<তম্মলপ্ত<তাম্বলিত্ত<তাম্রলিপ্ত), "পুণ্ড্র—পৌণ্ড্র-বর্ধন", "বঙ্গ," "একচাকা" (<একচক্রা) ইত্যাদি শব্দ। ইহাদের মধ্যে যে "বঙ্গ" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় উহা অঞ্চল বা প্রদেশ-বাচক। ঐতরেয় আরণ্যকেও প্রজা-অর্থে "বঙ্গা"[১] শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন "বগধ" শব্দ কালক্রমে "মগধ" হইয়াছিল। এইরূপ ধ্বনি-পরিবর্তনের কারণ প্রাগ্‌দ্রাবিড়-প্রাগার্য উপভাষায় অন্তঃস্থ বা অর্ধোচ্চারিত ম, ব (M, W)-এর অস্তিত্ব, অর্থাৎ ম ও ব-এর পার্থক্য ছিল অস্পষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক যুগে—এতদ্দেশের আদিম উপনিবেশ-স্থাপনকারী অস্ট্রিক জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতির নাম ছিল "ম্যঅঙ্"। আর্যভাষায় উক্ত "ম্যঅঙ্" শব্দটি "বঙ্গ" রূপ লইয়াছিল। "বঙ্গ" শব্দ প্রদেশ- বা- অঞ্চল-বাচক ছিল এবং প্রজা বা জন বুঝাইতে "বঙ্গাঃ" শব্দ

১ "ইমাঃ প্রজাঃহতিস্রঃ অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রঃ অত্যায়মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ"—ঐতরেয় আরণ্যক—২-১-১-৫।

ব্যবহৃত হইত। সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের শাসনকাল পর্যন্ত "বঙ্গ" শব্দ ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হইত। মুসলমান-রাজত্বকালে—আল+হ্=আলহ্ প্রত্যয়-যোগে "বঙ্গালা"<"বঙ্গালহ্" ও আল+ঈ=আলী প্রত্যয়-যোগে "বঙ্গালী" শব্দ দেশ ও জাতি বুঝাইতে ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইতে থাকে।[২] আধুনিক "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্গালী" শব্দ উহাদের বিস্তারিত রূপ। আর, বাঙলা, বাংলা, বাঙালী" আবার "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্গালী" শব্দের হ্রস্বরূপ।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ—পঞ্চম শতকে বাঙলায় আর্যভাষার দ্বিতীয় প্রবাহ আসিয়া লাগে। এই দ্বিতীয় প্রবাহ মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ—পঞ্চম শতকে পূর্ব ভারতে যে মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা প্রচলিত ছিল তাহাকে অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত বা আর্য-মাগধী প্রাকৃত বলা হয়। আয়রঙ্গসুত্ত হইতে জানা যায় যে মহাবীর জিন রাঢ়-সুহ্মে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে প্রব্রজ্যা ও ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন। তাঁহার পর তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ এদেশে আসেন ও থাকেন। ফলে এতদ্দেশে কালক্রমে জৈনধর্ম ও ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়। "বর্ধমানপুরী, রাঢ়াপুরী, সুব্ভভূমি, বজ্জভূমি" প্রভৃতি জৈনদের স্মৃতিচিহ্ন। বাংলা ভাষায়—স্খলিত হ-ধ্বনি (এথা—হেথা, ওথা—হোথা), শতকিয়ায় ও অন্যত্র (বাহাল্লিশ>বেয়াল্লিশ, বাহান্ন, বাহাত্তর ইত্যাদি); স্খলিত ব-ধ্বনি ও স্খলিত য়-ধ্বনি (খা+আ=খাওয়া, যা+অ=যায়) অর্ধ-মাগধীয় প্রভাবের নিদর্শন। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ল-স্থানে ড় (পয়লা—পয়ড়া, নকুল—নকুড়, অর্গল—আগড়, কুল্যবাপ—কুড়বা), র-স্থানে ল (রাঢ়—লাঢ়—"অহো দুচ্চরলাঢ়ম্—", (আয়রঙ্গসুত্ত) রণ্ডা—লণ্ডা, রেখ—লেখ), শ ও ষ-স্থানে স, ক্ষ-স্থানে কৃখ>খ্খ, ন-স্থানে ণ (কোষ—কোস, শৃগাল—সিগাল—সিয়াল, বক্ষ—বকৃখ, বখ্খ ফেন—ফেণ—ফেণা ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য। বাংলা নেঙটো—নেঙটা (<নেঙণ্ট< নেঙ্ঙণ্ঠ<নেগ্গণ্ঠ<নিগ্গণ্ঠ<নিগ্রন্থ), গোমড়া (<গম্মড়া<গম্বড়া<গম্বরা< দিগম্বর), গম্ভীর (<গম্বীর<গম্বর<দিগম্বর), ডেক্‌রা (<ডেগরা<ডেগ্গর< ডিগগঁর<ডিগ্গঅঁর<দিগম্বর), ছন্ন (যথা—পাগলছন্ন, মতিচ্ছন্ন), খনা (খঅনআ<খবনই<ক্ষপণক) প্রভৃতি শব্দ জৈনদের অর্ধ-মাগধীরই স্মৃতি। বাঙলার নাথধর্মে কৃচ্ছ্রকায়সাধনের স্থান প্রকৃতপক্ষে জৈনধর্মেরই দান। "নাথ" শব্দটিও "নিগ্গণ্ঠ নাতপুত্ত" বা "নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃক-পুত্রে"রই স্মৃতি।

(২) দ্বিতীয়, খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ—৫ম শতক

২ সংকীর্ণ বা অব্যাপক অর্থে "বঙ্গল—বঙ্গাল" শব্দ কিছু পূর্বেই প্রচলিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে বাঙলায় আর্য-ভাষার তৃতীয় প্রবাহ আসিয়া লাগে। ইহাই আর্য-ভাষার শেষ প্রবাহ। এই প্রবাহকে মাগধী প্রাকৃত বলা হয়। সম্ভবতঃ ইহা রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে এতদ্দেশে অর্ধ-মাগধী প্রাকৃতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) তৃতীয়, খ্রীঃ পূঃ ৩য়—২য় শতক

৫। অতঃপর এই দুই প্রাকৃতের এক মিশ্ররূপ, যাহাতে কোল বা মুণ্ডা-গোষ্ঠীর, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ও তিব্বত-ব্রহ্মণ গোষ্ঠীর শব্দ প্রচুর ছিল, তাহাই প্রচলিত হয়। অর্ধ-মাগধী প্রাকৃতের সহিত মাগধী প্রাকৃতের সৌসাদৃশ্য যেমন যথেষ্ট ছিল, তেমনি বৈসাদৃশ্যও কিছু-কিছু ছিল। বৈসাদৃশ্যের মধ্যে ষ ও স-স্থানে শ-এর ব্যবহার, ড়-স্থানে ল-এর, ণ-স্থানে ন-এর ও কর্তৃকারকের প্রথমায় এ-বিভক্তির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। বাঙলায় এই সম্মিলিত বা মিশ্রপ্রাকৃতের পাথুরে প্রমাণ বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় শিলালিপি। ইহার পাঠ :—

(৪) বিমিশ্র প্রাকৃত, খ্রীঃ পূঃ ৩য়—২য় হইতে খ্রীঃ অঃ ৪র্থ শতক ও খ্রীঃ অঃ ৪র্থ—৮ম শতক

"—নেন সবগীয়ান গলদনস ডুমদিন
মহামাতে সুলখিতে পুডনগলতে এতং
নিবহিপয়িসতি। সবগীয়ানং চ দিনে তথা
ধানিয়ং। নিবহিসতি দংগাতিয়ায়িকে দেবাতিয়ায়িকসি।
সুঅতিয়ায়িকসি পি গংডকেহি ধানিয়িকেহি
এস কোঠাগালে কোসং ভরণীয়ে।"[১]

এই বিমিশ্র প্রাকৃতের প্রচলনের প্রথম পর্বকাল অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৩য়—২য় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৬। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অপভ্রংশ বা তৃতীয় পর্বের স্থিতিকাল। অপভ্রংশ-পর্বে ব্যাকরণের চরম বিপর্যয় ও শব্দের চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটে। ফলে অক্ষর-প্রকরণে স্বেচ্ছাচারিতার বন্যা বহিয়া যায়। শব্দমধ্যে ও শব্দশেষে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির লোপে স্বরধ্বনির প্রাদুর্ভাব, খ, ঘ, ছ,

(৫) অপভ্রংশ (খ্রীঃ ৮ম—১২শ

১ এতদ্দ্বারা সমস্ত বঙ্গবাসীর করগ্রহণকারী ডুমদিন মহামাত্য সুরক্ষিত পুণ্ড্রনগর হইতে ইহা নির্বাহ করিবেন। উহাদিগকে সেখানে ধান্য দেওয়া হইল। আর্থিক অভাব ইহা দ্বারা দূর হইবে। সচ্ছল হইলে এই কোষাগারের কোষ পুনরায় ধান্য ও অর্থের দ্বারা যেন পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়।

ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ—মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির হ-এর পরিণাম, বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ধ্বনিগুলির একাকারত্ব ও (তাড়িত) ড়, ঢ়-ধ্বনির বিকাশ অপভ্রংশ-পর্বের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। ভাষামধ্যে এই একাকারত্ব বা নৈরাজ্যের প্রতি-রোধকল্পে দেশের সুধী সাহিত্যিকগণ প্রাকৃতের ২য় ও ১ম স্তরের ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা অপভ্রংশ-স্তরের "সুঅ"-কে "সুজ" ও "সুজ্জ"-রূপে লিখিতে থাকেন। আবার সংস্কৃত-প্রাকৃতজ্ঞগণ অর্থাৎ উভয়-ভাষা-ব্যবহারকারী পণ্ডিতেরা "সুজ্জ-কে" "সূর্জ্জ"-রূপে উচ্চারণ করিতে ও "সূর্য" লিখিতে শুরু করেন। ফলে নবীন অক্ষর-প্রকরণ ও উচ্চারণ-পদ্ধতি সৃষ্ট হইল। ভাষা সংস্থিতিমূলক হওয়ার পরিবর্তে বিশ্লেষমূলক হইয়া দাঁড়াইল। ক্রিয়ার বিভিন্ন ভাব ও কাল বুঝাইতে সহযোগী ক্রিয়ার সহযোগে মূল ক্রিয়ারূপ যাহা গঠিত হইতে লাগিল তাহা বিস্তারিত হইল (Periphrastic)। অবশ্য, কাল ও ভাব-রূপ সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি, হয় এক হইয়া গেল, নয়ত লুপ্ত হইয়া গিয়া নূতন চিহ্ন বা শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি এক হইয়া গেল। এইভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার পূর্ব-শাখার উত্থান ঘটিল। প্রকৃতপক্ষে যে-দুইটি উপশাখায় উপবিভক্ত হইয়া এই পূর্ব-শাখা প্রকাশ পাইল সে-দুইটি উপশাখা যথাক্রমে—(১) বিহারী ও (২) বঙ্গীয়। বিহারী উপশাখায় তিনটি উপভাষাগত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইল, ফলে, যে-তিনটি উপভাষা ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিল তাহাদের পরিচয় হইল ব্রজপুরী বা ব্রজপুরীয়, যাহা পরবর্তী কালে ভোজপুরী বা ভোজপুরিয়ায় পরিণত হয়, মাগধী, যাহা পরে মগহীতে পরিণত হয়, এবং মৈথিলী। বঙ্গীয় উপশাখাও অনুরূপভাবে তিনটি ভাষার লক্ষণ-সমেত প্রকাশ পাইল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের মধ্যে এই তিনটি ভাষা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইহাদের প্রথমটির পরিচয় অহমীয়া বা অচমীয়া, দ্বিতীয়টির পরিচয় ওড়িয়া ও তৃতীয়টির আখ্যা হয় গৌড়ী। পরবর্তী কালে অহমীয়া বা অচমীয়া অসমীয়াতে পরিণত হয় এবং গৌড়ী বাংলায় পরিবর্তিত হয়।

(৬) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা-রূপে পূর্ব-ভাষার উদ্ভব (খ্রীঃ ১২শ—১৪শ শতক)

৩

বাংলা ভাষার আদিযুগ লিখিত-প্রমাণ-অনুযায়ী ও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে নিহিত। এই যুগের প্রথম দিকের প্রমাণ ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্বানন্দ বন্দ্যঘটী কর্তৃক অমরকোষের "টীকাসর্বস্ব" নামক টীকায় উদ্ধৃত কিঞ্চিদধিক তিনশত প্রাচীন বাংলা শব্দ। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু এখানে উল্লেখ করিতেছি ; যথা—অম্বাড় > আমড়া, কানাজুঞ্জি < কেন্নু, কিঞ্চোহি > কেঁচো, খস্থ > খোস, খড়কি > খিড়কি, খলি < খইল, খোল ; চবডি < চটি, খোট > ঠোঁট, ভাঞ্জি > হাঁচি, পিচ্ছোড়ি > পিঁচুটি, পিম্পড়ী > পিঁপিড়া, বাদিয়া > বেদে, হেণ্ট > হেঁট, বেঙ্গ > বেঙ, বহেড়ী—

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিশিষ্ট লক্ষণ—আদিযুগ

বহড়ী > বয়ড়া (কৃঃ-কীঃ—বহড়া), চাতিপন্ন > ছাতিম (কৃঃ-কীঃ—ছাতীঅন, ছাঞিঅঁণ), ডহুআ—ডহু > ডা'ক (পাখী) (কৃঃ-কীঃ—ডৌহাকু), নেবালী—নেআরী—নবমালিকা (কৃঃ-কীঃ—নেআলী) ইত্যাদি। এই যুগের শেষদিকের লিখিত প্রমাণ অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ইহার ভাষা যেমন একদিকে অসমীয়া ও ওড়িয়ার নিকটবর্তী, তেমনি আবার ভাষাগত পুরাতাত্ত্বিক পরীক্ষায় প্রাচীন বাংলার সর্ববিধ লক্ষণযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বৈশিষ্ট্য স্খলিত হ-ধ্বনি, স্খলিত য়-ধ্বনি ও স্খলিত ব-ধ্বনি (যথা, তেঁহে, তেঁহো, চিআয়িলী, হয়িলী, আইসে, ইত্যাদি), ক-প্রবণতা, ট-প্রবণতা, আ-প্রবণতা, অনুনাসিক-প্রবণতা (যথা—করিবে—করিবেক, পাশক, তাক, তাহাক, তাহাকো, ডৌহাকু, নদীকের, লক্ষকের, বাটত, ঘাটিয়াল, নান্দ, আঙ্গ, আঞ্চল আতিশয়, দহেঁ, হৈতেঁ, তথাঁ, দেখিআঁ ইত্যাদি), ল স্থানে ন (নিব, নিবারেঁ), র ও ড়-স্থানে ল (লাচ্ছ, লাঙ্গট), বহিরঙ্গ ভাষার লক্ষণস্বরূপ গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণের লোপ ইত্যাদি। বাংলা বাক্যের মাত্রা, "না" "খন", শব্দ-শেষের (মাত্রা) ক ; পার্ ধাতু, ডাক্ ধাতু, কাঢ় ধাতু, এড়্ ধাতু, শুধ্ ধাতু, ডুব্ ধাতু প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। আবার কিছু কিছু আরবী-ফারসী শব্দও, যথা, নারাঙ্গ, কামান, মজুর, আফার, বন্দী, গুলাল ইত্যাদি পাওয়া যায় বলিয়া কাব্যখানি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। তুর্কী-আক্রমণের কালের সহিত কাব্যখানির রচনাকালের ব্যবধান পঞ্চাশ হইতে একশত বৎসরের মধ্যেই, নতুবা, আরবী-ফারসী শব্দ আরও অধিক পাওয়া যাইত। উপরন্তু, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ওড়িয়ার মত স্বরান্ত উচ্চারণের পরিচয় ও লিঙ্গানুসারী বাক্য-গঠনের উদ্দেশ পাওয়া যায় ("মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে", "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ")। এ ছাড়া কাব্যের ভাষায়—আনুরূপ্য, বিপর্যয়, স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ, সমাক্ষর-লোপ

(গোআল, রাখোআল, পরকার, বেআকুল, পরচার, তিরী, পত্রাইল) প্রভৃতি ধ্বনি-পরিবর্তনও দেখা যায়।*

৪

মধ্য-যুগ

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হইতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষার মধ্যযুগ। এই যুগের প্রথম দিকের সাহিত্যিক নিদর্শন গুণরাজখান বা মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃত্তিবাস ওঝার শ্রীরামমঙ্গল পাঁচালী, বিপ্রদাস পিপ্পলাই-এর মনসাবিজয় প্রভৃতি। মধ্যকার সাহিত্যিক নিদর্শন ব্রজবুলী সাহিত্য, চৈতন্য-জীবনী সাহিত্য, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল প্রভৃতি। শেষদিকের সাহিত্যিক নিদর্শন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডী-মঙ্গল, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মাণিক গাঙ্গুলী ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি।

বিশিষ্ট লক্ষণ

এই যুগে বাঙলার স্বরান্ত উচ্চারণ স্থলে-স্থলে উঠিয়া গেল, ফলে হসন্ত উচ্চারণ আসিয়া গেল। আদিযুগের অল্প-স্বল্প সন্ধিরূপ বজায় রহিল ও লিঙ্গানুসারী বাক্য-গ্রন্থন-রীতি শ্লথ হইয়া পড়িল। আদিযুগে, একাবলী ছন্দের পাশাপাশি দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, মিশ্র ও অমিশ্র পয়ার ছন্দের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়া ছিল। মধ্য-যুগে বিবিধ পয়ারের পাশাপাশি ব্রজবুলীর মাত্রা-মূলক ছন্দ প্রবেশ করিল। ধ্বনি-পরিবর্তন বলিতে র-স্থানে অ ও অ-স্থানে র-(রাম —আম; উপকথা—রূপকথা) ধ্বনি দেখা দিল। সাধারণতঃ শব্দের প্রথমাক্ষরে স্বরাঘাত পড়ার রীতি দেখা দিল। স্বরাগম (গোগণ্ড—অপোগণ্ড, স্পর্ধা—আস্পর্ধা, স্ত্রী—ইস্ত্রিরী), প্রগত ও পরাগত সমীভবন (লিপ্তক>লিত্তঅ>লেতা> নেতা, মৌক্তিক>মোত্তিঅ>মোতী), আদিস্বরলোপ (অরিষ্ট—রিষ্টি, উপানহ —পানই), স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (বিশোয়াস, পতিআই), বিপর্যয় (মুকুট—মটুক), স্বরসংগতি (দেখিয়া—দেখে), অপিনিহিতি বা অপিনিধান (দেখিয়া —দেইখ্যা), আনুরূপ্য (ব্রাহ্মণী, গোয়ালিনী, সাপিনী, প্রেতিনী), ধ্বনি-সাঙ্কর্য বা সঙ্করধ্বনি (আগা-গোড়া, ছেলে-পিলে) প্রভৃতি ধ্বনি-পরিবর্তন দেখা দিল।

* চর্যাপদ বা চর্যাগীতিকে নিছক প্রাচীন বাঙলার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা দুষ্কর। ইহার ভাষা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত বিমিশ্র। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙলা শব্দ যেমন আছে, তেমনি আধুনিক বাঙলা প্রয়োগও কিছু-কিছু পাওয়া যায়। কৃষ্ণাচার্যেরও সরোজবজ্রের দোহাকোষের ভাষার সহিত ইহার ভাষার সামঞ্জস্য প্রমাণ করা কঠিন। বরং চর্যাপদের অপভ্রংশের রূপ আরও পরবর্তী-কালীন। এইরূপ নানাপ্রকারের বিতর্কের বিষয় বলিয়াই উহাকে প্রাচীন বাঙলার নিশ্চিত প্রমাণ বা নিদর্শন বলিয়া ধরা যায় না।

বহুস্থলে যুক্ত-ব্যঞ্জন একক-ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হইল (আহ্মি > আমি, তুহ্মে > তুমি. কাহ্ন > কান, জেহ্ন > যেন, চিহ্ন > চেন, চিন ইত্যাদি)। শব্দ মধ্যের ও শব্দান্তের যুগ্মব্যঞ্জনে ম-ধ্বনি থাকিলে তাহা অনুনাসিক ঁ(চন্দ্রবিন্দু)তে পরিণত হইল ; যথা, বাগ্মী > বাগ্‌গীঁ, লক্ষ্মী > লক্‌খীঁ, লক্ষ্মণ > লক্‌খঁন ইত্যাদি।

মধ্যযুগে বাঙলার উপভাষা ছিল সম্ভবতঃ চারটি, যথা : (১) রাঢ়ী, (২) মধ্যা, (৩) বরেন্দ্রী ও (৪) বঙ্গালী। ইহাদের মধ্যে আবার রাঢ়ী, মধ্যা ও বঙ্গালীতেই অধিকাংশ সাহিত্য রচিত হইয়াছিল।

এই যুগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এতদ্দেশে ব্রজবুলী সাহিত্যের চর্চা। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ব্রজবুলী সাহিত্য লইয়া জোর মাতামাতি চলিয়াছিল। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বগামী পদকর্তাদের অনুসরণে ব্রজবুলীতে পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বগামীদের মধ্যে নরহরি সরকার, নরহরি চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, জগদানন্দ দাস, শেখর দাস, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সার্থকনামা পদকর্তা। কিন্তু বাঙলা দেশে ব্রজবুলী চিরদিন অটুট-অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে নাই। ইহার প্রকৃতি বাংলার দিকে অবনমিত হইয়া বাংলা-বিমিশ্র হইয়া পড়িয়াছিল। প্রচুর বাংলা-প্রয়োগ ভাষার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে, ব্রজবুলী বাংলায় সাহিত্যের কৃত্রিম ভাষায় পরিণত হইয়াই সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল।

বাংলায় ব্রজবুলী সাহিত্য

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর, বিদ্যাপতি ঠাকুর, উমাপতি মিশ্র প্রভৃতির ব্রজবুলীর ভিত্তি ছিল কিন্তু ব্রজপুরী বা ব্রজপুরীয় উপভাষার উপর অবহট্টের চটক। বিদ্যাপতি ঠাকুরের শেষদিকের পদাবলীতে মৈথিলীর ঈষৎ মিশ্রণ অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায় (যেমন—"গমায়লুঁ"-স্থানে—"গোঙায়লুঁ"—ইত্যাদি), কিন্তু তাহাই বড় কথা নহে। আর, তাঁহার গোড়ার দিকের রচনা "পুরুষ-পরীক্ষা", "কীর্তিলতা", "কীর্তিপতাকা"-য় অবহট্ট-খচিত যে উপভাষার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার লিঙ্গানুসারী বাক্যগঠন ও লিঙ্গপ্রভাবিত ক্রিয়ারূপ দেখিলে তাহাকে পূর্বীহিন্দী-প্রভাবিত ব্রজপুরী বা ব্রজপুরীয় উপভাষা বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে যে-সকল বাঙালী ছাত্র মিথিলায় স্মৃতি, ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্র শিখিতে যাইতেন তাঁহারা মিথিলার রাজসভার কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের বৈষ্ণব পদাবলী বাঙলায় বহিয়া লইয়া আসেন এবং বাঙালী সমাজে ছড়াইয়া দেন। অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাপতির পদাবলী অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে

এবং লোক-মুখে পদাবলীর অংশ-বিশেষ যেমন বিকৃত হইয়া পড়ে, তেমনি ভাষার আখ্যাটিও বিকৃতি লাভ করে—অর্থাৎ “ব্রজপুরী”-র “পুরী”-অংশটি “বুলী” হইয়া দাঁড়ায় (পু—বু, রী=লী)।*

৫

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক হইতে বাংলা ভাষার আধুনিক যুগ শুরু হইয়াছে। এই যুগের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য বাংলা গদ্যরচনার সহিত বাংলা সাহিত্যে নব ভাবধারার উন্মেষ। আরবী-ফারসী ভাষার দীর্ঘকালীন সংস্পর্শের ফলে বাংলা ভাষায় “ৎস্” ও “জ্” (Z)-ধ্বনি (গাছ, সুতলা, বাজে) দেখা দেয়। আবার, ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রভাবে তালব্য “আ” ও “অ্যা” (a)-ধ্বনি বাংলায় দেখা দেয় (রাম, কাল, খেলা, একা)। সর্বত্র অনুনাসিক ধ্বনির প্রভাব প্রচণ্ড হইয়া ওঠে (হাসি—হাঁসি, প্রাচীর—পাঁচীল, ইট—ইঁট, কাচ—কাঁচ, পুথী—পুঁথি ইত্যাদি)। শব্দমধ্যের ও শব্দশেষের মহাপ্রাণধ্বনি সন্নিকৃষ্ট অল্পপ্রাণধ্বনিতে সাধারণভাবে পরিবর্তিত হইতেছে (বাঘ—বাগ, গাধা—গাদা, বহা—বআ, সহ—সও ইত্যাদি)। এ-যুগে প্রচুরভাবে বিচিত্র সঙ্কর-শব্দ প্রচলিত হইয়াছে (হেডপণ্ডিত, রাজা-উজীর, পুলিসসাহেব ইত্যাদি)। এ ছাড়া, আধুনিক বাংলায় প্রচুর জোড়কলম শব্দ (Portmantau) যথা মিনতি=মিন্নৎ+বিজ্ঞপ্তি; শব্দমিশ্রণ [Contamination] যথা—আনারস =আনা+রস<আনানস; লোকনিরুক্তি (Folk-etymology) যথা—উর্ণনাভ<উর্ণবাভ; মনোরথ<মনোহর্থ; বিষমচ্ছেদ (metathesis) যথা—সধবা; যুগ্মপ্রয়োগ (Collocation) যথা—আগাগোড়া, বনবাদাড়, পথঘাট; দ্বিরুক্ত শব্দ (Doublets) যথা—পাক (ফের), পাক (রান্না); চিনি (শর্করা), চিনি (জানি); পর-সংগঠন (Back-formation) যথা—গুনগুনানি; সংক্ষেপিত শব্দ (Clipped words) যথা, অম্নিবাস (Omnibus)>বাস (Bus) ইত্যাদি পাওয়া যায়। আবার পূর্বী ও বাংলা উপভাষায় অপিনিহিত স্বরধ্বনি অভিশ্রুত (Umlaut)-রূপে উচ্চারিত হইতেছে, যথা, রাখিয়া>রাইখ্যা>রেখ্যা, লক্ষ>লৈখ্‌খ>লোখ্‌খ>লোখ্‌খো ইত্যাদি। এদিকে প্রান্তিক, রাঢ়ী ও মধ্যায় সমানুপাতে স্বর-

আধুনিক যুগ—নূতন শব্দ-গঠন ও বিদেশীয় প্রভাব

* অন্তিম বা নির্বিশেষ বিচারে যে-কোন আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যযুগ বা মধ্যপর্ব প্রমাণিত হয় না। বাক্যগঠন-পদ্ধতির দিক দিয়া কেবলমাত্র দুইটি যুগ বা পর্ব দেখা যায়, যেমন একটি প্রাচীন ও অন্যটি নবীন। সুতরাং প্রাচীন ও নবীন যুগ বিভাগই বিজ্ঞানসম্মত। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত প্রাচীনযুগ এবং পঞ্চদশ শতক হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নবীন যুগ।

সংগতির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন, দেখিয়া>দেখে, মাছুয়া>মেছুয়া> মেছো ইত্যাদি। সমাক্ষরলোপও (Haplology) কিছু কিছু দেখা যায় ; যেমন, বানি<বানানি।

৬

বাংলা শব্দের শ্রেণী-বিভাগ

বাংলা ভাষার শব্দাবলী সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত, যেমন, (১) দেশী বা দেশজ, (২) তৎসম বা সংস্কৃত, (৩) তদ্ভব বা প্রাকৃত ও (৪) বিদেশী। বিদেশীয় বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর শব্দ বাঙলায় দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে (ক) আরবী-পার্শী-তুর্কী (খ) ইংরাজী-ফরাসী-পর্তুগীজ-ওলন্দাজ ভাষা প্রধান এবং (গ) চীনা, জাপানী, মালয়ী, গ্রীক প্রভৃতি অপ্রধান। দেশী বা দেশজ বলিতে প্রাগ্-দ্রাবিড় প্রাগার্য গোষ্ঠী, দ্রাবিড় এবং তিব্বত-ব্রহ্মণ গোষ্ঠী বুঝায়।

তৎসম ও তদ্ভব শব্দ

দেশী বা দেশজ শব্দের উল্লেখও উদাহরণ আড়, আই ইত্যাদি।[১] তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ লিখিত বা সাধু বাঙলায় মৌখিক অপেক্ষা অনেক বেশী। "তৎসম" শব্দ প্রাকৃত ব্যাকরণে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া নবীন-ভারতীয় আর্যভাষা বাংলার দিক হইতে "সংস্কৃত" বলাই সমীচীন বোধ করি। এইরূপ শব্দ যেমন, চন্দ্র, কৃষ্ণ, ইত্যাদি, সমভিব্যাহারে, যৎপরোনাস্তি, এবংবিধ, নচেৎ, নতুবা, কিন্তু, যদ্যপি, অপিচ। "তদ্ভব" বা প্রাকৃত শব্দও বাংলাভাষায় প্রচুর প্রচলিত আছে যেমন, মোতি (মোত্তিঅ<মৌক্তিক), শেয (<শয্যা), বেজ (<বেজ্জ<বৈদ্য), নেকা বা ন্যাকা (<নেআকা< নেআক<নায়ক), শেয়ানা (<শেয়ান<শ্যেন)। এইরূপ শব্দগুলিকে তদ্ভব অপেক্ষা প্রাকৃত বা প্রাকৃতজ বলাই সঙ্গত বোধ হয়। তথাকথিত অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দ যেগুলি বাংলায় ব্যবহৃত হয় প্রকৃতপক্ষে সে সবগুলিই প্রাকৃত বা প্রাকৃতজ।

বিদেশী শব্দ

বাংলাভাষায় বিদেশী শব্দগুলিকে এককথায় ঋণাত্মক শব্দ বলাই উচিত। মধ্যযুগে আরবী, পার্শী, তুর্কী, তাতারী প্রভৃতি ভাষার নানা ভাব-ও-দ্রব্য-বোধক শব্দ, যেমন,—জমি, কুর্তা, উজবেক্, কাঁচি, কাগজ বাংলাভাষায় গৃহীত হইয়াছিল। প্রাচীনযুগে গ্রীক ঋণাত্মক শব্দ, যেমন,—কোণ, সুড়ঙ্গ ও প্রাচীন ইরানীয় কায়েথ (<কষয়থিয়), ঠাকুর (<টক্কর, টাকর), মুচী (<মোচঅ< মোচক), পুঁথি (<পোথ<পোস্ত), বন্দী (<বান্দা) বাংলাভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। আধুনিক যুগে ইউরোপের নানাজাতি বাণিজ্য-ব্যপদেশে

১ ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভারতে আসায় তাহাদের বিভিন্ন ভাষার নানা শব্দ গ্রহণ করিয়া বাংলাভাষা ধরিয়া রাখিয়াছে,—যেমন,—কোট (<কোর্ট), লাট (<লর্ড', গারদ (<গার্ড), (পাঁউ -রুটি) <পাঁও, তিজেল (হাঁড়ি) <তেজেল, চাবি (<চাভে), মিস্ত্রী (<মেস্‌ত্রে), আলমারি (<আল্‌-মিরা+আর্মারিও,) চেয়ার, টেবিল (<টেব্ল্‌), বোর্ড, রিবন, টাইম ইত্যাদি। চীনা, জাপানী ও মালয়ী শব্দও মধ্যযুগে বাংলাভাষায় কিছু-কিছু আসিয়া গিয়াছে, যেমন,—চিনি, লুচি প্রভৃতি চীনা শব্দ; হারাকিরি, মিকাডো, রিকসা, ফুজিয়ামা, কিমোনো প্রভৃতি জাপানী শব্দ ; গুদাম, ঘণ্টা, ওরাঙউটান, গণ্ডার প্রভৃতি মালয়ী শব্দ। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের উপভাষার শব্দ—ব্যুমেরাং ও টোটেম, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষার শব্দ—লামা, আলপাকা, মোহক্ ইত্যাদি। জগতের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন উপজাতির ভিন্ন-ভিন্ন ভাষার ও উপভাষার এত শব্দ বাংলাভাষায় আসিয়া যুক্ত হইয়াছে যে তাহাদের নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা রীতিমত গবেষণার বিষয়বস্তু।

৭

বাংলা উপভাষা

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আধুনিক বাংলার অন্যূন ছয়টি উপভাষা উল্লেখযোগ্য। শব্দবিশেষের উচ্চারণগত পার্থক্য ও ভিন্ন শব্দের প্রয়োগ, বিভিন্ন শিষ্ট প্রয়োগ, বিভিন্ন প্রবাদ ও প্রবচনের প্রচলন ও ব্যাকরণের কারক-বিভক্তির দিক হইতে পার্থক্যই উপভাষার লক্ষণ। বাংলার উপভাষা বলিতে (১) মেদিনীপুরের কথ্যভাষা (২) বাঁকুড়া ও বীরভূমের কথ্যভাষা, (৩) নবদ্বীপ-শান্তিপুরের কথ্যভাষা, (৪) হাওড়া-হুগলীর কথ্যভাষা (৫) কলিকাতার কথ্যভাষা বা জেলা ২৪-পরগনার কথ্যভাষা এবং (৬) মালদহ-দিনাজপুরের কথ্যভাষাই বুঝায়। পূর্ববঙ্গের উপভাষার সংখ্যা আরও অধিক, যথা,—যশোহর-খুলনার কথ্যভাষা, ঢাকা-বিক্রমপুরের কথ্যভাষা, বরিশাল-বাখরগঞ্জের কথ্যভাষা, ও নোয়াখালি-ত্রিপুরার কথ্যভাষা, চট্টগ্রামের কথ্যভাষা, শ্রীহট্ট অঞ্চলের কথ্যভাষা, মৈয়মনসিংহ অঞ্চলের ও উত্তর বঙ্গের কথ্যভাষা পূর্বোক্ত ছয়টি উপভাষার সহিত যুক্ত হইয়া অন্যূন চৌদ্দটিতে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চর্যাপদের সমকালীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্ট রচনাবলী

১

নবম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত চর্যাপদকে বাংলাকাব্যমহাদেশের সহিত বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই মনে হয়। এই জাতীয় রচনার ভাবধারা ও কাব্যাদর্শের মূল বাংলার জাতীয় জীবনে কোথায় ছিল তাহা আমাদের নিকট ধারাবাহিকতা-সূত্রে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। সমকালীন যে জীবন-ইতিহাস, ভাষাবিবর্তন ও সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রতিবেশে ইহাদের উদ্ভব তাহার নিদর্শনগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি হইতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়া অনিশ্চিত অনুমানকে আশ্রয় করিয়াছে। যাঁহারা সাহিত্যধারার উদ্ভব ও দিক্-পরিবর্তনের মর্মরহস্য অবগত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিবেন যে চর্যাপদের মত বহুশতাব্দী-প্রসারিত, পরিণত মনন ও মার্জিত প্রকাশরীতিতে বিশিষ্ট ও ধর্মমতবাদের ঐতিহ্যবাহী রচনা স্বয়ম্ভু হইতে পারে না। ইহার পিছনে একটি সুদীর্ঘ সাধনার ইতিহাস, জনমনের একটা বহু-অনুশীলিত জীবনদর্শন সক্রিয় ছিল। তুর্কীবিজয়ের পর ইহার ধারা যে অকস্মাৎ বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহাও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইহার পূর্বে ও পরে, মঙ্গলকাব্য ও রাধাকৃষ্ণকাহিনীর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ আবির্ভাব পর্যন্ত, বাঙালী মনের নানা সৃষ্টি-প্রচেষ্টা, বাঙালী ভাবনার নানা আবর্তন, বহু একগোষ্ঠীভুক্ত উপভাষার দ্বিধাজড়িত চর্চার মধ্য দিয়া একটি কেন্দ্রীয় ভাষার অন্বেষণ ও সমস্ত উত্তরাপথ-ব্যাপ্ত সংস্কৃত ভাষার অনুপ্রবেশ যে বাংলা-সাহিত্যের গতিপথকে চিহ্নিত করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন মিলিবে। এই নানাশাখাবিভক্ত প্রয়াসের যথাসম্ভব পরিচয় লইলে একদিকে প্রাক্-চর্যাপদীয় যুগের, অন্যদিকে চর্যাপদ হইতে বড়ু চণ্ডীদাস পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীব্যাপী দৃশ্যতঃ বন্ধ্যা অন্তর্বর্তীকালের মধ্যে নব-প্রসূতির অঙ্কুরোদ্গম পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে।

নূতন তত্ত্ব-সন্ধানের গুরুত্ব

২

(ক)—সংস্কৃত

বাঙ্‌লা দেশে সংস্কৃত যে আদি সাহিত্যিক ভাষা ছিল না, তাহার বহু পূর্বে-যে জনসাধারণের কথিত, সহজবোধ্য প্রাকৃত ভাষা সাহিত্যমর্যাদাসম্পন্ন ছিল ও

চিরস্থায়িত্বের উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইত তাহার প্রাচীনতম নিদর্শন মহাস্থানগড় লিপিতে বর্তমান। ইহার সম্ভাব্য কাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। এই প্রাচীন যুগে সংস্কৃতের মহিমা বাঙালী সাহিত্য-চেতনায় ও চর্চায় কোন রেখাপাত করে নাই—দেববাষার বিজয়রথ তখনও পূর্বভারতের সীমা অতিক্রম করে নাই। প্রাকৃতের সার্বভৌমত্ব তখনও ভারতের সমস্ত অঞ্চলে, যৎসামান্য প্রাদেশিক রূপভেদ সত্ত্বেও, সর্বস্বীকৃত ভাষাতাত্ত্বিক সত্য।

প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষা-প্রাকৃত

তাহার প্রায় সাত শতাব্দী পরেই সংস্কৃতের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। বাঁকুড়া শুশুনিয়া, ও গুপ্তরাজবংশের সমকালীন লিপিগুলিতে, কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনে সংস্কৃতেরই প্রয়োগ। বিশেষতঃ ভাস্করবর্মার শাসনখানি রাজ-প্রশস্তিমূলক ও 'কাদম্বরী'-সুলভ অলঙ্কারবহুল, দীর্ঘবাক্যবিন্যাসবদ্ধ রীতিতে রচিত।

তাহার পরবর্তী পাল ও সেনরাজাগণের শাসনগুলিতে সংস্কৃত কাব্যপ্লাবনের অনুপ্রবেশ। ইহাদের উদ্দেশ্য কতক রাজপ্রশস্তি, কতক ইতিহাসবিবৃতি, কতক দেবস্তুতিমূলক হইলেও ইহাদের মধ্যে বাঙালী কবির কবিত্ব-স্রোত অজস্রধারায় প্রবাহিত। বাঙালী যে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সংস্কৃত রচনারীতিতে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছে ও এই নবার্জিত ধ্বনিবহুল, ও শব্দ ও অর্থালঙ্কারের সার্থক প্রয়োগে চমৎকৃতি-উদ্দীপক ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই নিজ অন্তঃসঞ্চিত ভাবাবেগ ও সৌন্দর্যবোধের মুক্তিসাধনায় ব্রতী হইয়াছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে প্রতিভাত হয়।

সংস্কৃত-চর্চা আরম্ভ

ইহাদের মধ্যে কয়েকটিতে কৃষ্ণলীলা ও কয়েকটিতে শিবমাহাত্ম্যের সসম্ভ্রম উল্লেখ প্রমাণ করে যে বাঙালী কবিরা শুধু সংস্কৃত কাব্যসৌন্দর্যে নয়, হিন্দুধর্মানুগত পুরাণ-চেতনায় ক্রমপ্রাবীণ্যের নিদর্শন দেখাইতেছে। এখানে আমরা একটি আদিতে অনার্য জাতির আর্যসংস্কৃতিতে প্রথম দীক্ষার সূচনা দেখিতেছি। এখানেই বাঙালী কবিরা ভবিষ্যৎ যুগের বাংলা কাব্যের—বৈষ্ণব, শাক্ত কবিতা ও বিষয়ের নূতনত্ব সত্ত্বেও, মঙ্গলকাব্যের—উপাদান ও মানসিকতার ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। এখানেই নিজ অন্তরে ভবিষ্যৎ ভক্তিরসসিক্ত কবিতার বীজ বপন ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন ও কালপ্রবাহবিধ্বস্ত সাহিত্যকৃতির শূন্যতার উপর সেতু-রচনার মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছেন। জয়দেব ও বড়ু চণ্ডীদাসের পূর্বসূচনারূপে ভোজবর্মের শাসনে ব্রজলীলার উল্লেখসূচক এই শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য।

জয়দেবপূর্ব কৃষ্ণকথা

সোহপীহ গোপীশতকেলিকার:
কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধার:।
অর্ঘঃ পুমানংশকৃতাবতার:
প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃতভূমিভার:॥

এখানে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যরূপের মিশ্রণ দেখা যায়, এবং চৈতন্যধর্মের কৃষ্ণের পূর্ণাবতারত্ব এখনও অস্বীকৃত রহিয়াছে। অবশ্য যদিও কৃষ্ণের উল্লেখ সময়ের দিক দিয়া অগ্রগামী, তথাপি মনে হয় যে শিবের প্রতি ভক্তিই বাঙালীর অন্তরে আরও গভীরতর ও উচ্চতর কাব্যপ্রেরণার উদ্দীপক। রাধাহীন কৃষ্ণ বাঙালীর অন্তরাকাশে সদ্য উদয়োন্মুখ; শিব কিন্তু মধ্যগগনারোহী সূর্যের মত পূর্ণপ্রদীপ্ত ও ভাস্বর। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে যখন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা বৈদিক ধর্ম ও উপনিষদ্-দর্শনের নিন্দায় মুখর ও পুরাণচেতনার আভাসমাত্র তাঁহাদের ভাবপরিমণ্ডলে অনুপস্থিত, তখন রাজসভার কবিগোষ্ঠী সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পুরাণসংস্কৃতির গভীরে আকণ্ঠ নিমগ্ন। বাংলা সাহিত্য এখনও এককেন্দ্রিক, কিন্তু বাঙালী মানসিকতা বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও হিন্দু ভক্তিবাদের মধ্যে স্পষ্টতঃ দ্বিধাবিভক্ত।

শিলালিপি ও রাজপ্রশস্তি

শিলালিপি ও তাম্রশাসন সাহিত্যপর্যায়ভুক্ত নয় ও উহাদের উপলক্ষ্য কবিপ্রেরণার পরিবর্তে ধর্ম ও রাজনীতিসংশ্লিষ্ট অভিপ্রায়। তথাপি উহাদের অতিসংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যে সাহিত্যচর্চা ও ভাবচমৎকৃতি উৎপাদনের লক্ষ্য সুপরিস্ফুট। উহাদের মাধ্যমে তৎকালীন যুগপরিচয় ও কাব্যচিন্তারও নিদর্শন প্রচুর। রাজপ্রশস্তি ও মন্ত্রিসংবর্ধনার অনিবার্য অতিরঞ্জনপ্রবণতার মধ্য দিয়াও কিছু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য ও চরিত্র-উদ্‌ঘাটনের পরিচয় মিলে।

খণ্ডকাব্যের প্রসার

প্রশস্তিকবিতা ক্রমশঃ শিলা ও শাসনের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া খণ্ডকাব্যের উদারতর পরিধিতে পরিব্যাপ্ত হইল। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রয়োজনের চিহ্ন গৌণ হইয়া কবিমনোভাবের স্বাধীন ও পল্লবিত প্রসারই প্রাধান্য লাভ করিল। বিশেষ প্রয়োজনকে ছাপাইয়া সাধারণ মহিমাকীর্তনই কাব্যসৌন্দর্যকে অবলম্বন করিয়া প্রকট হইয়া উঠিল। শ্রীবাচস্পতি কবিকৃত মহামন্ত্রী-ভবদেব-ভট্টপ্রশস্তি হয়ত তৎখনিত সরোবরে স্নানার্থিনী রাঢ়সীমন্তিনীগণের যে মুখসৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছে তাহা আতিশয্যবিড়ম্বিত হইতে পারে। কিন্তু ঐ একই শ্লোকে রাঢ়সীমান্তের যে জলহীন ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূসংস্থানের উল্লেখ আছে তাহা একটি খাঁটি ভৌগোলিক তথ্যের পরিচয়বহ।

৩

এইবার সংস্কৃত কাব্যচর্চার মাধ্যমে মাতৃভাষাপ্রয়োগবঞ্চিত বাঙালী কবি-মানসের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। অভিনন্দের 'রামচরিত' কাব্য বাঙালী কবির রচনা কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তবে দেবীমহিমার সহায়তায় রামচন্দ্রের লঙ্কাযুদ্ধজয়বর্ণনার মধ্যে বাঙালী কবি কৃত্তিবাসের ভক্তিরসার্দ্র চিত্ত-প্রবণতার পূর্বাভাস আবিষ্কার করা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যটি কিন্তু নিঃসংশয়ে বাঙালী কবির রচনা ও উহার শ্লোকগুলির আদ্যোপান্ত শ্লিষ্টপ্রয়োগ সেই যুগের কবিমানসে রাজপ্রশস্তি ও দেবভক্তিনিবেদনের যুগ্ম প্রেরণার নিপুণ সমন্বয়ের চমৎকার দৃষ্টান্ত। কবি এই উপায়ে শুধু যে স্বর্গমর্ত্য দুইদিকই বজায় রাখিয়াছেন তাহা নহে; রাজমহিমার প্রতি অর্ঘ্যসমর্পণের চিরপ্রথাগত পূজাবিধির মধ্যে নবজাত পুরাণচেতনার ভক্তিনির্মাল্য যে কেমন করিয়া মিশিয়াছে তাহার ইতিহাসটিও ইহার মধ্যে সঙ্কেতিত। সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যের উদ্বোধন-শ্লোকেও কৃষ্ণ ও শিবের বন্দনায় একই গুণবাচক শব্দাবলীর দ্ব্যর্থক আরোপও সমকালীন জনচিত্তে শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের সমন্বয়াকাঙ্ক্ষা সূচিত করে।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত

কিন্তু সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকের ভিতর দিয়াই বাঙালীর কাব্যকৌতূহল ও জীবনরসনিষ্ঠতার আশ্চর্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ও ইহাদের মধ্যে প্রকাশিত ভাবধারাই ভবিষ্যৎ যুগের বাংলা কাব্যের উপর সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রকীর্ণ কবিতার দুইটি সুবৃহৎ সঙ্কলনগ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়া দশম হইতে দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী পূর্বভারতীয় কবিগোষ্ঠীর কাব্যচর্চা ও মানসরুচির উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাব্যের দিক দিয়া অগ্রবর্তী সঙ্কলনটির নাম 'সুভাষিতরত্নকোশ' (পূর্বনাম 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়')। এই সঙ্কলনের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মাবলম্বী বহু বাঙালী কবির রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' বাঙলাদেশ ও সমাজব্যবস্থার সহিত আরও নিবিড়-সম্পর্কান্বিত। সঙ্কলয়িতা শ্রীধর দাসের পিতা বটু দাস লক্ষ্মণ সেনের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন ও শ্রীধর নিজেও মাণ্ডলিক শাসনকর্তারূপে সেন-শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সঙ্কলনসমাপ্তির তারিখ ১২০৭ খৃষ্টাব্দ—অর্থাৎ তুর্কী-আক্রমণের অব্যবহিত পরেই। মনে হয় সে সময় লক্ষ্মণ সেন তাঁহার রাজধানী নবদ্বীপ হইতে পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁয়ে স্থানান্তরিত করিয়া শেষোক্ত স্থানে রাজ্য চালাইতেছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক

সদুক্তিকর্ণামৃত

কারণেই এই অতর্কিত বিপৎপাতের কোন ছায়া সঙ্কলিত শ্লোকগুলির উপর নিক্ষিপ্ত হয় নাই। যাহা হউক, 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এর শ্লোকসমূহের শ্রেণীবিভাগ প্রণালী পর্যালোচনা করিলে সমকালীন কবিগোষ্ঠীর বিষয়বৈচিত্র্য ও কাব্যভাবনা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ মোট ৪৭৬টি শ্লোক নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিন্যস্ত হইয়াছে।

অমর প্রবাহ— ৯৫
শৃঙ্গার প্রবাহ—১৭৯
চাটু প্রবাহ— ৫৪
অপদেশ প্রবাহ—৭২
উচ্চাবচ প্রবাহ—৭৬

অমর প্রবাহে নানা পৌরাণিক দেব-দেবীর, বিশেষতঃ হরগৌরী ও কৃষ্ণবিষয়ক বহু পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলিতে প্রমাণ হয় যে আর্যসংস্কৃতিতে নবপ্রবিষ্ট প্রত্যন্তপ্রদেশ বাঙলা কত অল্পকালের মধ্যে পৌরাণিক দেবদেবীমণ্ডলকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে ও উহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নিজ কবিকল্পনা ও অন্তরের ভক্তিধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। বৌদ্ধতান্ত্রিক বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ্যধর্মে দীক্ষা ও ঐ দীক্ষায় দ্রুত সিদ্ধিই এই গ্রন্থে বাঙালী মানসিকতার নবপরিচয় বহন করিয়াছে। ইহাতে নারায়ণের দশাবতারপ্রশস্তিজ্ঞাপন ও রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার কলাচাতুরিবর্ণনা জয়দেবের ভারতবিখ্যাত গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রেরণা যোগাইয়াছে এ অনুমান সঙ্গতভাবেই করা যায়। এই প্রকীর্ণ শ্লোকসমূহে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতবর্ণিত ঐশী মহিমা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহার গোপীনাগর ও রাধাবল্লভ রূপটিই নানা সংক্ষিপ্ত চটুল ইঙ্গিতের সাহায্যে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। সেনবংশের রাজসভায় বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন প্রভৃতি রাজবংশীয় কবিদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রাধাকৃষ্ণপ্রেমের একটি রসোচ্ছল, প্রাকৃত কেলিবিলাস ও অধ্যাত্মভক্তিদ্যোতনার মিশ্রণগঠিত ভাবাবহ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে রচিত হইতেছে তাহা আমরা যেন চোখের সামনে দেখিতে পাই। গীতগোবিন্দকে একটি রত্ন-প্রবালদ্বীপের সঙ্গে তুলনা করিলে কোন্ শঙ্খচূর্ণের কণাসমবায়ে ইহা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এই শ্লোকগুলি পড়িলে তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভাসংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ঠ কবিগোষ্ঠী—উমাপতি ধর, শরণ, ধোয়ী ও গোবর্ধন—এই প্রেমারতির উপচার যোগাইয়াছেন, এই পূজার্চনায় শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করিয়াছেন

অমর প্রবাহ

ও পুষ্পার্ঘ্যের অঞ্জলি দিয়াছেন। তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে জয়দেবকে এই রাধা-আরাধনায় প্রধান পুরোহিতরূপে বরণ করিয়া নিজদিগকে পূজামণ্ডপসজ্জার গৌণ আয়োজনে নিযুক্ত করিয়াছেন। সখীপরিচর্যায় লালিত বৃন্দাবনলীলার ন্যায়, বাঙলা কাব্যে মিলিত বহু কবির সাধনার ফলস্বরূপ এই প্রেমকাহিনীর গীতসুষমাময় রূপান্তরটি এক আশ্চর্য প্রতিবেশ-দাক্ষিণ্যে, অন্তর-বাহিরের এক অপূর্ব সহযোগিতায়, বসন্তের পূর্ণবিকশিত পুষ্পের মত বাঙালী মনের নবরসপুষ্ট তরুশাখায় সৌন্দর্যস্বপ্নবৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ যে পুরাণমহিমা হইতে প্রাকৃত জীবনরসধারার পথে সঞ্চারিত হইয়াছে, প্রকীর্ণ শ্লোকের মধ্যবর্তিতা তাহার একটি বিশিষ্ট কারণ বলিয়া মনে হয়। পংক্তিচতুষ্টয়সীমিত এই শ্লোকগুলির মধ্যে যে ঐশী-বিভূতির চূর্ণরশ্মিটুকু ঝিকৃমিক্ করিয়া উঠিয়াছে তাহাতে ভক্তি ও কৌতুকরস এক যৌগিক ভাবসত্তায় সমন্বিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভক্তির সুপ্রাচীন বৃক্ষকাণ্ডের উপর কৌতুকের কচি পাতা উদ্‌গত হইয়া সূর্যকিরণের আনন্দকে ও বসন্তবায়ুর ক্রীড়াশীলতাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। বিশেষণব্যূহের মধ্যে ঘনবিন্যস্ত পৌরাণিক ভাবগাম্ভীর্য চটুল কটাক্ষময় উপসংহারের প্রাকৃতরস-উদ্দীপনে ভক্তির উপর মানবিক আবেগের জয় ঘোষণা করিয়াছে। সংস্কৃত ধ্বনিপ্রবাহের মেঘমন্দ্রের উপর লঘু-চারিণী বিদ্যুৎরেখা একটি স্মিতহাস্যের প্রসাদদ্যুতি বিকীর্ণ করিয়াছে। ভগবান হরির কীর্তি যতই অভ্রভেদী হউক না কেন, এই শ্লোকরচয়িতারা শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ব্রজবধূর প্রগল্‌ভতার নিকট নিরুত্তর, তাহার সৌন্দর্য-আকর্ষণের নিকট অসহায় ও তাহার প্রণয়চাতুর্যের নিকট লাঞ্ছিত করিয়া ছাড়িয়াছেন। শ্লোকের উপর শ্লোক স্তূপীকৃত করিয়া তাঁহারা সর্ববিজয়ী ভগবানের এই গোপীবশ্যতার চিত্রটি গাঢ়বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের এই লঘু, প্রেমবিহ্বল রূপের উল্লেখ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেখানে সম্ভ্রমই মূল স্বর। দশম-একাদশ শতকের প্রকীর্ণ শ্লোকের কবিগণ সম্ভ্রমের এই অখণ্ড স্বর্ণমুদ্রাটি ভাঙ্গাইয়া ইহাকে বিবিধ লৌকিক প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য খুচরা রেজ্‌কিতে পরিণত করিয়াছেন ও প্রাকৃত জনসমাজে এই স্বর্ণরেণু ছড়াইয়া দিয়া মধ্যবিত্তের জীবনব্যাপারেও মূল্যবান ধাতুর বহুল প্রচার ঘটাইয়াছেন। ইঁহাদের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়সম্পর্ক সমাজচেতনায় এক নূতন তাৎপর্যে প্রতিভাত হইল। ইঁহাদিগকে বিদ্যাপতির অব্যবহিত অগ্রজ ও চৈতন্য-প্রেমধর্মের সুদূর সঙ্কেতবহরূপে অভিহিত করা যায়,

প্রকীর্ণ কবিতায় রাধা-কৃষ্ণপ্রেম

আর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ত ইঁহাদের কল্পনাবিকীর্ণ ভাবকণিকাসমূহের সঞ্চয়নলব্ধ তিলোত্তমাকাব্যপ্রতিমা।

শৃঙ্গারপ্রবাহের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্লোকগুলি প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের কাব্যসৌন্দর্য ও ভাবচটুলতার রোমন্থন-প্রক্রিয়ার দ্বারা কবিমনে উহার অধ্যাত্ম নির্যাসটুকুর প্রতি সচেতনতা জাগাইতে সহায়তা করিয়াছে। এইরূপে ইহারা রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার লৌকিক ভাবাশ্রয়ের পটভূমিকাটি রচনা করিয়াছে। কৃষ্ণকথার সহিত আলঙ্কারিক প্রণয়কলাপ্রশস্তির সংযোগে প্রেম উহার দৈহিক স্থূলত্ব পরিহার করিয়া এক সূক্ষ্মতর দ্যোতনায় উদ্বর্তিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ 'যঃ কৌমারহর': শ্লোকটির উল্লেখ করা যায়। এই শ্লোকটি এক অসতী নারীর বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রেমের স্মৃতি-রোমন্থনবিষয়ক হইয়াও প্রতিবেশমাধুর্যের প্রভাবে ও সূক্ষ্ম অতৃপ্তির প্রেরণায় শ্রীরাধিকার সহিত অবস্থা-সাম্যের যে ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতেই ইহা বৈষ্ণব ভাবপরিমণ্ডলে উন্নীত হইয়াছে।

শৃঙ্গারপ্রবাহ

মামুলি কবিকল্পনাস্পৃষ্ট ও অভিজাতসমাজসমর্থিত প্রণয়কাহিনীর আবহাওয়ায় রাধাকৃষ্ণের দিব্যপ্রেমের দৃষ্টান্ত যে কোন মনোভাব লইয়া উপস্থাপিত হউক না কেন, তাহার অনিবার্য ফল হইবে প্রেমধারণার ক্রমবিশুদ্ধিসাধন। যে অভক্ত সেও ক্রমশঃ ভক্ত হইবে, যে ইন্দ্রিয়সুখলোলুপ সে প্রেমের মহনীয় দিকের প্রতি সচেতন হইবে, যে কবি রাজরুচিতৃপ্তির জন্য কেলিবিলাসবর্ণনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারও কাব্যসরস্বতীর বীণায় উদারতর সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে। মর্ত্যসৌন্দর্যপিপাসার স্থূল বৃন্তে দিব্য প্রণয়ের সুরভিকুসুম বিকশিত হইবে। রাধাকৃষ্ণপ্রণয়ের মধ্যে যে তত্ত্বগভীরতা, যে আকাঙ্ক্ষার আকুতি ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের যে ভোগবিহ্বলতা ও অলৌকিক এষণার নিগূঢ় সহমর্মিতা নিহিত, তাহা সমস্ত লৌকিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্যানুভবের সূক্ষ্ম পথে কবি-আত্মার মূল বোধিকেন্দ্রে সংক্রামিত হইবেই হইবে। এই সত্যটি আমরা সে যুগের বাস্তব কাব্যজগতে প্রত্যক্ষ করি। তাই লক্ষ্মণ সেনের বিলাসমগ্ন, কামকলাচর্চাসক্ত রাজসভায় স্বয়ং রাজা হইতে রাজকবিগোষ্ঠী সকলেই কৃষ্ণলীলায় রসবিহ্বল হইয়া উঠিয়াছেন ও ভোগসুখপ্রশস্তির মধ্যে তাঁহাদের কণ্ঠে দিব্য উপলব্ধির সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। জয়দেবের কণ্ঠে ত বিলাসকলাকুতূহল ও হরিকথাসরসতা এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে মিথিলা রাজসভায় কবি বিদ্যাপতিরও অনুরূপ গোত্রান্তর ঘটিয়াছে। তাঁহার মানসবৃত্তি প্রাকৃতসমাজে প্রস্ফুটিত ফুলের মধুপান করিতে করিতে কখন এক অলৌকিক

প্রেমধারণার ক্রমশুদ্ধিসাধন

লীলাসমুদ্রের গভীরে আত্মবিস্মৃত হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—এও সেই গ্রাম্য লাম্পট্যের কাহিনী, সেই পল্লীরুচির ইতর ভোগাসক্তি রাধাবিরহের অতল-গভীর লবণ-সমুদ্রের অভিষেকে অভিশাপমুক্ত আত্মার ন্যায় কোন্ এক অচিন্তনীয় দেবলোকের নীলিমায় উধাও হইয়াছে। 'কানু ছাড়া গীত নাই'—এই বহুপ্রচলিত প্রবাদবাক্য শুধু বিষয়-ব্যাপ্তিতে নয়, আত্মিক বিশুদ্ধিতেও সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

পুরাণকাহিনীর রসানুগত প্রয়োগ ও কৃষ্ণকথার তত্ত্ব হইতে লীলায় রূপান্তর-সাধন ছাড়াও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'—এ বাঙালী কবিমানসের কাব্যপরিধিবিস্তারের আরও প্রমাণ মিলে। চাটুপ্রবাহে রাজবর্গের প্রতিটি গুণের প্রশস্তি, যুদ্ধবর্ণনা ও ক্ষাত্রশক্তির শ্রেষ্ঠত্বানুকীর্তন, দান, ক্ষমা প্রভৃতি মহৎ বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধার্পণ প্রভৃতি বিষয়ে রাজচরিত্রমহিমার বিভিন্ন দিকের সহিত কবিগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁহাদের কবিতার জীবননিষ্ঠতার নিদর্শন। এই পর্যায়ের শ্লোকগুলিতে অতিরঞ্জন-প্রবণতার সহিত বস্তুগত জ্ঞানের একটি সুষ্ঠু সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। অপদেশপ্রবাহে দেব, জ্যোতিষ্ক, নানা জাতীয় জীবজন্তু, বৃক্ষ-পক্ষী প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। এই পর্যায়ে পূর্বপ্রসিদ্ধির অনুসরণই প্রধান ; তথাপি মাঝে মধ্যে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণেরও যে চিহ্ন নাই তাহা নয়। সর্বশেষে উচ্চাবচ প্রবাহে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কৃষিনির্ভর পল্লীজীবনের শস্যপ্রাচুর্যসমৃদ্ধ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য, দরিদ্র স্ত্রীর আক্ষেপ ও দরিদ্রগৃহের জীর্ণাবস্থার বাস্তব বর্ণনা পাই। অবশ্য সংস্কৃত দেবভাষার ধ্বনিবহুল, বিশেষণ-ভারাক্রান্ত রাজৈশ্বর্যের মধ্যে দীনের তুচ্ছতা যেন ভাষাবিলাসের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতঃ ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য ক্বচিৎ রক্ষিত হইয়াছে। শার্দূলবিক্রীড়িত মন্থরগতি ছন্দে শফরী-লম্ফনকথা বিবৃত হইতে দেখা যায়। এই দিক দিয়া সংস্কৃতের কাব্যাদর্শ বাংলার পক্ষে অহিতকরই হইয়াছে—বিষয়ের বাস্তবানুস্মৃতি বর্ণনারীতির অতিস্ফীতিতে কুণ্ঠিত ও বিড়ম্বিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে সংস্কৃত কবিতার সহিত ও প্রাকৃত ও অপভ্রংশের শব্দ ও ছন্দোবিন্যাসের তুলনা করিলেই নবাগত ভাষাগুলির অধিকতর বিষয়োপযোগিতা সহজেই বুঝা যাইবে। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় যে বাংলা ভাষা সর্বতোভাবে সংস্কৃতরীতি-প্রভাবিত না হইয়া উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাষারূপগুলির প্রত্যক্ষতা ও ভাবানুগামিতার বাগ্‌বিন্যাসছন্দকেই মুখ্যভাবে অনুবর্তন করিয়াছে। কাব্যে বাঙালীর মানসক্রিয়া নিজ অন্তর-উৎসারিত সহজ প্রকাশভঙ্গীর প্রতি উন্মুখতা

জীবননিষ্ঠার নিদর্শন

দেখাইয়াছে। বরং উনবিংশ শতকে গদ্যের কৃত্রিম প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য বাঙালী লেখক সংস্কৃত ও পারসির স্বধর্মবিরোধী শব্দযোজনারীতিকেই প্রথম প্রথম আশ্রয় করিয়াছে। সংস্কৃত প্রকীর্ণকাবতাসংগ্রহধৃত কবিতাগুলির অধিকাংশই প্রাক্‌মুসলমান ও চর্যাপদের সমকালীন যুগের রচনা। ইহাদের সাহায্যে বৌদ্ধ ও হিন্দুপ্রভাবপ্রসূত দুইটি সমান্তরাল ভাবধারায় যুগপৎ প্রবাহ অনুমান করা যায়। কিন্তু তুর্কীবিজয়ের অভিঘাত-প্রতিক্রিয়া ইহাদের মধ্যে একেবারে নিঃস্তব্ধ। উমাপতি ধরের একটি শ্লোকে ম্লেচ্ছরাজপ্রশস্তিতে এই নীরবতা একবারের জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে হয়, কিন্তু ইহা যদি তুর্কবিজেতার স্তুতি হয়, তবে শ্রীধরদাস ইহা তাঁহার সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করিবেন কেন?

অন্যান্য সংস্কৃত রচনার মধ্যে গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী' আদিরসাত্মক খণ্ডকবিতার সমষ্টি। ইহাতে কবি যে প্রাকৃত ও সংস্কৃতের ভাষারীতির মধ্যে তির্যকব্যঞ্জনাগুণের পার্থক্যসম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাহা স্বল্পাক্ষর অর্থগূঢ়তায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বাণী প্রাকৃতসমুচিতরসা বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা।
নিম্নানুরূপনীরা কলিন্দকন্যেব গগনতলং ॥

প্রাকৃতের রস সংস্কৃতে প্রকাশচেষ্টা যেন যমুনার নিম্নপ্রবাহিনী জলকে আকাশে ওঠানোর মত অসাধ্যসাধন। অভিজাত ও লৌকিক ভাষার এই বিভেদজ্ঞানই বাংলার নিজস্ব রীতি-উদ্ভাবনের মূল প্রেরণা যোগাইয়াছে। বারাঙ্গনার বঙ্কিমচরণক্ষেপের যে লাস্যভঙ্গী তাহাও কবি নিপুণ বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন :—

আর্য সপ্তশতী

ঋজুনা নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিলনাগরাচারং।
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেঽপি দণ্ডয়তি ॥

সাধারণতঃ আদিরসপ্রিয় সংস্কৃত কবিগোষ্ঠী অসতী রমণীর রূপবর্ণনায় যেখানে বিহ্বলচিত্ত হইয়া নীতির কথা একেবারে ভুলিয়া যান, গোবর্ধন সেই রূপবিলাসিনীকে সরাসরি ডাকিনী-অপবাদে কলঙ্কিত করিয়া ও গ্রাম্যশাসনবিধিতে দণ্ডনীয়রূপে দেখাইয়া তাহাকে সৌন্দর্যস্বর্গ হইতে সমাজলাঞ্ছনার কঠোর ভূমিতলে অবতরণ করাইয়াছেন। এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে জয়দেবের প্রশংসাবাণীর—শৃঙ্গাররসের সৎ ও প্রমেয় রচনায় গোবর্ধন তুলনারহিত এই মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়। কবির উদ্দেশ্য যে সৎ অথবা নীতিসমর্থিত ও তাঁহার বর্ণনা যে আতিশয্যহীন এই শ্লোকটিই তাহার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ধোয়ীর 'পবনদূত' দূতকাব্যরূপে কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর সার্থক অনুসরণ ও 'গীতগোবিন্দ'-এর পরে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠালাভে ধন্য। কালিদাসের যক্ষবর্ণিত রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত যাত্রাপথ—সৌন্দর্যপরিচয় এই কাব্যে দাক্ষিণাত্য হইতে নবদ্বীপ-ভ্রমণের মধ্যবর্তী ভূভাগের প্রাকৃতিক আকর্ষণের বৃত্তান্তে অনুকৃত হইয়াছে। পরবর্তী কবির বাস্তব চেতনা যে বহু শতাব্দীর ব্যবধানে তীক্ষ্ণতর হইয়াছে ও তাঁহার কল্পলোককল্পনায় ভারতের ভৌগোলিক সত্তা যে আরও সত্যতররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা অনায়াসেই লক্ষ্য করা যায়। কালিদাসের সহিত তুলনায় বাঙালী কবির ভাবপরিবেশ এতটা সার্বভৌমতাৎপর্যমণ্ডিত হয় নাই, তথাপি তাঁহার কল্পনার রথ মাটির আরও কাছাকাছি আসিয়াছে। সুহ্মদেশের গঙ্গাজলবিধৌত স্নিগ্ধতা ও উহার ব্রাহ্মণগৃহিণীদের শশিকলানিভ কোমল তালীপত্ররচিত কর্ণাভরণ বাস্তব সত্যের সার্থকতর পরিচয় বহন করে—উজ্জয়িনী-সৌন্দর্য ও দশার্ন গ্রামের শ্যামশ্রীর মত সম্পূর্ণভাবে কাব্যরমণীয়তার আদর্শানুসারী নয়। এই শ্লোকে ব্রাহ্মণমহিলাদের বিশেষ উল্লেখ তাহাদের দারিদ্র্য ও সুকুমার রুচি উভয়েরই ইঙ্গিত দেয়। ব্রাহ্মণীদের যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না—শ্রেষ্ঠীপত্নীদের যত রত্নাভরণ পরিবার তাহাদের সঙ্গতি নাই। সুতরাং কচি তালপাতা দিয়া তাহারা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে বাধ্য হয়। আর একটি শ্লোকে বাঙালীর সৌন্দর্যসাধনারত, সৎসঙ্গ-উৎসুক, রাজদরবারে স্বীকৃতিকামী ও ভক্তিপ্রবণ জীবনাদর্শের ছবিটি—তাহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণসাধক সত্য শিব ও সুন্দরের আরাধনায় উৎসর্গিত জীবনচর্যার অভীপ্সাটি—গভীর আন্তরিকতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে।

পবনদূত ও গীতগোবিন্দ

লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী আদিরসের লীলাক্ষেত্র, কবিকল্পনার কল্পলোক, এখানে নীতির প্রশ্ন হয়ত অবান্তর। কিন্তু প্রেমবর্ণনায় যেখানে অশালীন আতিশয্য বা স্থূল রুচির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যেখানে কল্পলোকসৃষ্টিতেও বাস্তব জগৎ হইতে উপাদান-সংগ্রহ অনিবার্য, যেখানে প্রাচীন প্রথা ঘটমান জীবনের আশ্রয়ে নব মূর্তিতে প্রতিভাত হয়, সেখানে রুচি-শিথিলতার নিদর্শনগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। বিশেষতঃ যেখানে অচিরকাল মধ্যে ইতিহাসের অভিশাপ আকস্মিক বজ্রপাতের মত বাঙলার ভাগ্যাকাশকে বিদীর্ণ করিয়াছে, সেখানে বিলাসকলা ও প্রমোদ-ব্যসনের আতিশয্য-আড়ম্বরের মধ্যে আসন্ন বিপদের পূর্বসঙ্কেত আবিষ্কার করা অস্বাভাবিক নয়। হয়ত লক্ষ্ণৌ-এর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের

লক্ষ্মণসেনের রাজধানীর রুচিশিথিলতা

ব্যসনাসক্তি তাঁহার পূর্বপুরুষের ধারারই অনুসরণ, কিন্তু যখন রাজ্যচ্যুতি ঘটিয়াছে তখন এই প্রবণতাকে শোচনীয় পরিণতির সহিত কার্যকরণসম্পর্কিত করিয়া দেখা অনেকটা অনিবার্যই মনে হয়। হয়ত কালস্রোতে ক্ষয়িতমূল বাঙলার রাষ্ট্রবনস্পতি বহুদিন হইতেই পতনোন্মুখ ছিল, কিন্তু যে ঝড় উহার পতনের অব্যবহিত কারণ তাহার অভ্যাগম সম্পর্কে আবহতত্ত্বের সন্ধান লইতেই হয়।

৪

(খ)—প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্ট সাহিত্য

কিন্তু উদীয়মান, নব প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ, নব মনোভূমিতে রসান্বেষী বাংলা ভাষার নিকটতর সম্পর্ক হইল প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্ট ভাষায় লিখিত কাব্য-গোষ্ঠীর সহিত, অতীতাশ্রয়ী, প্রথাবন্ধনজর্জর, নূতন যুগমানসের পরোক্ষবার্তাবহ সংস্কৃতের সহিত নয়। যখন প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির উদ্‌গাতাগণ সংস্কৃতের ভিতর দিয়া পুরাণচর্চায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন বাস্তব জীবনের রসধারা এই সমস্ত লৌকিক ভাষার মাধ্যমে জনচিত্তে প্রাত্যহিক জীবনচর্যাকে কাব্যের উপাদানে রূপান্তরিত করিতেছিল। অবশ্য সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকের ক্ষীণ প্রণালী বাহিয়া এই জীবন-কৌতূহলের কিছুটা সাহিত্যে সংক্রামিত হইতেছিল। তথাপি সংস্কৃতের গৌরব যে অতীতচারী ও উহার ভবিষ্যৎ যে বিশেষ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ নয়, এই প্রতীতি মুষ্টিমেয় পণ্ডিতমণ্ডলী ও ধর্মশাস্ত্রব্যাখ্যাতা ছাড়া সকলেই প্রায় উপলব্ধি করিয়াছিল। বৌদ্ধসাধকেরা ধর্মপ্রচার ও তত্ত্বব্যাখ্যার জন্য সংস্কৃতকে যথাসম্ভব বর্জন করিয়া পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও নবোদ্ভিন্ন বাংলাভাষার আশ্রয় লইতেছিল। কৃষ্ণকথা, ভাগবতধর্ম ও বর্ণসঙ্কর দেবদেবীপ্রশস্তি ক্রমশঃ বাংলার মাধ্যমেই অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া যাঁহারা সংস্কৃতে লিখিতেন তাঁহারাও এই দেবভাষার মধ্যে কতটা যথার্থ কাব্যপ্রেরণা লাভ ও ভাবোল্লাস অনুভব করিতেন তাহাও সন্দেহস্থল। জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ-এ সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে উদ্বেলিত ভক্তি ও সৌন্দর্যমিশ্র আবেগের মুক্তি দিবার জন্য শব্দগ্রন্থন, ছন্দো-হিল্লোল ও সঙ্গীতময়তার অন্তঃস্পন্দ সবই জনমানসের ভাবপ্লাবিত অপভ্রংশের নৃত্যচঞ্চল গতিসুষমা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্কৃষ্ণ, বহির্গৌর দ্বৈতরূপের ন্যায় জয়দেবের কাব্যের বাহিরে সংস্কৃতের সম্ভ্রান্ত আবরণ, ভিতরে প্রাকৃত আবেগের দুরন্ত কল্লোল। বাঙালী কবিমন আর দেবভাষার সংবৃত

বাঙালী অন্তরের প্রাকৃতপ্রবাহ

মহিমায়, ভাগবতের শ্লোকগাম্ভীর্যরচিত দুর্ভেদ্য অন্তরালবর্তিতায় সন্তুষ্ট নয়, তাহা মেঘদর্শনোৎফুল্ল ময়ূরের মত শতবর্ণ কলাপবিস্তারে ও অভিরাম নটনভঙ্গীতে নিজ অধীরমুখর আত্মাকে প্রকাশ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। গীতগোবিন্দ যেন সংস্কৃত লিপিতে উৎকীর্ণ দেবভাষারই অপরূপ শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত সমাধি—তাজমহল রচনা করিয়াছে। উহার পরেও অবশ্য—চৈতন্যযুগে নবোৎসারিত ভাবানুভূতির প্রেরণায়—সংস্কৃত সাহিত্যের সাময়িক পুনর্জন্ম হইয়াছে ; চৈতন্যলীলা ও কৃষ্ণলীলার যুগপৎ প্রবাহে বাঙালী চিত্তে যে ভাবোচ্ছ্বাসের জোয়ার জাগিয়াছে তাহা সংস্কৃত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি বিচিত্র ধারায় ক্ষণমুক্তি লাভ করিয়াছে। ভাবের তুঙ্গতা ভাষামহিমাকে স্বভাবতঃই পুনরামন্ত্রণ জানাইয়াছে। তথাপি চৈতন্যলীলাকীর্তনে সংস্কৃতের অংশ গৌণ ; পার্বত্য নির্ঝরিণী যেমন সমতলপ্রবাহিনী নদীকে পুষ্ট করিয়া তাহাতেই মিশাইয়া যায়, তেমনি সংস্কৃত রচনাগুলি বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ও মহাজন পদাবলীর আবির্ভাব সম্ভব করিয়াই নিজ-স্বতন্ত্র মর্যাদা বিসর্জন দিয়াছে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম নবযুগের প্রতীক অর্জুনের নিকট দিব্যাস্ত্র সমর্পণ করিয়া স্বয়ং নেপথ্যচারী হইয়াছে।

এই লৌকিক ভাষাসমূহে কবিতার মধ্যে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের প্রাকৃত রূপটি তির্যক-কটাক্ষসংবর্ধিত হইয়া জনচেতনায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। হালের 'গাথাসপ্তশতী' কালের দিক দিয়া সর্বাগ্রবর্তী। ইহার রচনাকালের শেষ সীমা প্রথম শতাব্দী খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুমিত হইলে ইহা বাংলা ভাষা উদ্ভবের বহুপূর্ববর্তী রচনা। ইহার দুইটি শ্লোকে (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গোপসমাজের স্থূল পরিবেশে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটিতে কৃষ্ণ মুখমারুতের দ্বারা 'রাহিআএঁ' চক্ষে প্রবিষ্ট গোক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা অপসারণ করিয়া অন্যান্য গোপীগণের ঈর্ষ্যা উৎপাদন করিতেছে। দ্বিতীয়টিতে যশোদার চক্ষে কৃষ্ণের অনতিক্রান্তবালস্বভাবে অধিষ্ঠান কটাক্ষে কৃষ্ণমুখপ্রেক্ষিণী গোপীগণের গোপন হাস্য উদ্রেক করিয়াছে। অর্থাৎ

গাথাসপ্তশতী

কৃষ্ণ যে আর ননীচোরা দামোদর নাই, সে যে গোপীদের সহিত প্রেমচর্চানিপুণ হইয়াছে যশোদার এই বাস্তব সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা গোপীদের হাসির খোরাক যোগাইতেছে। এই দুইটি পদের মধ্যে কোন অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা নাই। ইহারা প্রাকৃত আকর্ষণেরই পরিচয় দিতেছে। এই দুইটি শ্লোক প্রমাণ করে যে ভাগবত রচনার বহু পূর্বে কৃষ্ণের লৌকিক নাগরালির নায়করূপে খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হয়ত কৃষ্ণলীলার এই

জনসমাজপ্রচলিত লৌকিক বৃত্তান্তটিই তাঁহার ঐশী মহিমাপ্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী। গঙ্গাদাসের 'চন্দোমঞ্জরী' হইতে উৎকলিত বহুপরবর্তী আর একটি অবহট্ট-রচিত শ্লোকে (ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৪৯-এ উদ্ধৃত)

রাঈ দোহড়ী পরণ সুনি হসিউ কণ্‌হ গোআল।
বৃন্দাবনঘনকুঞ্জঘর চলিউ কমণ রসাল॥

কবিতাটি একেবারে আমাদিগকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাবপরিমণ্ডলে সোজা পৌঁছাইয়া দেয়। প্রথমতঃ রাধা কর্তৃক ছড়ার আবৃত্তি বড়ু চণ্ডীদাসের প্রবাদবাক্য-প্রাচুর্যের প্রয়োগরীতিটির পূর্বাভাস। দ্বিতীয়তঃ 'কণ্‌হ গোআল' কৃষ্ণের সমস্ত দেবমহিমা অস্বীকার করিয়া তাঁহার গ্রাম্যতরুণসুলভ অমার্জিত প্রকৃতিটির পরিচয় বহন করে। কৃষ্ণের হাসিটিও তাঁহার ইঙ্গিতজ্ঞতার নিদর্শন। 'কমণ রসাল' বাক্যাংশটি তাঁহার সুলভ আত্মতৃপ্তিসূচক রসবিহ্বল পদক্ষেপের ইঙ্গিতদ্যোতক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বাভাস

ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক উদ্ধৃত ধার শিলালিপিতে অবহট্টের মাধ্যমে সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সৌন্দর্যরুচির একটি কৌতুককর তুলনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতীয় ঐক্য শুধু ধর্মব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল না, রূপপ্রতিযোগিতা-বিষয়েও বিভিন্ন প্রদেশের একটি মিলনক্ষেত্র ছিল। এখানে প্রত্যেক প্রদেশের সুন্দরীনারীসংগ্রাহক আপন আপন রাজ্যের নারী-সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা সাড়ম্বরে ঘোষণা করিয়া ও অন্যান্য রাজ্যের রুচির প্রতি বিদ্রূপকটাক্ষ করিয়া বাস্তবরসস্ফুরণের এক অপূর্ব পরিচয় দিয়াছে। প্রায় সমকালীন ইংরাজ কবি চসারের তীর্থযাত্রীদের বর্ণনার মত এই পরিকল্পনাটিও ক্ষুদ্রতর পরিধিতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রসাধনকলা ও রূপাদর্শের পার্থক্যের ও মেজাজ-বৈষম্যের ইঙ্গিত দেয়। কেশরচনার বিভিন্ন ছাঁদ, অলঙ্কারসজ্জার রীতিবিভেদ ও কাব্যোচ্ছ্বাসের আপেক্ষিক পরিমাণ লইয়া ইহাদের আকর্ষণ-তারতম্য নির্ধারিত হইয়াছে। অঙ্গসৌন্দর্যের প্রত্যক্ষ বর্ণনা বিশেষ নাই, তবে উপমাসাহায্যে কবির মানস উত্তেজনার পরোক্ষ প্রকাশ অনুমান করা যায়। কোন সুন্দরীর ওষ্ঠাধরপ্রান্ত জুঁই ফুলের ন্যায়; কাহারও বা স্তনদ্বয়ের রক্তিম উচ্চতা; টাক্কযুবতীর দোরঙা কাচলি যেন সন্ধ্যার সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলন, আর ঘাগরা ও ওড়না কর্ণাটসুন্দরীর কাছাকোঁচা-দেওয়া পরিচ্ছদকে লজ্জা দেয়। বঙ্গকিশোরীর টেড়িকাটা কেশবিন্যাস, খোঁপার উপর অলঙ্কার যেন রাহুগ্রস্ত রবি-ছবি, কর্ণভূষণ তাড়িপাত, রোমাবলী-

সংসক্ত সূতার হার যেন গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের ন্যায় বর্ণবৈপরীত্যে শোভমান; পরিধান-বস্ত্র কিন্তু শ্বেতবর্ণ। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বাঙালী মেয়ের রুচিবৈশিষ্ট্য চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে। ইহার পর মালবজাতীয় রূপবণিক্ গৌড়ীয় ব্যবসায়ীকে যে ব্যঙ্গ করিয়াছে তাহাতে কি বাঙালী সম্বন্ধে অন্যপ্রদেশবাসীর ধারণার যথার্থ প্রতিফলন হইয়াছে? গৌড়ীয়ের কোপন স্বভাবের জন্য সকলেই তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বর্জন করে।

প্রাকৃতে বস্তুরস-স্ফুরণ-নিদর্শন

এই উদ্ধৃতিতে মধ্যযুগপ্রারম্ভের কয়েকটি বিচিত্র রূপচিত্র, ভারতীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে রীতি-আচার-সংস্কৃতির ঐক্যটি বর্ণাঢ্য রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এই পদগুলি পড়িয়া মনে হয় যে প্রাদেশিক সাহিত্যের উদ্ভবের পূর্বে সর্বভারতীয় সংস্কৃত বা প্রাকৃত-অপভ্রংশের আশ্রয়ে আমরা পরস্পরকে জানিবার ও বুঝিবার পথে যতটা অগ্রসর হইয়াছিলাম, প্রাদেশিক সাহিত্যচর্চার ফলে সেই সার্বজনীন বোধগম্যতা হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়াছি। বিশেষতঃ প্রাকৃতের মাধ্যমে আমাদের মনে যে বস্তুরসের স্ফুরণ হইয়াছিল কৃত্রিম আদর্শ অনুসরণের ফলে আমাদের উচ্চচিন্তা ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের অতিলালনের জন্য তাহার সহজ প্রবাহ যে অনেকটা অবরুদ্ধ হইয়াছে তাহা সর্বথা স্বীকার্য।

অবহট্টে লেখা দোহাকোষগুলি চর্যাপদের প্রায় সমসাময়িক ও প্রায় একই কবিগোষ্ঠীরচিত। ভাষার দিক দিয়া ইহা চর্যাপদের ভাষার কিঞ্চিৎ পূর্বরূপ ও বাংলাপূর্বাভাসরিক্ত। কিন্তু উহার রচনাভঙ্গী ও সাধনাতত্ত্ব অভিন্ন। সুতরাং উহাদের বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুভঙ্করীর আর্যা ও ডাকের বচনে অবহট্টের কিছু কিছু চিহ্ন ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে রক্ষিত হইয়াছে। কিছু প্রহেলিকা-রচনায় ও অর্থহীন বাগ্‌বিন্যাসের মধ্যেও সংস্কৃত, অবহট্ট ও বাংলার কৌতুককর সংমিশ্রণ দেখা যায়। মোটকথা, কবিরা যে ভাষানৈরাজ্যের যুগে বাস করিতেন ও বাগ্‌বিশৃঙ্খলার যদৃচ্ছ বিন্যাস হইতে তাঁহারা যে কৌতুকরস আহরণ করিতেন তাহাও এই যুগের রচনায় অনুভূত হয়।

অবহট্ট

৫

'প্রাকৃতপৈঙ্গল'—এর সঙ্কলনকাল চতুর্দশ শতকের কাছাকাছি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহা মুসলমান-বিজয়ের পরের সঙ্কলন; কিন্তু উহাতে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ববর্তী রচনাই সংগৃহীত আছে। কালের দিক হইতে ও যুগোচিত কবি-প্রেরণার নিদর্শনরূপে ইহা 'সুভাষিতরত্নকোশ' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' হইতে কিছুটা

কম মূল্যবান। কিন্তু ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দো-রীতিমুক্ত নবোদ্ভিন্ন বাংলা কোন্ নূতন জীবনক্ষেত্র লইতে রস আকর্ষণ করিতে উন্মুখ ছিল ও কেমন করিয়া উহার সংস্কৃত-অনুকৃতিশ্লথ, প্রথাজীর্ণ ধমনীর মধ্যে বিষয়বৈচিত্র্যের কৌতূহল, ভাবানুগামী ভাষারীতির নমনীয়তা ও বিপুল ছন্দোল্লাস নবরক্তধারার ন্যায় সঞ্চারিত হইতেছিল। পঞ্চদশ শতক হইতে বাংলা সাহিত্যের পুরাণানুবর্তিতা, উহায় সংস্কৃত-আধিপত্যের পুনঃস্বীকৃতি ও ধর্মাদর্শনিয়ন্ত্রিত জীবনবিমুখতা উহার স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সংস্কৃতের সহিত অন্তরঙ্গ যোগ উহার সর্বভারতীয় সম্পর্কটি স্ফুটতর করিয়াছে, কিন্তু উহার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কিয়ৎ পরিমাণে অবদমিত করিয়াছে। যদি প্রাকৃতের রসধারাটি বাংলায় অক্ষুণ্ণ থাকিত, তবে বাংলা কবির প্রত্যক্ষদৃষ্টি স্মৃতিকল্পনার ছায়াপাতে স্তিমিত হইত না, মঙ্গলকাব্য পুরাণের অনুকরণে নিজ অনুভূতিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিত না বা বৈষ্ণব পদাবলীতে বৃন্দাবনলীলার ভাবাসঙ্গস্নিগ্ধতায় বাঙলার নিসর্গদৃশ্যের বাস্তব প্রখরতা গোধূলিম্লান বা কল্পলোকভাস্বর হইত না। তাহা হইলে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র বা ঈশ্বরগুপ্ত ব্যতিক্রম না হইয়া নিয়মই হইতেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্বর্গেমর্তে শুধু ভাবের মিলন না হইয়া রূপেরও সমীকরণ সাধিত হইত। সাহিত্যে সরসতা কেবল আদিরসসম্পৃক্ত কষ্টকল্পনায় সীমাবদ্ধ থাকিত না; জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রচুর-বিকীর্ণ হইত, শুধু আনুবীক্ষণিক দৃষ্টির সাহায্যে আবিষ্কৃত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিত না। বাহির হইতে সৌন্দর্যবোধ-আহরণের ফলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথকে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি। কিন্তু ইহার জন্য আমাদের যে মূল্য দিতে হইয়াছে তাহাও তুচ্ছ নয়। এই মিশ্র সংস্কৃতির কৃপায় আমরা সাহিত্যসম্রাট ও কবিসার্বভৌমকে পাইয়াছি, কিন্তু এই মুষ্টিমেয়-সংখ্যক কোটিপতি পাওয়ার জন্য আমাদের অসংখ্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সহজ শ্রী ও সচ্ছলতা বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

প্রাকৃতপৈঙ্গলের গুরুত্ব

এইবার 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'-এর কবিতাগুলির একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রেম ও প্রকৃতিবর্ণনামূলক কবিতাই ইহাদের মধ্যে প্রধান। প্রেমকবিতাগুলি সংস্কৃত আদর্শে কল্পিত, কিন্তু উহাদের শব্দবিন্যাসে ও ছন্দপ্রবাহে সংস্কৃতের গুরুগম্ভীর, সমাসসন্ধিব্যূহবদ্ধ দীর্ঘবাক্যযোজনার পরিবর্তে পাই বর্ণনার সৌকুমার্য ও সূক্ষ্ম আকৃতির সঙ্গীততরঙ্গিত প্রকাশ। প্রকৃতিবর্ণনার আবির্ভাব প্রায় প্রেমের অনুষঙ্গরূপে, কিন্তু তাহাতেও গ্রীষ্ম, বর্ষা বা বসন্তের ঋতু-আবেদনের

সহিত অন্তরানুভূতির স্পন্দনটি একটি অপূর্ব রাসায়নিক সংযোগে মিশিয়াছে ও দুইএ মিলিয়া একটি যৌগিক ভাবাবহসত্তা সৃষ্ট হইয়াছে। এই কবিতাগুলি যে বিদ্যাপতির পদাবলীর পূর্বসূচনা ও প্রত্যক্ষ প্রেরণাদাতা তাহা আমরা সহজেই অনুভব করি। ইহাদের মধ্যে জয়দেবের শব্দৈশ্বর্য ও সঙ্গীতঝঙ্কারমুখরতা বা বড়ু চণ্ডীদাসের প্রত্যক্ষ-দর্শনের আলঙ্কারিকরীতিপ্রভাবিত উদ্বর্তিত শিল্প-রূপ নাই। সহজ অনুভব ও সাবলীল প্রকাশ ইহাদের মধ্যে একটি অনায়াসসিদ্ধ মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এই সুর শোনা যায়। কিন্তু অধ্যাত্মব্যঞ্জনার চাপা সুর ও ভক্তিরসের সর্বব্যাপ্ত গাঢ়তার জন্য এই ধ্বনির মধ্যে এক নিগূঢ়তর অনুরণন ইন্দ্রিয়দ্বার অতিক্রম করিয়া অনির্দেশ্য রহস্যবোধের আকুলতা জাগায়।

প্রাকৃতপৈঙ্গল্যের রচনাবৈশিষ্ট্য

কৃষ্ণকথা সম্বন্ধেও বাঙালীর জ্ঞান ও অনুরাগ যে বাড়িতেছে তাহারও নিদর্শন সঙ্কলন-গ্রন্থটিতে মিলিবে। কৃষ্ণের নৌকাবিলাসের যে অপৌরাণিক কাহিনী তাহাও যে আদিরসমিশ্র ভক্তিরসের লৌকিক কল্পনা-উদ্ভাবিত হইয়া রাধাকৃষ্ণলীলার অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহা আমরা এখানে জানিতে পারি। সম্ভবতঃ প্রাকৃতরুচি-কল্পিত এই আখ্যানটি এই উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়া বড়ু চণ্ডীদাসের আখ্যায়িকা-কাব্যে স্থান পাইয়াছে। কৃষ্ণকথার অভিজাত সংস্করণ উন্নত ভাবাদর্শের সহিত নৃত্যগীতসমন্বিত চটুল-তরল প্রণয়মুগ্ধতায় সংমিশ্রিত হইয়া 'গীতগোবিন্দ'-এ এক পল্লবিত কাব্যরূপ ও নাট্যসঙ্কেতময় ঘটনাবিস্তারের পরিণতি লাভ করিয়াছে। এখানে প্রাকৃত রসাকুলতা কাব্যমহিমার গুণে মর্যাদার তুঙ্গ শৃঙ্গে আরূঢ় হইয়াছে ও এক লঘু আসক্তির গীতিউচ্ছ্বাসময় কাহিনী সর্বভারতীয় শাশ্বত ভক্তি ও সৌন্দর্যের স্বর্গে স্থান লাভ করিয়াছে। আর প্রাকৃত কাহিনীটি স্থূল রুচি ও ভোগলালসার কলঙ্কচিহ্ন সর্বাঙ্গে বহন করিয়াও বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে নায়িকার বিরহবেদনার মর্মভেদী তীব্রতায় এক বিশুদ্ধতর সত্তায় উদ্বর্তিত হইয়াছে। চৈতন্যপূর্ব যুগে এই দুইখানি কাব্য রাধাকৃষ্ণসম্পর্কের দুইটি ধারার উন্নততম প্রকাশরূপে প্রতিযোগী গৌরবে অধিষ্ঠিত। তাহার পর চৈতন্য-প্রভাবের ফলে যখন এই প্রেম-কাহিনীর অধ্যাত্মীকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে তখন প্রাকৃত ধারার মলিন-প্রবাহ ভাগবতী চেতনার দিব্য জ্যোতিঃসমুদ্রে বিলীন হইয়া উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়াছে।

প্রাকৃতপৈঙ্গলে কৃষ্ণকথা

প্রাকৃতপৈঙ্গল-এর কৃষ্ণবন্দনার মধ্যে-শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ ও মাধুর্যরূপের মধ্যে কবিচেতনায় কোন তারতম্যবোধ লক্ষিত হয় না—শক্তির দুর্ধর্ষতা ও প্রেমের

স্নিগ্ধতা উভয় উপাদানই তাঁহার অলৌকিক বিভূতির মধ্যে তুল্যভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবানের চাণুর-বধের দ্বারা নিজকুলের কীর্তিপ্রতিষ্ঠা ও তাঁহার ভ্রমরবরের স্থায় রাধামুখমধুপান একই লীলাসূত্রে গ্রথিত। এই ঐশ্বর্যমাধুর্যের সমন্বয়ে ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দসঙ্গীতের তরঙ্গিত গতিতে জয়দেবের সহিত সাদৃশ্য সহজেই লক্ষণীয়। তবে কবি জয়দেবের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার উপাদান নাই।

ঐশ্বর্য-মাধুর্যের সমন্বয়

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতায় শান্ত, পরিতৃপ্ত গৃহজীবনের যে কয়েকটি চিত্র পাওয়া যায়, তাহা প্রাক্-তুর্কী-বিজয় যুগের সন্তোষ-সচ্ছলতাময়, নিরুদ্বেগ, নীতি-সংযত গার্হস্থ্য পরিবেশেরই সঙ্কেত বহন করে। যে সমাজের আশ্রয়ে এইরূপ জীবনযাত্রা অতিবাহিত হইয়াছে তাহার উপর দিয়া কোন রাষ্ট্রবিপ্লবের ধ্বংসকারী ঝটিকা যে বহিয়া যায় নাই, এ বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায়। বহু শতাব্দীর জীবনচর্যার নিয়মিত ছন্দ, পুরুষপরম্পরা-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সুনিশ্চিত প্রত্যয়বোধ এই পংক্তিগুলির মধ্যে গতির মসৃণতা ও শান্তরসের স্থিরতা সঞ্চার করিয়াছে। এখানে অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সমস্ত অশান্ত বিক্ষোভ যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। জীবনরসের পরিহাসস্নিগ্ধ উপভোগও এখানে মানস-শান্তির পরোক্ষ প্রমাণরূপে অনুপস্থিত নয়।

প্রাক্-তুর্কী যুগের নিদর্শন

এই রচনাগুলিকে যদি মুখ্যতঃ চর্যাপদের সমকালীন বা অল্প পরবর্তীরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাঙালীর ভারসাম্যবিপর্যয়ের কোন লক্ষণ ইহাদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য হইবে। তাহা হইলে চর্যাপদ ও বিদ্যাপতি-বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যে ব্যবধানকালে বাঙলার কবিমানস কিরূপ সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যাপৃত ছিল তাহার ইতিহাস অনুমানগ্রাহ্যও হইবে না। মুসলমান-অভিভবের অব্যবহিত পরে যে রাজনৈতিক উৎপীড়ন ও সাংস্কৃতিক উন্মূলন বাঙালী জাতিকে দিশাহারা ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল সেই বিরাট শূন্যতাবোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাতি কি নূতন আশ্রয় খুঁজিয়াছিল তাহা আমরা জানি না। অবশ্য ইহার পরবর্তী যুগের ইতিহাস পুরাণের অনুবাদ ও মঙ্গলকাব্যের নবধর্মরচনার প্রয়াসের মধ্যে নিজ স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম বিপর্যয়-যুগের কোন নিশ্চিত উপকরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে কি না সন্দেহ। বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ ও বিহারজয়ের প্রায় দুইশত বৎসরের পর জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি কতকটা আত্মস্থ হইয়াছে।

রচনার ঐতিহাসিক পটভূমি

দাবানলবেষ্টিত আরণ্য পশু-পক্ষীর ন্যায় প্রচণ্ড আঘাতের প্রথম বিহ্বল, বিমূঢ় ক্ষণে ত্রস্তভীত বাঙালী পলায়নে আত্মরক্ষা খুঁজিয়াছে—তাহার পুঁথিপত্র ও ধর্ম-আচার লইয়া সে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণভয়ে দৌড়াইয়াছে। তাহার এই আপৎকালীন আশ্রয়স্থলের মধ্যে নেপালের হিন্দুরাজদরবারই তাহাকে প্রধানতঃ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়াছে এবং সেই নেপালদরবার হইতেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার ন্যস্ত সাহিত্য-সম্পদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান নিদর্শন 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করিয়াছেন। বাঙলার প্রত্যন্ত প্রদেশে হিমালয়পাদদেশের দুর্গম গিরিসঙ্কটে প্রাচীনতম বাংলা পুঁথির অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারই বিপদের গুরুত্ব ও ভীতির দূরপ্রসারী পরিধির পরিমাণ। হিমালয়শীর্ষে সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল-প্রাপ্তির ন্যায়ই সমতল। নদীমাতৃক বাঙলার মানস ফসলের নেপালপার্বত্যঅঞ্চলে সংরক্ষণ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজগত ভূমিকম্প-আলোড়নের প্রচণ্ডতার পরিচয়বাহী।

যুদ্ধাদি বর্ণনার চিত্র

অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহের কিছু উল্লেখ ও বর্ণনাত্মক শ্লোক সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহট্ট-সব ভাষাতেই পাওয়া যায়। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ লক্ষ্মণ সেনের দিগ্বিজয়-প্রশস্তি, 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'-এ সভাসদ কবি কর্তৃক কোন কোন রাজার প্রতিবেশী রাজবর্গের উপর জয়ঘোষণা ও এই বিরোধী-রাজাদের দুর্দশা-উপভোগ, ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে অবহট্ট রচিত মিথিলাধিপতির শত্রুপরাজয়-সংবর্ধনাসূচক দুইটি পদ—এগুলি যেন প্রেম ও দেবস্তুতির একাধিপত্যের মধ্যে জীবনের কঠোরতর সংঘর্ষের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ, শ্যামশ্রীমণ্ডিত উপবনভূমি ও ঊর্ধ্বস্থিত আকাশনীলিমার উপকণ্ঠে রুক্ষ মরুর ঈষৎ দ্যোতনা। তবে এ যুদ্ধবিগ্রহবর্ণনাও প্রথানিয়ন্ত্রিত, ছাঁচে ঢালা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উত্তাপহীন অলঙ্কারমুখরতায় রণক্ষেত্রের বিভীষিকাসঞ্চারের কৃত্রিম প্রয়াস। তুর্কী-উপপ্লবের যথার্থ নিদারুণ প্রতিক্রিয়া কেবল বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'—'কীর্তিপতাকা'য় কাব্যরূপ পাইয়াছে। উহাদের মধ্যেই আমরা জাতিবৈরের উৎকট প্রকাশ, সংস্কৃতির মর্মমূলে আঘাতের প্রচণ্ডতা, উহার সুদূরপ্রসারী সমাজবিপর্যয় ও মানস উদ্‌ভ্রান্তির কতকটা যথার্থ ধারণা করিতে পারি। এই অবস্থা কাটাইয়াই বাংলা সাহিত্য, জীবনবোধ ও ধর্মসংস্কৃতিকে ছিন্ন সূত্রগুলির, আবশ্যকীয় পরিমার্জনার সহিত, পুনঃসংযোজনা করিতে হইয়াছে। সূতামেরামতের ও নবসূত্রসংযোগের সময় উচ্চতর সাহিত্যবয়নশিল্প হয়ত সাময়িক-ভাবে বন্ধ ছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

চর্যাপদ

'চর্যাপদাবলী' বা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'আশ্চর্য চর্যাচয়' বাংলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন অথবা বাংলাভাষার উদ্ভবের অব্যবহিত পূর্ববর্তীরূপ, অপভ্রংশের উদাহরণরূপে সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাদের রচনাকাল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের অন্তর্বর্তী কালে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই চর্যাগুলিতে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহজযান নামে এক বিশেষ তান্ত্রিক যোগসাধনার কথা বিবৃত হইয়াছে। এই মতবাদের সারাংশ হইল যে, চিত্তের সহিত বিষয়-সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ও সমস্ত ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া উহাকে 'শূন্যতা'-বোধে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই শূন্যতা-বোধের সহিত সমদর্শিতা-হেতু করুণার সংযোগ হইলে চিত্ত নির্বাণ লাভ করে ও নির্বাণের মধ্য দিয়া এক মহাসুখের গভীরতায় বিলীন হয়। মোটামুটি হিন্দু দর্শনের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, তবে ইহার পারিভাষিক শব্দগুলি—শূন্যতা, করুণা, মহাসুখ—প্রভৃতি কিছুটা স্বতন্ত্র। এই উপাদান ও অনুভূতিগুলি হিন্দু দর্শনেও আছে, তবে বৌদ্ধ দর্শনে ইহাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ও ইহাদিগকে একটা বিশেষ সম্পর্ক-সূত্রে গাঁথা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে হিন্দুধর্ম ও সাধনার প্রতি, বেদ ও উপনিষদের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতি কিছুটা ব্যঙ্গ-কটাক্ষ করা হইলেও, উহারা যে প্রকৃত সিদ্ধির নির্দেশ দিতে পারে না। এইরূপ অভিমত ব্যক্ত হইলেও, হিন্দু সাধন-প্রক্রিয়ার সহিত ইহাদের ধর্মমতের কোন মৌলিক প্রভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। চর্যাপদে গুরুবাদের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে, এবং ভগবান ও তাঁহার প্রতি ভক্তির কোন উল্লেখ নাই। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ও মহানন্দ-অনুভব যে প্রকৃত সিদ্ধির একমাত্র উপায়—এই সিদ্ধান্তই পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাংলা ভাষার আদিম রূপ: সহজবাদের কাব্য-প্রয়োগ

এই চর্যাপদগুলির দার্শনিক মতবাদ ইহাদের সম্বন্ধে প্রধান কথা নয়; ইহাদের ধর্মমত যেরূপ সার্থক উপমা ও রূপক প্রয়োগে এবং সঙ্কেতময় কবিত্বপূর্ণ ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতেই ইহাদের কাব্য-মূল্য নিহিত। অন্যূন তেইশ জন পদকর্তা প্রায় পঞ্চাশটি পদ রচনা করিয়াছেন এবং ইঁহাদের রচনাভঙ্গী ও ধর্মতত্ত্বের অনুভূতির মধ্যে এক নিবিড় ঐক্য দেখা যায়। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে,

বাংলা ভাষার আদিম যুগে এই বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজযান সমাজমধ্যে এত ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল যে, দুই শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন স্থান ও কালের বহু কবি ইহাকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ঐক্যবদ্ধ সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টার দ্বারা ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। মনে হয় যেন উহাদের রচনার যুগে বাঙলার নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ অধিকাংশই বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম অভিজাত সমাজে প্রচলিত থাকিলেও এবং সংস্কৃত ভাষায় ইহার আলোচনা হইলেও বৌদ্ধ সহজিয়াযানই সর্বপ্রথম দেশীয় ভাষাতে জনচিত্তের নিকট আবেদন জানায়। ইহাতে যে-ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে সাধনার গোপনতত্ত্ব অনেকটা হেঁয়ালির রীতিতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া উহাকে 'সন্ধ্যাভাষা' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ভাষা-প্রয়োগের উদ্দেশ্য অদীক্ষিত লোকের নিকট যাহাতে ইহার গূঢ় অর্থ উদ্‌ঘাটিত না হয়; এবং পরবর্তী যুগের সহজিয়া-তত্ত্বে অভিজ্ঞ টীকাকার ও চর্যাগুলির তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে সাহায্য না পাইলে উহাদের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা আধুনিক যুগে প্রায় অসম্ভবই হইত। তথাপি মনে হয় যে, উপমা ও সন্ধ্যাভাষার দ্বারা এই তত্ত্বের উপর আলোকপাত করা ও উহাকে সাধারণ জীবনযাত্রা ও নরনারীর প্রেমের রূপকে ব্যাখ্যা করিয়া রসিক পাঠকচিত্তের নিকট বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করিয়া তোলাও চর্যাকারদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। চর্যাপদসমূহ ধাঁধার আকারে লেখা হইলেও উহার মধ্যেই উহাদের অর্থবোধের গোপন সঙ্কেত নিহিত আছে।

সন্ধ্যাভাষা

এই পদগুলিতে উপমা ও তত্ত্বালোচনার ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে সমাজ-জীবনের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে সেই যুগের জীবনযাত্রার কিছুটা ধারণা করা যায়। চর্যাকারগণ তান্ত্রিক রীতি-অনুযায়ী নিজেদের নামকরণ করিয়াছেন; যথা,—কাহ্নুপাদ, কুক্কুরীপাদ, ডোম্বীপাদ, শবরপাদ ইত্যাদি। তাঁহারা তাঁহাদের সাধনার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য সাধারণতঃ নীচ, অন্ত্যজজাতীয় সমাজ হইতেই উপমার উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুঁড়ি, ব্যাধ বা শবর, ডোম জাতি ছাড়া উলঙ্গ সন্ন্যাসী, চণ্ডাল প্রভৃতি সমাজের নিম্ন-স্তরের লোকেরাই নির্বাণ-আনন্দ ও ধর্ম-সাধনার রূপক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য, ইহাদের একটা করিয়া অধ্যাত্ম-ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে,—যেমন অস্পৃশ্যা ডোম্বী ইন্দ্রিয়াতীত মহাসুখেরই প্রতীক। তথাপি চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব-আলোচনায় হিন্দুসমাজের নীচ-জাতীয় ব্যক্তিবর্গের রূপক-প্রয়োগে ইহাই অনুমান করা যায় যে, এই ধর্ম রাজধর্মের মর্যাদা হারাইয়া প্রকৃত জনসাধারণের

নিম্নতম সমাজের পরিচয় ও প্রাধান্য

মধ্যেই প্রচলিত ছিল—হিন্দু সমাজে যাহাদের আসন যত নীচে, বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মে তাহাদেরই মর্যাদা তত বেশী। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ চর্যাকারদের নিকট একেবারেই অগ্রাহ্য, উহার বদ্ধমূল সংস্কারকে আঘাত করিয়াই ইঁহারা নিজ ধর্মমতের পার্থক্য ঘোষণা করেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সংকলনে সংগৃহীত পদগুলি সম্ভবতঃ পাল-রাজত্বের শেষের দিকে ও সেনবংশের প্রতিষ্ঠার কালে, একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিতে পারে। অবশ্য, এই জাতীয় কবিতার ধারা হয়ত আরও দুই শতাব্দী পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল, অন্যথা ইহাদের ভাবগত ঐক্য ও বহুল বিস্তৃতি সম্ভব হইত না।

শব্দ-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য

ইহাদের শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। বহুপ্রচলিত শব্দসমূহের উপর বিশিষ্ট রূপক-অর্থ আরোপিত হইয়া সাধারণ বস্তুকে অসাধারণ রূপে দেখানো হইয়াছে। 'কুম্ভীর' 'কুম্ভকযোগ' অর্থে, 'শাশুড়ী-বধূ' 'সাধারণ শ্বাসক্রিয়া ও 'নৈরাত্মা'-অর্থে, 'ননন্দ', 'শালী' 'ইন্দ্রিয়বোধ ও ইহার রোধ'-অর্থে, 'মন্ত্রী ও ঠাকুর' দাবা খেলার মন্ত্রী ও রাজা, 'প্রজ্ঞা ও বিষয়ানুরত বোধিচিত্ত'-অর্থে, 'সোনা ও রূপা' 'শূন্যতা ও রূপানুভূতি'-অর্থে, 'মূসা বা মূষিক' 'চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহ'-অর্থে, 'বেঙ্গ বা ব্যাং' 'অবয়বহীন শূন্যতা'-অর্থে, 'বলদ ও গাই' 'রূপজগতের স্রষ্টা মন ও নৈরাত্মা'-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। এ ছাড়া বঙ্গ ও বঙ্গাল শব্দকে এক অদ্ভুত ও কৌতূহলপূর্ণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। 'বঙ্গে জায়া নিলেসি' (৩৯ নং পদ), 'অদঅ বঙ্গালে ক্লেশে লুড়িউ' ও 'আজ্জ ভুসু বঙ্গালী ভইলী, নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী'—এই বাক্যগুলিতে বঙ্গালের কোন বিশেষ ভৌগোলিক অর্থ আছে কি না তাহা অনিশ্চিত, তবে বঙ্গালের রূপক-অর্থ যে অদ্বয়-জ্ঞান, অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের অভেদ সম্বন্ধে সহজ প্রতীতি, ইহা টীকাকার কর্তৃক পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙলা দেশ এই অভেদ-সাধনার লীলাভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল ও সাধক-জীবনের উন্নততম পরিণতির সহিত ইহার যোগ রহিয়াছে এইরূপ ধারণাই আমাদের জন্মে। সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদ চণ্ডালীকে নিজ পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সমস্ত জগতের ঐক্যজ্ঞান লাভ করিয়া যে বাঙালী হইয়াছেন অর্থাৎ সাধনমার্গের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন—এই প্রশংসাসূচক উক্তিই লেখকের উদ্দেশ্য। চর্যাপদ বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম রচনা কিনা, অথবা সিদ্ধাচার্যেরা সকলেই বাঙালী ছিলেন কিনা, এই বিষয়ে সন্দেহ করা হইয়াছে। এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এই

বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতায় বাঙলা দেশের প্রতি একটি সম্মানজনক আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

চর্যাপদের মধ্যে অনেক প্রবচন-জাতীয় সংক্ষিপ্ত, শাণিত ও মানব-অভিজ্ঞতা-প্রসূত উক্তি মেলে। এইগুলি ষোল আনা বাঙালী-জীবন-সম্পর্কিত কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। না গেলেও বাঙালী-জীবনযাত্রার মোটামুটি ইঙ্গিত যে ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা নিঃসন্দিগ্ধ।

চর্যাপদে প্রযুক্ত প্রবচন

'নিঅড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক' (৩২নং পদ) প্রবচনে লঙ্কা যে দূরবর্তী স্থানের প্রতীক তাহা বোঝা যায়, এবং সত্য মানুষের অন্তরেই বাস করে, উহাকে খুঁজিতে দূর-দূরান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই এই তত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী' (৬নং পদ) বাক্যটির মধ্যে অতীত মৃগয়া-যুগের একটি জীবনসত্য . প্রতিফলিত—হরিণ নিরীহ প্রাণী হইয়াও কেবল নিজের সুস্বাদু মাংসের জন্য সমস্ত জগতের আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে যামায়' (৩৩ নং পদ) উক্তিতে সাধনার দ্বারা যে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ব্যক্তির স্বতন্ত্র জীবন আবার যে নিজ উৎসে ফিরিয়া বিশ্বজীবনে লীন হইতে পারে তাহারই ইঙ্গিত মিলে। 'বলদ বিআঅল গবিয়া বাঁঝে' (৩৩নং পদ), ইহাতে অধ্যাত্ম-সত্য যে প্রাকৃতিক সত্যের বিপরীত তাহা একটি আপাতত অসম্ভব উক্তির মধ্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে; অবশ্য এখানে 'বলদ' ও 'গাভী' রূপক-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'বর সুণ গোহালী কি মো দুট্ঠ বলন্দে' (৩৯নং পদ) 'দুষ্ট বলদ হইতে বরং শূন্য গোয়াল ভাল' কৃষিনির্ভর জীবনের এই অভিজ্ঞতাজাত সত্য এক গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব নির্দেশ করিতেছে। 'ভাগতরঙ্গ কি সোষই সাঅর' (৪২ নং পদ) উক্তিতে ব্যক্তিজীবনের ক্ষয়ে সমগ্র জীবন-স্রোতের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, বহিঃ-প্রকৃতির দৃষ্টান্তে এই সত্যের সমর্থন করা হইয়াছে। 'দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তে ণ দেখই' (৪২নং পদ), ইহাতে অধ্যাত্ম সত্য যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত তাহা বোঝান হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চর্যাকারগণ সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেও বহির্জীবনের মূলসত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন ও জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যগুলিকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের সাধন-পদ্ধতিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

চর্যাপদগুলির মধ্যে আমরা তৎকালীন সমাজের যে-একটি আংশিক ছবি প্রত্যক্ষ করি তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তখন বাংলা দেশের ভৌগোলিক পরিধি পরবর্তী যুগের দেশসীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর বিস্তৃত ছিল, সুতরাং

উড়িষ্যা, আসাম ও মগধ-অঞ্চলের কোন কোন সমাজদৃশ্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে। পদ্মার খালে নৌকা বাহার চিত্র হয়ত নদীমাতৃক বাঙলা দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু উঁচু পর্বত ও পর্বতের গায়ে নিবিড় জঙ্গল আসাম অঞ্চলেরই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। মোটামুটি বৃহত্তর বঙ্গেরই একটা জীবনযাত্রার ছবি চর্যাপদে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গাছের তেঁতুল ফল বাঙলার অতি প্রিয় খাদ্য; শাশুড়ীর ঘুমাইয়া যাওয়া ও বধূর জাগিয়া থাকা হয়ত বাঙালী পরিবার ছাড়াও অন্যত্র দ্রষ্টব্য। শুঁড়িনীর চিকন কাপড়ে মদ বাঁধা, মোহতরুকে ফাড়িয়া পাটি জোড়া, সাঁকোর সাহায্যে খরবেগ নদী পার হওয়া, মৃগয়ার জন্য হরিণ খোঁজা ও উহাকে বাণে বিদ্ধ করা, নৌকা বাহিবার পূর্বে উহার খুঁটি উপড়ানো ও কাছি খুলিয়া দেওয়া, ও নৌকার খোলের জল সিঁচিয়া ফেলা, মদমত্ত হস্তীর মদজল বর্ষণ করিয়া নলিনী-বনে প্রবেশ, ডোমনীর বাঁশের তাঁত ও চুপড়ি তৈয়ার করা, তুলা ধুনিয়া উহার আঁশকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করা, বটুয়া ও করণ্ডকের মধ্যে বড়ি লুকাইয়া রাখার অভ্যাস, শবর-শবরীর বন্যফল খাইয়া মাতামাতি—ইত্যাদি বাঙালী-জীবনের অনেক সুপরিচিত বৃত্তি, প্রথা ও আমোদের কথা এই কবিতাগুলিতে আমরা খুঁজিয়া পাই। তাহা ব্যতীত দাবা খেলা, তারের বাদ্যযন্ত্রের সুর বাজান, বিবাহের বাদ্যভাণ্ড ও উৎসব, এমন কি নৃত্যগীত-নাটকাভিনয়, অভিনয়সজ্জার পোশাক-পরিচ্ছদের পেটিকা ও বুদ্ধনাটক বা বুদ্ধলীলা-সম্পর্কীয় নাট্যগীতির প্রচলন সম্বন্ধেও উল্লেখ আমরা ইহাদের মধ্যে আবিষ্কার করি। চর্যাপদ-বর্ণিত সমাজ যে ব্যবসায়, খেলাধূলা ও ললিতকলার চর্চার দিক দিয়া যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন চর্যাপদ হইতে সহজেই আহরণ করা যায়।

চর্যাপদে বাঙলা দেশ ও বাঙালীর পরিচয়

সর্বশেষে চর্যাপদগুলির কাব্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়। এগুলি যদিও আদিম যুগের রচনা, তাহা হইলেও ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ও মার্জিত কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতি সূক্ষ্ম সাধনতত্ত্ব-আলোচনায় এই কবি-গোষ্ঠী যে তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, যুক্তিনিষ্ঠ মন ও সার্থক উপমা-প্রয়োগের সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করার নিপুণতা দেখাইয়াছেন তাহা উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভা ও মননশীলতার নিদর্শন। তাঁহারা যদিও পাণ্ডিত্যহীন, সহজ-অনুভূতি-নির্ভর যোগী-রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ও নিম্নস্তরের সামাজিক শ্রেণীর সহিত মেলামেশায় অভ্যস্ত এইরূপ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা যে হিন্দুদর্শনে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও নিজ মত-প্রতিষ্ঠায় সুনিপুণ ছিলেন

চর্যাপদের কাব্যোৎকর্ষ

তাহা তাঁহাদের রচনায় পরিস্ফুট। তাঁহাদের রচনারীতি এত অর্থগূঢ় ও সংক্ষিপ্ত যে, তাঁহাদের যুক্তিধারা অনুসরণ করাই দুরূহ। নিজ সাধনাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা এতই মর্মজ্ঞ, তাঁহাদের সমস্ত চিন্তা-কল্পনা ইহারই অনুভূতিতে এতই তন্ময় যে, নানা বিচিত্র উপমা ও যুক্তির সাহায্যে তাঁহাদের গভীর উপলব্ধি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের ধর্মবোধ শুধু যুক্তিতর্কের ব্যাপার নহে; ইহা আবেগ ও কবি-কল্পনার স্তরেও অনুপ্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা নিজেদের অনুভূতির কথা বলিতে বলিতে আবেগে আত্মহারা হইয়া যান; তত্ত্ববিচার আবেগময়তা ও সংগীতধর্মিতায় পরিণত হইয়াছে। দার্শনিক তত্ত্বের কাব্যে রূপান্তরই ইহাদের বিশেষ গৌরব। আমরা বৌদ্ধতত্ত্ব অস্বীকার করিয়াছি, কিন্তু চর্যাকারদের কবিত্বশক্তি, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের অসীম আগ্রহ ও তন্ময়তাপূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাসময় বাচনভঙ্গী এই তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতাকে আমাদের চির-আকর্ষণীয় করিয়া রাখিয়াছে। চর্যাপদের ভাব, ভাষা ও কল্পনাশক্তির নিদর্শনরূপে পরিশিষ্টে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

বড়ু চণ্ডীদাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পটভূমি

১

তুর্কী-আক্রমণ ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে কিরূপ বিপর্যয় ঘটে, তাহার যথার্থ তথ্যমূলক বিবরণ দেওয়া কঠিন। বৈদেশিক অধিকারের প্রভাবে অন্যান্য জাতির জীবনে যে অধঃপতন ও অবসাদ আসে, বাঙলার ক্ষেত্রেও সেই সুপরিচিত ইতিহাসসম্মত পরিবর্তন সাধিত হয়, ইহা অনুমান করাই স্বাভাবিক। তবে বাঙলা দেশের ইতিহাসে দুইটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহার জন্য হয়তো ফলের কিছু তারতম্য ঘটিয়া থাকিবে। প্রথম, বিজেতা তুর্কী জাতির ধর্মান্ধতা ও অত্যাচার-প্রবণতা; আর দ্বিতীয়, বাঙালী জাতির রাজনৈতিক চেতনার অভাব ও কূর্মবৃত্তি। এই দুইটি কারণকে অনুধাবন করিলে মনে হইবে যে, তুর্কীরা শুধু দেশ জয় করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহারা বাঙলার ধর্ম ও সমাজ-জীবনে গুরুতর আঘাত হানিয়াছিল। তাহারা অন্যান্য বিজিত দেশে যে-ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, বাঙলাতেও সেই নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল। হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ-বিহারের মধ্যে একটা ব্যাপক ধ্বংস-অভিযান চলিয়াছিল এবং অনেকটা এই কারণেই বোধ হয় তুর্কী-বিজয়ের পর প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া বাংলা সাহিত্য-রচনার আর কোন নিদর্শন মিলে না। মঠ-মন্দিরে রক্ষিত গ্রন্থাবলী বোধ হয় বিনষ্ট হইয়াছিল ও এই অন্তর্বর্তী কালের সমস্ত বাংলা রচনাও এই বিনাশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। সেইজন্য চর্যাপদের পর বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে একটি বিরাট শূন্যতার যুগ।

তুর্কী-আক্রমণে বাঙালী-জীবনের বহুমুখী বিপর্যয়

তবে কিন্তু এই যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা বন্ধ হয় নাই—অভিধান, স্মৃতি, পুরাণ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'গাথাসপ্তশতী' প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত খণ্ড-কবিতার সংকলনগ্রন্থ ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর অনুসরণে রচিত সংস্কৃত কাব্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, বাঙালীর কবি-প্রতিভা বাংলা ভাষার সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলেও কাব্যানুশীলন পরিত্যাগ করে নাই।

তুর্কী-আমলে সংস্কৃত-অনুশীলন

এই যুগে বাংলা কবিতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ও সংস্কৃত সাহিত্যের সংরক্ষণ এই সন্দেহ জাগায় যে, হয়তো এই ধ্বংসের জন্য বিদেশী আক্রমণকারীকেই একমাত্র দায়ী করা ঠিক হইবে না। মনে হয়, যেন বহির্বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এক অন্তর্বিপ্লবও চলিয়াছিল ও হিন্দু ও বৌদ্ধের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরস্পরের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নির্মম উচ্ছেদ ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বাঙলা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া হিন্দুধর্মের মধ্যে ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনও প্রকারে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। প্রায় দুই শতাব্দীর নীরবতার পর যখন বাংলা সাহিত্যের পুনরাবির্ভাব ঘটিল, তখন দেখা গেল যে, ইহাতে পৌরাণিক চেতনা ও সংস্কৃত প্রভাবের সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে ও বৌদ্ধভাব-প্রভাবিত ও প্রাকৃত-অপভ্রংশে লেখা সাহিত্য চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এই সংস্কৃত-প্রভাবিত নূতন ভাষার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন।

হিন্দু ও বৌদ্ধ-প্রতিযোগিতা

বাঙালী হিন্দু জাতি মুসলমান-বিজয়ের ফলে কতখানি বিপর্যস্ত হইয়াছিল ও আত্মরক্ষার উদ্যমে কিরূপ আত্মবিশুদ্ধি ও প্রতিরোধ-শক্তির প্রেরণা পাইয়াছিল, তাহাও ঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সহজ নহে। হিন্দুর রাজনৈতিক চেতনা যে অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল, তাহা তুর্কী-বিজয়ের দ্রুত অগ্রগতি ও সহজসাধ্যতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। স্বাধীনতা অপেক্ষা ধর্মের প্রতি হিন্দুর আগ্রহ অনেক বেশী ছিল ; সুতরাং সে যে রাজনৈতিক প্রতিরোধ অপেক্ষা সমাজ-সংরক্ষণের প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মুসলমানকে ঠেকানোর ব্যাপারে তাহার বেশী উৎসাহ ছিল না, কিন্তু নিজের ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি যাহাতে যুগোচিত শক্তি অর্জন করিয়া প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিকিয়া থাকিতে পারে, সেদিকে তাহার তীক্ষ্ণ ও অতন্দ্র দৃষ্টি ছিল। সুতরাং এই যুগে স্মৃতির নূতন নূতন বিধান রচিত হইয়া সমস্ত আচার-আচরণের শিথিলতা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে—সমাজ-বিধি-উল্লঙ্ঘনের শাস্তি আরও কঠোর হইয়াছে। আধুনিক যুগে হিন্দুধর্মের অনুদার সংকীর্ণতা সম্বন্ধে যে-অভিযোগ করা হয়, তাহার মূল নিহিত আছে সুদূর অতীতে অপর ধর্মের অভিভব হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। তাহা ছাড়া, এই যুগে পৌরাণিক ধর্ম ও ভক্তিবাদের প্রভাব জনচিত্তে দৃঢ়তর করিবার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিয়াছে। বিবিধ দেবদেবী, বিশেষত দুর্গাপূজার প্রবর্তনের দ্বারা জাতীয় চিত্তে ধর্মের প্রতি প্রবল

এই যুগের সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কারে হিন্দুর আত্মরক্ষার নানা প্রচেষ্টা

অনুরাগ জাগানো হইয়াছে। এমন কি মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি অনার্য দেব-দেবীকেও হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ও তাহাদের উপর সুপরিচিত হিন্দু দেবতার গুণ আরোপ করিয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগকেও উচ্চবর্ণের সহিত সমসূত্রে গাঁথা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্য অনার্য দেবতার হিন্দু-দেবমণ্ডলীতে এই উন্নয়নেরই ইতিহাস। ইহার মধ্যে কোনও রাজনৈতিক প্রতিরোধ নহে, সমাজ ও ধর্ম-সংগঠনের প্রয়াসই পরিস্ফুট। সুতরাং হিন্দুসমাজের উপর মুসলমান-বিজয়ের প্রভাব প্রধানতঃ পৌরাণিক চেতনার উন্মেষ ও সমাজ-সংহতির দৃঢ়ীকরণ এই দুই দিকে লক্ষিত হয়।

২

ভাষার প্রাচীনত্বের দিক দিয়া চর্যাপদের পরেই বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে পরিচিত কাব্যের নাম করা যাইতে পারে। এই কাব্যের রচনাকাল ঠিক জানা যায় নাই। হয়তো কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' (যদি কবির আত্মজীবনমূলক অংশটি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়) ও মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্ববর্তী রচনা। কিন্তু কৃত্তিবাস ও মালাধরের রচনা এত জনপ্রিয় ছিল এবং পরবর্তী কবি ও নকলকারকদের হাতে ইহাদের ভাবে ও ভাষায় এত রূপান্তর-সাধন হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দ ছাড়া আর কিছু প্রাচীনত্বের লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিবাদ ও ভাষার আধুনিকত্ব ইহাদের মধ্যে এত প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে যে, ইহাদের ভাষাগত আদিম রূপ ও রচনাকালোচিত ভাববৈশিষ্ট্যের আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই। সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দী ও তাহার কাছাকাছি সময়ে বাংলা ভাষার যে রূপ ছিল, তাহা এক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এই অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে—এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। তবে অবশ্য, কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিকের মতে ইহার ভাষাতে পশ্চিম রাঢ়ের আঞ্চলিক উপভাষার বৈশিষ্ট্যই রক্ষিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা যে প্রাচীনত্বেরই নিদর্শন, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনার কাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস অমার্জিত-রুচি পল্লী-অঞ্চলের কবি হইলেও তিনি যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থমধ্যে তাহার প্রমাণ আছে। তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার যে-

কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কোন কোন স্থলে পৌরাণিক আদর্শ হইতে বিভিন্ন। তাঁহার রাধা ও কৃষ্ণ লক্ষ্মী ও নারায়ণের অবতাররূপে বর্ণিত হইলেও উহাদের প্রেমকাহিনী গোড়ার দিকে কোন উন্নত ভাবাদর্শ অনুসরণ না করিয়া গ্রামবাসী তরুণ-তরুণীর স্থূল, রুচিবিগর্হিত লালসার চিত্র রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণ আইহন-পত্নী, একাদশবর্ষীয়া বালিকা রাধার রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রণয়িনীরূপে প্রার্থনা করিয়াছে ও রাধার দৃঢ় অসম্মতি সত্ত্বেও ছলে-বলে-কৌশলে তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। বড়াইবুড়ী কৃষ্ণের দূতীরূপে রাধাকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও উভয়ের মিলনের নানা উপলক্ষ্য ঘটাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রণয়লীলায় নিজের অসীম ক্ষমতা ও ঐশী শক্তি সম্বন্ধে আস্ফালন করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত নায়ক ইন্দ্রজাল-প্রয়োগে নায়িকাকে সম্মোহিত করিয়া তাহাকে আপন ইচ্ছার বশীভূত করিয়াছে। এই ঘটনার পরে নায়ক ও নায়িকা উভয়ের চরিত্রেই এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নায়ক-নায়িকার উপর হইতে চিত্ত সংহরণ করিয়া যোগসাধনায় রত হইয়াছে ও নায়িকার উন্মুখ প্রেম ও ব্যাকুল আত্মনিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। নায়িকা বহু বিলম্বে প্রেমের মহিমা উপলব্ধি করিয়া নায়কের জন্য বিলাপ ও আক্ষেপে সময় কাটাইয়াছে। পুঁথি এইখানেই আকস্মিকভাবে খণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণপ্রেমের এই কাহিনী পুরাণ-প্রচলিত ও পরবর্তী বৈষ্ণবশাস্ত্র ও পদাবলীতে কীর্তিত কাহিনী হইতে অনেকাংশে পৃথক। ইহাতে শেষের দিক ছাড়া অন্য কোথায়ও অধ্যাত্ম-রূপক ও উন্নত ভাবাদর্শের বিশেষ কোন লক্ষণ নাই। কবি এইরূপ আখ্যান কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা জানা নাই। সম্ভবতঃ কোন কোন পল্লী-অঞ্চলে অমার্জিত-রুচি প্রাকৃত জনসাধারণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের এইরূপ একটি গ্রাম্যতাদুষ্ট কাহিনী প্রচলিত ছিল এবং বড়ু চণ্ডীদাস ইহাকেই নিজ কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস নিজে যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকসমূহ ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর ভাবানুবাদ হইতে সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়। পুরাণবর্ণিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মহিমা যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, ইহা মনে করাই স্বাভাবিক। তথাপি কেন যে তিনি ভাগবত ও পুরাণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া কুরুচিপূর্ণ গ্রাম্য আখ্যান গ্রহণ করিলেন, তাহার কারণ দুর্বোধ্য।

পৌরাণিক ও গৌড়ীয় রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর সহিত পার্থক্য

তাঁহার রাধাকৃষ্ণ কেহই আদর্শপদবাচ্য নহে। তাঁহার কৃষ্ণ রূপমোহে অন্ধ, নীতি ও সংযমের শাসন মানে না, নিজ অলৌকিক শক্তি ও ভগবত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ও নিজ মর্যাদা সম্বন্ধে দারুণ অভিমানী—রাধা তাহার দূতীকে অপমান করিয়াছিল ও তাহাকে দিয়া ভার বহাইয়াছিল, ইহা সে মুহূর্তের জন্যও ভোলে না। সে রাধাকে বশীভূত করিয়া তাহার পর তাহার নির্মম প্রত্যাখ্যানের দ্বারা তাহার পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছে; প্রেমিকের কোমল, আত্মভোলা মনোভাব তাহার একেবারেই নাই। রাধা প্রথম দিকে অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকার মত, প্রেম-নিবেদন বুঝিবার মত অনুভূতি তাহার নাই—কৃষ্ণের নিকট আত্মদান করিয়াও সে খুঁটিনাটি লইয়া তাহার সহিত কলহ করে ও তাহাকে অপদস্থ করিবার ফিকির খোঁজে। তাহার প্রথম দিকের যে-পরিচয় আমাদের মনে প্রধান হইয়া উঠে, তাহা এক কলহপরায়ণা, কথাকাটাকাটিতে পটু, একগুঁয়ে গ্রাম্য নারীর। শেষের দিকে অবশ্য প্রেমের অনুভূতি ও বিরহের অন্তর্দাহে তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে—সে বিরহসন্তপ্তা, প্রেমের জন্য সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত আদর্শ প্রণয়িনীতে পরিণত হইয়াছে। রাধা-চরিত্রের এই আমূল পরিবর্তন বড়ু চণ্ডীদাসের চরিত্রাঙ্কনের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ও কৃষ্ণ

কিন্তু এই স্থূল, শালীনতাহীন কাহিনীর মধ্যে যে-কবিত্বশক্তি ও জীবন-অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। তীক্ষ্ণ চটুল সংলাপের দ্বারা নাটকীয় রসসৃষ্টি করিতেও কবি সুনিপুণ। নবজাত বাংলা ভাষা এই কবির হাতে যে কিরূপ সাবলীল ও শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয় কাব্যের প্রতি পঙ্‌ক্তিতেই পরিস্ফুট। প্রকৃতির সৌন্দর্য, বিরহের বেদনা ও অন্যান্য মনোভাবের বিচিত্র প্রকাশ গ্রন্থখানির কাব্যোৎকর্ষের হেতু। বিষয়ের স্থূলতা ও রুচির গ্রাম্যতা সত্ত্বেও লেখকের কল্পনাশক্তি ও গভীর জীবনবোধ ইহাতে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। একদিকে কাব্যের উন্নত ভাবাদর্শ, অন্যদিকে বাস্তব জীবনের সরস চিত্র কবির রচনায় সার্থকভাবে মিলিয়াছে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ বহু প্রবাদ-বাক্য রচনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহাকে সাধারণের নিকট উপভোগ্য করিয়াছে। নারদ ও বড়াই-এর বার্ধক্যজনিত দেহ-বিকৃতি ও অঙ্গভঙ্গীর সরস বর্ণনায় কবি কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধা ও কৃষ্ণের চরিত্র-পরিকল্পনায় সর্বত্র সংগতিরক্ষা হইয়াছে ও ইহাতে কবির মানবচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যোৎকর্ষ

কাব্যটিতে উপমা ও অলংকারের বৈচিত্র্য ও প্রয়োগ-কৌশলও বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রূপবর্ণনায়, উহাদের প্রণয়মুগ্ধতার প্রকাশে, উভয়ের মনোভঙ্গীর ও ইচ্ছাবিরোধের রূপায়ণে যে অজস্র উপমা, রূপক প্রভৃতি অলংকারের সন্নিবেশ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে লেখকের তীক্ষ্ণ সাদৃশ্যবোধ ও কল্পনার সার্থক সঞ্চরণশক্তি আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই উপমাসমূহ প্রাচীন সংস্কৃত-কাব্যভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত, রূপবর্ণনার প্রথাসিদ্ধ অলংকার-কৌশল এখানে অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ নায়ক-নায়িকার কলহ, মনের ও মেজাজের উত্তাপ, দৃঢ় অসম্মতি ও পরিণামে প্রেমের আত্মনিবেদন ও আর্তি-প্রকাশে কবি তাঁহার মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতা হইতে, বা জনসমাজে প্রচলিত প্রবচন ও বাগ্ধারা হইতে নূতন নূতন উপমা চয়ন করিয়া তাঁহার কাব্য-কৃতির অসামান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে বাংলার প্রাকৃত সমাজ উহার স্থূল রুচি, প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতা ও রস-আস্বাদনের নূতন আগ্রহ ও তৎপরতা লইয়া কাব্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। জীবন-সম্ভোগের এই নবরীতি, জীবন-প্রতিবেশ হইতে রস-আহরণের এই সদ্যোলব্ধ প্রবণতা অচিরজাত বাংলা কাব্যকে সংস্কৃত কাব্যের একটা উপবিভাগ হইতে উন্নীত করিয়া স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ কবির প্রতিভাস্পর্শে গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন উপাদানে গঠিত, স্থূলরুচিমিশ্রিত কাব্য অভিজাত-কাব্যের উন্নত ভাবাদর্শ ও শিল্পোৎকর্ষের পদবীতে আরূঢ় হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমা

ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়াও কবি কম কৃতিত্বের অধিকারী নহেন। কাব্য-খানিতে পয়ার ও ত্রিপদী ছাড়াও অনেক নূতন ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়—এই ছন্দোবৈচিত্র্য বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে আরও পরিণত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। চর্যাপদের সঙ্গে তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অধিকতর সংস্কৃতানুসারী—মনে হয় পঞ্চদশ শতকে বাংলা ভাষা প্রাকৃত-অপভ্রংশের প্রভাব অতিক্রম করিয়া আবার সংস্কৃতের আদর্শে ফিরিয়া আসিয়াছে। জনসমাজে পৌরাণিক চেতনা বদ্ধমূল হইবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ভাষাও সংস্কৃত শব্দচয়ন ও প্রয়োগরীতিকে আত্মসাৎ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম পদ, সংস্কৃত-বহির্ভূত আঞ্চলিক লৌকিক নানা শব্দ ও বাগ্ধারা (idiom), সংলাপরীতির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ইহার প্রকাশভঙ্গীর স্বকীয়তার লক্ষণগুলিও এই কাব্যে স্থান পাইয়াছে ও লেখকের মৌলিকতার পরিচয় দিতেছে। 'চর্যাপদ'-এ বাঙালীর বিশিষ্ট জাতিলক্ষণ সব সময় ধরা পড়ে না

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও ছন্দ

—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কিন্তু বাঙালীর মনের ছাপটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে অনুভব করা যায়, বাঙালীর ভাবচেতনা ও জীবনরসবোধের ইহা প্রথম উজ্জ্বল প্রকাশ।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-কাহিনীতে বড়ু চণ্ডীদাস কতকগুলি নূতন আখ্যান যোগ করিয়াছেন—নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ড এই দুই লীলার প্রথম প্রবর্তক তিনিই। প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায় না। চৈতন্যভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার ভাগবতের টীকায় ইহাদের স্রষ্টা যে চণ্ডীদাস তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রেমলীলা যতই জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিল, ততই নানা নূতন আখ্যান যোগ করিয়া ইহার বৈচিত্র্যবৃদ্ধির প্রয়োজন হইল ও জনগণের জীবনযাত্রার সহিত ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার চেষ্টা হইল। সে-যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য শুল্ক দেওয়া ও নদী পার হইতে নাবিককে মজুরি দেওয়া লোকের জীবনযাত্রার একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল ; এবং এই অতিপরিচিত প্রথাগুলিও ক্রমশঃ রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার অন্তর্ভূত হইল। অবশ্য, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে এই শুল্ক-আদায়ের উৎপীড়নমূলক দিকটাই দেখানো হইয়াছে—ইহার কোন আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তখনও আরোপিত হয় নাই। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে ইহাদিগকে সূক্ষ্মতর রূপক-অর্থ-মণ্ডিত করা হইয়াছে। ভগবানের নিকট ভক্ত তাহার সর্বস্ব নিবেদন করিলেই ভবের হাটে তাহার বেচা-কেনা সার্থক হইবে ও সংসারসমুদ্র সে অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। বড়ুর ইঙ্গিত পরবর্তী যুগে পূর্ণতর তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নূতন আখ্যান ও আধ্যাত্মিকতা

বিদ্যাপতি

[১৩৮০—১৪৬০ খ্রীঃ অঃ]

৩

বিদ্যাপতি মিথিলা-রাজসভার কবি ছিলেন ও পঞ্চদশ শতকে মিথিলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজা, রাজমহিষী ও মন্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার পদাবলীর ভণিতায় সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজাদের শাসনকাল হইতে বিদ্যাপতির জীবনকালের একটা নিশ্চিত ধারণা করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির জীবন ১৩৮০ হইতে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এইরূপ অনুমান নির্ভরযোগ্য।

বিদ্যাপতির কাল

বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদ লেখা মৈথিলী ও অবহট্ট বা অপভ্রংশ-মিশ্রিত ব্রজবুলি ভাষায়। ব্রজবুলি কোন প্রাদেশিক অঞ্চলের লিখিত বা কথ্য ভাষা ছিল না—ইহা রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধুর-রস-প্রকাশোপযোগী, পদের লালিত্য ও ধ্বনির ঝঙ্কার-বিশিষ্ট, কবি-সৃষ্ট কাব্য-ভাষা। সম্ভবতঃ বিদ্যাপতিই এই ভাষার আদি স্রষ্টা। বৈষ্ণব ভাবধারা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা উড়িষ্যা ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং বাঙলা দেশে বৈষ্ণবপদ-রচনায় ইহা বাংলা ভাষার সহিত প্রায় সমভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ব্রজবুলি

সে-যুগে মিথিলা ও বঙ্গদেশ একই সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল, পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের দ্বারা ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও এক-সাহিত্যিক-গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। বিশেষতঃ বিদ্যাপতি পদাবলী-সাহিত্যের আদি-রচয়িতা-রূপে বাংলা কাব্যের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কান্বিত; বাংলার প্রধানতম ভাবধারার উৎসরূপে তিনি বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল প্রেরণার আধার। তিনি নিজ দেশ হইতে বাংলা দেশেই অধিকতর আদৃত এবং সাধক কবি ও মহাজন পদকর্তা-রূপে স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন। সুতরাং জয়দেব যেমন সংস্কৃত গীতগোবিন্দ লিখিয়াও বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য, সেইরূপ বিদ্যাপতিও মৈথিলী, অপভ্রংশ (অবহট্ট) ও ব্রজবুলিতে কাব্য রচনা করিয়াও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্য ও বিদ্যাপতি

কিন্তু বিদ্যাপতি শুধু বৈষ্ণবপদ রচনাই করেন নাই—তাঁহার রুচি ও মনীষা এত বিচিত্র ও বহুমুখী ছিল যে, উহা পঞ্চদশ শতকের লেখকের পক্ষে বিস্ময়কর।

তিনি কেবল কবি ছিলেন না, একটি বিদগ্ধ ও অনুশীলিত মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' নামে দুইখানি ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহমূলক কাব্য, স্মৃতি ও পুরাণ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, শিব, দুর্গা ও গঙ্গা-স্তুতিবিষয়ক কিছু গ্রন্থ ও 'পুরুষপরীক্ষা' নামে আখ্যানগ্রন্থ অপভ্রংশ ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পদাবলীর মধ্যে হরগৌরী, কালী, গঙ্গা প্রভৃতি শাক্ত দেবদেবীর স্তুতিমূলক পদও আছে। তিনি যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-মতাবলম্বী রাধাকৃষ্ণ-উপাসক ছিলেন, তাহাও মনে হয় না—তিনি বৈষ্ণবশাক্তনির্বিশেষে বহু দেবদেবীরই উপাসনা করিতেন। তাহা ছাড়া, রাজসভার সহিত দীর্ঘকাল নিবিড় সংস্রব ও রাজকার্য-পরিচালনার অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার যে প্রখর বাস্তবজ্ঞান ও ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধি ছিল, তাহাও তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট। তিনি বহুভাষাবিদ্ ও ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন,—এরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই। মোট কথা, বিদ্যাপতি সে-যুগের পক্ষে যে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ও নানাবিষয়ক পাণ্ডিত্য-সমন্বিত ব্যক্তি ছিলেন ও সাধারণ ভাবসর্বস্ব কবি হইতে জীবনের সকল দিকের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

বিদ্যাপতির বহুমুখী প্রতিভা ও রচনা-বৈচিত্র্য

৪

তথাপি বৈষ্ণব পদকর্তা-রূপেই বিদ্যাপতির মুখ্য পরিচয়। তিনি বৈষ্ণব ভাব-সাধনার স্বর্ণসূত্রেই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। তাঁহার পদে তিনি যে-বিভিন্ন রসের প্রবর্তন করিলেন ও ভক্তি ও রূপমুগ্ধতার সুর যোজনা করিলেন, চৈতন্যোত্তর পদাবলী-সাহিত্যে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে তিনি পরিণতির নানা স্তরে বিভক্ত একটি সমগ্র মানবিক প্রেমকাহিনীরূপে কল্পনা করিলেন ও ইহারই মধ্যে অধ্যাত্ম-তাৎপর্য আরোপ করিলেন। তাঁহারই পদের অনুসরণে পরবর্তী কবি ও আলঙ্কারিকেরা এই প্রেমকে পূর্বরাগ, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, মাথুর-বিরহ ও ভাবসম্মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন পালাতে বিন্যস্ত করিয়া ইহাকে একটি সুনির্দিষ্ট রসপরিণতি দিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কেবল মিলন ও বিরহ ছাড়া আর কোন রসের নিদর্শন পাওয়া যায় না এবং তাঁহার কাব্য মুখ্যতঃ আখ্যায়িকা-কাব্য বলিয়া পদের আঙ্গিকও সেখানে স্থিরীকৃত হয় নাই। বিদ্যাপতিই প্রথম এক-একটি ভাবের উচ্ছ্বাসকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে গাঢ়বদ্ধ

বৈষ্ণব পদাবলী ও বিদ্যাপতি

রূপ দিয়া ও শেষে ভণিতার মধ্যে কবির নিজ মন্তব্য যোগ করিয়া পদের অবয়বটি নির্মাণ করিলেন।

চণ্ডীদাস যেমন রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে গ্রাম্য ভোগাসক্তি ও প্রাকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবি দিয়া দৈবী লীলাকে মানবিক রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন, বিদ্যাপতিও তেমনি ইহার সহিত উচ্চতর জীবনচর্চার, রাজসভার বিদগ্ধ রস ও রুচির সংস্পর্শ ঘটাইয়া ইহার রমণীয়তা ও মানবিক আবেদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করিলেন। তিনি রাধাকে ভাবমুগ্ধা কিশোরীরূপে আঁকিয়া ও তাহার অন্তরে বয়ঃসন্ধিসুলভ প্রেমের উন্মেষ দেখাইয়া তাহাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধার সখীমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া ও তাহাদিগকে নায়ক-নায়িকার মিলনে ও প্রেমের দৌত্যে নিয়োগ করিয়া ইহার চারিদিকে একটি স্নিগ্ধ হাস্যপরিহাসপ্রীতিপূর্ণ যৌবনাবেশের আবহাওয়া রচনা করিয়াছেন। মান-অভিমানের সুষ্ঠু কল্পনার দ্বারা তিনি প্রেমের বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তা বাড়াইয়াছেন, ইহার কুটিল গতি, রহস্যময় প্রকৃতিটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিশেষতঃ অভিসার-পরিকল্পনা বিদ্যাপতির মৌলিকতার একটি অপূর্ব নিদর্শন। অবশ্য, চণ্ডীদাসের নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ডের মধ্যে অভিসারের প্রেরণা প্রচ্ছন্ন ছিল; কেনা-বেচার লৌকিক প্রয়োজনের অন্তরালে নায়িকার মিলনোৎকণ্ঠাই লুকানো আছে। কিন্তু বিদ্যাপতি এই ছলনার পরদা সরাইয়া সোজাসুজি নায়িকার সমস্ত বাঁধভাঙা, উদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাসই দেখাইয়াছেন। আর এই অভিসারকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি দুর্গম পথের সমস্ত বাধা, বর্ষার দুর্যোগময়ী প্রকৃতি, বজ্র ও বিদ্যুতের হানাহানি, বনপথের আঁধারে মগ্ন পিচ্ছিলতা প্রভৃতি বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন ও ইহাতে সাধনের দুরূহতার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

বিদ্যাপতির মৌলিক ভাবকল্পনা

বিরহপর্যায়ের পদে বিদ্যাপতি উদার আত্মবিসর্জন ও গভীর নিঃস্বার্থ ভালবাসার নূতন সুর লাগাইয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিরহ-বর্ণনা একটা আলঙ্কারিক প্রথার মতই ব্যবহৃত হইয়াছে—উহাতে নায়িকার অন্তরবেদনা খুব বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। এমন কি কালিদাসের 'মেঘদূত'-এও আমরা রমণীয় চিত্রপরম্পরা যতটা পাই, ততটা অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ পাই না। বড়ু চণ্ডীদাসে রাধার বিরহবেদনার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই; কিন্তু উহাতে নায়িকার চিত্তবিশুদ্ধি বা দেহাতীত আকর্ষণের বিশেষ পরিচয় মিলে না। বিদ্যাপতির পদে আলঙ্কারিক প্রথার সঙ্গে ক্ষমাস্নিগ্ধ, আত্মসংযমপূত মনোভাবের মিলন দেখা যায়। বিশেষতঃ মাথুর-

বিদ্যাপতির বিরহ ও ভাব-সম্মিলনের পদ

বিরহের পদগুলিতে আর্তির যে করুণ রস, প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণ মার্জনা করিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দৈব ও কর্মফলকে দায়ী করার যে প্রবণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার উদারতা ও মাধুর্য উহাদের ভাবোৎকর্ষের কারণ। ভাবসম্মিলনের পদগুলিও বিদ্যাপতির উন্নত ভাবকল্পনার পরিচয়। তিনি কোনও পুরাণ অনুসরণ না করিয়া কেবল নিজ কবিমনের সহজ অনুভূতির জন্য রাধাকৃষ্ণের বিরহের পর পুনর্মিলন ঘটাইয়াছেন; এই পদগুলিতে মিলনের নিবিড় আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতি ধর্মবিশ্বাসে ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না; চৈতন্যপূর্ববর্তী বলিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুভূতিতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা যে-রসমাধুর্য ও ধর্মসাধনারূপে স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চৈতন্যধর্মতত্ত্ব না জানিয়াও তিনি ভক্তি ও কবিচিত্তের সংস্কারের বলেই বহুপদে বৈষ্ণবধর্মের ভবিষ্যৎ পরিণতির পূর্বাভাস দিয়াছেন।

বিদ্যাপতির প্রেমের আদর্শ ও ক্রম-বিকাশ

অবশ্য বিদ্যাপতির সব পদই এই উচ্চ ভাবের স্তরে পৌঁছে নাই। তিনি রাজসভার কবি ছিলেন ও রাজা ও রাজসভাসদ্‌বর্গের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রচনা করিতেন। তাঁহার অনেক পদে রাজসভার যে-প্রেমে সৌন্দর্যবিলাসের আদর্শ প্রচলিত ছিল ও যাহাতে কুরুচির স্পর্শ ছিল, সেই দরবারী প্রেমেরই ছবি আঁকা হইয়াছে। তাঁহার কৃষ্ণ কখনও ভগবান, কখনও বা প্রাকৃত, দেহসৌন্দর্যপিয়াসী নায়ক; তাঁহার রাধা কখনও আদর্শ ভক্ত, কখনও বা প্রণয়তত্ত্বে অভিজ্ঞা, সুচতুরা নায়িকা, যিনি নায়ককে গোঁয়ার বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। তাঁহার ভণিতায় ঠিক ভক্তের তন্ময়তা ফোটে নাই, রাজানুগৃহীতের কৃতজ্ঞতা ও স্তুতি শোনা যায়। তিনি এমন কি রাজা শিবসিংহকে একাদশ অবতাররূপে অভিহিত করিয়া তাঁহাকে ভগবত্তার মর্যাদায় স্থাপন করিয়াছেন—কোনও ভক্ত বৈষ্ণব কবি আরাধ্যদেবতার এরূপ মর্যাদা-হানি কখনই করিতেন না। সময় সময় তাঁহার পদে তাঁহার সংসারজ্ঞান, লোকচরিত্র-অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ সরস মন্তব্য ও কটাক্ষপূর্ণ ইঙ্গিতের নিদর্শন মিলে। মিথিলার গ্রাম্যজীবনযাত্রা, স্থূল হাস্যপরিহাস, সামাজিক রীতিনীতির ছাপও তাঁহার রচনাকে চিহ্নিত করিয়াছে। মোটকথা, বিদ্যাপতি গোড়া হইতেই বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন না; তিনি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ধারা-অনুসরণে লৌকিক প্রেমের কবিতা লিখিতে লিখিতে ক্রমশঃ উহার মধ্যে ভক্তির ও ভাবুকতার সুর মিশাইলেন ও দিব্য প্রেমের চেতনা তাঁহার অন্তরে ধীরে ধীরে স্ফুরিত হইল। তাঁহার পদে এই ভাবপরিবর্তনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বিদ্যাপতির কয়েকটি পদ সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্মের উর্ধ্বে যে একটি সার্বভৌম ধর্মচেতনা আছে, তাহারই মহিমান্বিত প্রকাশ। এই পদগুলিতে তিনি ভগবানকে কোন পৌরাণিক দেবদেবীরূপে কল্পনা করেন নাই, তাঁহার নিখিলবিশ্বব্যাপী রূপটিই অনুভব করিয়াছেন ও কোন সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া সোজাসুজি বিশুদ্ধ ভক্তির আবেগে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। সেইরূপ দুই-একটি পদে সমস্ত খণ্ড-সৌন্দর্যের পিছনে, সমস্ত আংশিক প্রেমের অন্তরালে যে অনুভূতির অতীত, অখণ্ড প্রেমসৌন্দর্যের একটি আদর্শ বিরাজমান, তাহার চিরসীমাহীন সত্য রূপটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই দুইজাতীয় পদের উদাহরণ ইহার পর দেওয়া হইতেছে। ইহারা প্রমাণ করে যে, বিদ্যাপতি শুধু মিথিলার রাজসভার কবি নহেন, শুধু বৈষ্ণব ভক্ত কবি নহেন; তিনি স্থানকালের গণ্ডি ছাড়াইয়া, যে-সার্বভৌম অনুভূতির উচ্চশিখরে সর্বদেশের সর্বকালের কয়েকটি মহাকবি আসীন, সেখানেই স্থান পাইবার অধিকারী।

বিদ্যাপতির সার্বভৌম ধর্মচেতনা

বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত সহস্রাধিক পদের মধ্যে কোন্‌গুলি তাঁহার খাঁটি রচনা, তাহার নির্ধারণ খুব দুরূহ সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার পদসমূহ বাংলা দেশে অতিশয় প্রচলিত থাকায় ও গায়কমুখে ও সংগ্রাহকদের হাতে তাঁহার ভাষার অনবরত পরিবর্তন ঘটিতে থাকায় এগুলি ক্রমশঃ বাঙালী কবিদের রচিত ব্রজবুলি পদের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার পদের বিশুদ্ধ রূপের পুনরুদ্ধার-চেষ্টাও প্রায়ই কৃত্রিম-আদর্শ-প্রণোদিত ও আতিশয্যদুষ্ট হইয়াছে। এ ছাড়া চৈতন্যোত্তর অনেক কবির পদ—শ্রীখণ্ডের বাঙালী বিদ্যাপতি-অভিধেয় কবিরঞ্জন, রায়শেখর, চম্পতি রায়, রায় বসন্ত প্রভৃতির রচনাও বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া সমস্যার জটিলতা বাড়াইয়াছে। কতকগুলি মানদণ্ডের প্রয়োগে বিদ্যাপতির খাঁটি পদাবলীর স্বরূপনির্ণয় সম্ভব: (১) রাজসভার প্রভাব-যুক্ত প্রণয়কলা-চাতুরীর পদসমূহ, (২) চৈতন্য-প্রভাবহীন প্রাকৃত প্রেমের চিহ্নাঙ্কিত রাধাকৃষ্ণপ্রেমের পদগুলি; (৩) মিথিলার গ্রাম্য জীবনযাত্রার ইঙ্গিত ও উল্লেখবাহী পদাবলী, (৪) মৈথিল ও অবহট্ট ভাষার নিদর্শনবহুল পদগুলি ও (৫) সার্বভৌম ধর্মবোধের উর্ধ্বলোকচারী স্তোত্রকল্প রচনাসমূহ বিদ্যাপতির অকৃত্রিম রচনারূপে গৃহীত হইতে পারে।

বিদ্যাপতির খাঁটি পদবিচার

বিদ্যাপতি বহুশতাব্দীব্যাপী বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের মূল উৎস। জয়দেব যে-শৃঙ্গাররস-প্রধান রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার ভাবস্রোত সমস্ত পূর্বভারতের জনমানসে

পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতি তাহাকেই স্বল্পাক্ষর পদের পরিমিত রমণীয় আধারে ধরিয়া রাখিয়া, লৌকিক জীবনের বিচিত্র রসের সহিত যুক্ত করিয়া, অন্তর-লোকের বহুমুখী দ্বন্দ্বসংঘাতে বেগবান করিয়া একটি নাটকীয় ভাবঘন পরিণতিতে সংহত করিলেন। প্রাকৃত রসের মধ্যে ধর্মসাধনার ব্যঞ্জনা মিশাইয়া, প্রণয়ক্ষোভের মধ্যে ভক্তির আকুতি ফুটাইয়া, রূপাকুলতার মধ্যে রূপাতীতের অতীন্দ্রিয় আবেদন ধ্বনিত করিয়া তিনি বাংলা কাব্যের একটা প্রধান বিবর্তনধারার প্রথম সূচনা করিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের দিব্যভাবমগ্ন অলৌকিক জীবনলীলার দর্শন-বঞ্চিত হইয়াও এবং বৈষ্ণব তত্ত্ব ও ভাবাদর্শের স্থির আশ্রয় ব্যতিরেকেও যে কেবল নিজ প্রতিভা ও কাব্যানুভূতির সাহায্যে বৈষ্ণব কাব্যের আদি স্রষ্টারূপে পরিচিত হইয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার অসামান্য ক্রান্তদর্শিতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহার পূর্বানুমান চৈতন্যজীবনীতে ও চৈতন্যোত্তর কবিসংঘের রচনাতেই যেন আশ্চর্য বস্তুরূপের যথার্থতা লাভ করিয়াছে। মানবমনের একটি ভক্তিরসসিঞ্চিত সুকুমার ঔৎসুক্যের বীজ বিদ্যাপতির মনোভূমিতে উপ্ত হইয়া এক অপার্থিব লীলাদ্যোতনার পুষ্প-পেলবতায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রান্তদর্শী কবি বিদ্যাপতি

পঞ্চম অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

১

তত্ত্বকবিতা ও গীতিমিশ্র আখ্যানকাব্যের পর বাংলা সাহিত্যে দেবমাহাত্ম্য-কীর্তনমূলক ও বাস্তবসমাজচিত্রভিত্তিক কাহিনীকাব্যের যুগ আসিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও নিজস্ব কাহিনী-কাব্য, পাঁচালী-কাব্য হইতেছে মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যও পালা হিসাবে গান করা হইত। তবে, ইহাতে সুর হইতে কাহিনীর প্রাধান্য বেশী। এখন আমরা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী পাঠ করিয়া উহার ভাব-প্রেরণাটুকু বুঝিতে চেষ্টা করি।

মঙ্গলকাব্যের আদি-ভাব-প্রেরণা

মঙ্গল কথাটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে কল্যাণ। যে কাব্যের কাহিনী শ্রবণ করিলে সর্ববিধ অকল্যাণনাশ হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গললাভ হয়, তাহাকেই মোটামুটি মঙ্গলকাব্য বলা হয়। 'মঙ্গল' শব্দটিকে 'বিজয়'-অর্থেও গ্রহণ করা হয়। সেই অর্থে লইলে এক এক ধারার মঙ্গলকাব্য এক একটি বহিরাগত দেবতার সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ও বিরুদ্ধ মতবাদ অতিক্রম করিয়া নিজ নিজ পূজাপ্রচার ও প্রতিষ্ঠা-অর্জনের বিজয়বার্তা ঘোষিত করে। এই মঙ্গলকাব্যের মূল বিষয় এক একটি দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্তন। এই দেবতাদের মধ্যে আবার স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য বেশী। মনসা ও চণ্ডী-ই মঙ্গলকাব্যের প্রধান স্ত্রীদেবতা। ধর্মঠাকুর পুরুষদেবতা। শিবঠাকুরকেও ব্যাপকার্থে মঙ্গলকাব্যের বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী

মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। মোটামুটি এইজাতীয় রচনা চারিটি অংশে বিভক্ত থাকে। প্রথম অংশে বন্দনা। এই অংশে নানা দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। এই বন্দনা একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক। ইহাতে শুধু যে ইষ্টদেবতার বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবদেবী বন্দনাই হইত তাহা নহে, হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সকল শ্রেণীর উপাস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইত।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ

দ্বিতীয় অংশ—গ্রন্থ-রচনার কারণ-বর্ণনা। ইহার মধ্যে কবির আত্মপরিচয় থাকিত। প্রায় সব মঙ্গলকাব্যই যে স্বপ্নাদেশে বা দৈবনির্দেশে রচিত হইয়াছে—তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় অংশ—দেবখণ্ড। পৌরাণিক দেবতার সহিত লৌকিক দেবতাদের সম্বন্ধ-স্থাপনই ইহার মূলকথা। এই অংশে শিবের সম্বন্ধ ও প্রাধান্য লক্ষণীয়।

চতুর্থ অংশ—নরখণ্ড এবং আখ্যায়িকার বর্ণনা। দেবতার পূজা-প্রচারের জন্য কোন কোন দেবতা ও স্বর্গবাসীর শাপভ্রষ্ট হইয়া নরলোকে জন্মগ্রহণের বর্ণনা আছে। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা, দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূ নীলাম্বর ও মায়া; মনসামঙ্গলের বেহুলা-লখীন্দর উষা-অনিরুদ্ধ।

এই নরখণ্ড-বর্ণনার মধ্যে আরও কয়েকটি আঙ্গিক আছে। মুখ্যতঃ নায়িকাদের বারমাসের সুখদুঃখের কাহিনীর বর্ণনামূলক 'বারমাস্যা'-অংশ এই আঙ্গিকের অন্যতম। এতদ্ব্যতীত 'চৌতিশা' অর্থাৎ বিপন্ন নায়ক-নায়িকা কর্তৃক চৌত্রিশ অক্ষরযোগে ইষ্টের স্তুতি, নায়িকার সজ্জা ও রন্ধন-প্রণালী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব তুর্কী-আক্রমণের সহিত সম্পর্কান্বিত বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়। সুতরাং এই রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের সহিত ইহার কোন কার্যকারণগত যোগাযোগ আছে কিনা তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত। মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক রূপের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ব্যাপ্ত।

বাঙলা দেশে তুর্কী-আক্রমণ হইল হিন্দু সেন-রাজত্বের সময়ে, দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকের সন্ধিক্ষণে। কেন সেন রাজারা এই লঘু আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিলেন না, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন। রাজশক্তির পশ্চাতে জনসমর্থন না থাকিলে, অন্ততঃ রাজশক্তির সহিত প্রজাসাধারণের একটা মৈত্রী-সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা কদাচ শক্তিশালী হইতে পারে না। মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেন রাজারা মাত্র স্বল্পসংখ্যক উচ্চবর্ণের আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নশ্রেণীর উৎপীড়িত বাঙালী-সাধারণ বৈদেশিক আক্রমণের সময় হয় রাজবিরোধী কিংবা উদাসীন ছিল। ক্ষমতাচ্যুত বৌদ্ধেরা হয়ত আক্রমণকারীদের প্রত্যক্ষ সহায়তা করিয়া থাকিবে। বৌদ্ধ-অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান ধর্মের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখিয়া মনে হয়, হয়ত তাহারা অধিক সংখ্যায় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকিবে।

মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি

বাঙলা মূলতঃ অনার্য-অধ্যুষিত দেশ এবং বাঙালী জাতি মিশ্র জাতি। উন্নততর আর্যধর্ম ও সভ্যতার হাজার বৎসরের প্রচণ্ড চাপে বাঙালী আর্য-সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্লাবন মন্দীভূত ও বিলুপ্ত হইবার পর সমগ্র ভারতে যখন আবার বৈদিক ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইল, তখনও উচ্চবর্ণের বাঙালী ব্যতীত সাধারণ বাঙালীর মধ্যে আর্যধর্মের উন্নত আদর্শবাদের উল্লেখযোগ্য প্রসার হয় নাই। তাহারা নিজেদের লৌকিক দেবতার সহিত পৌরাণিক দেবদেবীর মিশ্রণ

ঘটাইয়া নূতন ধর্মের ও নূতন দেবতার সৃষ্টি করিয়া খিড়কি দরজা দিয়া আর্যধর্মে প্রবেশ করিল। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা বাঙলার মাটিতে সৃষ্ট এই নূতন দেবতা।

এই লৌকিক দেবতা-ব্যূহে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য অনার্য-সংস্কৃতির সুস্পষ্ট নিদর্শন। বৈদিক ধর্মে স্ত্রীদেবতার আসন একান্তভাবেই গৌণ। পক্ষান্তরে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান দেবতা নারীরূপা এবং তন্ত্রের পুণ্যভূমি হইতেছে বাঙলা দেশ। কাজেই এইখানে নারী-দেবতার প্রাধান্য যদিও অনার্য উৎস হইতে আসিয়া থাকে, তথাপি আর্যধর্মনির্দিষ্ট তন্ত্রসাধনার প্রভাবেই উহা জাতীয় জীবনে বদ্ধমূল হইয়াছে। পরে বৈদিক, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, হিন্দু-তান্ত্রিকও পৌরাণিক ভাবাদর্শের মিশ্রণে এবং বাঙালীর নিজের সমাজ ও পরিবার-জীবনের নারী-প্রাধান্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই নারীদেবতারা সমগ্র বাঙালী জাতির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন।

মঙ্গলকাব্যে স্ত্রী-দেবতার প্রাধান্যের তাৎপর্য

কিন্তু এই পরিণতি তুর্কী-আক্রমণের পূর্বে আসে নাই। ইহার আগে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহাদের পূর্বাগত প্রথানুসারে পথে-প্রান্তরে, গাছে-পাথরে এই লৌকিক দেবদেবীর পূজা করিত, তৈল-সিন্দুর-পান দিয়া উলুধ্বনি করিয়া তাহাদের প্রসাদ ভিক্ষা করিত। এই লৌকিক দেবতারা একাধারে ভয়ংকর ও ভক্তবৎসল ছিলেন। প্রসন্ন হইলে একদিকে যেমন ইঁহারা ভক্তের জন্য যে-কোন কঠিন কাজ করিয়া দিতেন, অন্যদিকে ক্রুদ্ধ হইলে চরম সর্বনাশ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। মনসা, চণ্ডী এবং খানিকটা ধর্মঠাকুর—এই তিনটি প্রধান গণদেবতার মধ্যে এই বিশিষ্টতা অধিকভাবে পরিস্ফুট।

আর একটা বিষয় লক্ষণীয়। এইসব মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকারা প্রধানতঃ বণিক সম্প্রদায় ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি উচ্চশ্রেণীর প্রাধান্য এই সময়ে অপেক্ষাকৃত গৌণ। প্রাচীনকালে, বৌদ্ধ রাজাদের আমলে বাঙালী সওদাগর সপ্তডিঙ্গা, চৌদ্দডিঙ্গার বহর লইয়া বিভিন্ন পট্টনে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাঁহাদের এই সাড়ম্বর দুঃসাহসিক অভিযান লইয়া কিছু কাহিনী প্রচলিত ছিল। সেই সব কাহিনীই হয়ত কোন কোন মঙ্গলকাব্যের মূল আখ্যায়িকার অস্থিকংকালরূপে গৃহীত হইয়া থাকিবে। ইহা দ্বারাও অনুমান করা যায় যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি মূলতঃ বাঙালীর নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা ও ভাগ্যবিপর্যয়ের উপাদানে রচিত।

মঙ্গলকাব্যে বণিক ও নিম্নশ্রেণীর প্রাধান্য

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিধর্মী রাজশক্তির চাপে বাঙালী উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ধীরে ধীরে ঘুচিতে লাগিল। ভক্তি-

বাদের মূল কথাই হইল আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস ও দৈবানুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা। উচ্চবর্ণের মধ্যে পৌরাণিক চেতনা যতই পরিস্ফুট হইল, দেবতার অলৌকিক মাহাত্ম্য যতই তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে লাগিল, ততই তাহাদের মধ্যে দেবতার নিকট এই আত্মসমর্পণ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার উপর রাজনৈতিক জীবনে পরাজয় ও অসহায়ত্ববোধ এই ভাবকে আরও ঘনীভূত করিল। এই পরিস্থিতিতে উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরাও লৌকিক দেবদেবীর দৈবী শক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকের খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল ও উভয় শ্রেণীর মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য গড়িয়া উঠিল। দেবতার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির উপরই মানুষের শুভাশুভ ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য নির্ভর করে; পুরুষকার নহে, দৈবই সর্বশক্তির আধার—এই বিশ্বাস উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও প্রসারিত হইল। তখনই শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর কবিগণ চিরাগত মূল আখ্যায়িকার খড়-কুটার কাঠামোর উপরে শাস্ত্র-পুরাণের মাটির প্রলেপ দিয়া, বৈদিক-তান্ত্রিক কল্পনার রঙ ফলাইয়া যে-মঙ্গলমূর্তি রচনা করিলেন—তাহাই বাঙলার নিজস্ব কাহিনীকাব্য মঙ্গলকাব্যরূপে প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত বাঙালীর চিত্তবিনোদন করিয়াছে।

মঙ্গলকাব্য সৃষ্টিতে উচ্চশ্রেণীর আগ্রহ

২

বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য বাঙালীর ভক্তিময় মানসিকতার ত্রিবিধ প্রকাশ। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙালী-মনের ভক্তিতে রূপান্তরিত মধুর প্রেমকল্পনা উহার ঊর্ধ্বাভিসারী জীবনসাধনার প্রেরণারূপে উহাকে এক অপরূপ ভাব-মুগ্ধতার স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। শাক্ত পদাবলীতে দুর্যোগময় বাস্তব জীবনের ঘনঘটার মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায়, মাতৃরূপে পরিকল্পিত দৈবী শক্তির করুণা ও অভয়বাণী একান্তনির্ভর ভক্তহৃদয়ে বার-বার দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব ও শাক্ত এই উভয়বিধ পদাবলীতেই একাগ্র ভক্তিসাধনার ফলরূপেই অন্তরে এক দুর্লভ অধ্যাত্ম-প্রত্যয়ের স্থির দীপশিখা ভাস্বর হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের ভোগলিপ্সা ও সুখমসৃণ জীবনচর্যা কোন কোন নূতন দেবতার আশ্রয়ে যে-কুণ্ঠিত, সুবিধাবাদমূলক তৃপ্তি খুঁজিয়াছে, সেই সাংসারিকতার খাদ-মিশানো দেবানুগ্রহযাচ্ঞাই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে রূপ পাইয়াছে।

বাঙালীর ভক্তিময় মানসিকতা

মানুষের সহিত দেবতার নূতন সম্পর্ক-স্থাপন-প্রয়াসের এই তিনটি ধারার মধ্যে

কালক্রমের দিক দিয়া মঙ্গলকাব্যই সর্বাগ্রবর্তী। যে-তিনটি নূতন দেব-দেবী—ধর্মঠাকুর, মনসা ও চণ্ডী—প্রধানতঃ মঙ্গলকাব্যে পূজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—তাঁহারা অনার্য-কল্পনা-প্রসূত ও অ-হিন্দু-উৎস-সম্ভূত মনে হয়। ধর্মঠাকুর বিষ্ণুর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিলেও তিনি স্পষ্টতঃ হিন্দুধর্ম-প্রভাবিত পরবর্তী যুগের বৌদ্ধধর্মের আদিদেবতা ও তাঁহার পূজাপদ্ধতি বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত। মনসা দেবী ধূলিশায়ী সরীসৃপ হইতে অর্বাচীন যুগের ভয়মিশ্রা ভক্তির তাগিদে দেবমণ্ডলীতে সদ্য-উন্নীত। তাহার হিংস্রতা, অকারণ-উদ্দীপ্ত আক্রমণ-স্পৃহা ও বাসস্থানের রহস্যময় গোপনতা মানুষের কল্পনাকে এরূপ নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করিয়াছে যে, সে আমাদের চোখের সামনেই প্রাণিজীবন হইতে দেব-মর্যাদায় আরূঢ় হইয়াছে। মনসামঙ্গল হইতেই মঙ্গলকাব্যের দেবকল্পনার আদিম প্রেরণাটি আমরা অনুধাবন করিতে পারি। আদিম যুগের বর্বর মানুষের প্রতিবেশ সম্বন্ধে অনির্দেশ্য ভীতিবোধ, জাতিচিহ্নরূপে (Totem) নাগের যে বিশেষ মর্যাদা ও কোন কোন পুরাণে উহাদের দেবতার নিকটাত্মীয়রূপে পরিচিতি—অতীত মানবগোষ্ঠীর এই সমস্ত অস্পষ্ট স্মৃতি ও সংস্কার মনসার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠার মূলীভূত কারণ। পৌরাণিক মনসা ও মঙ্গলকাব্যের মনসার বংশপরিচয় এক হইলেও উহাদের প্রকৃতি ও ক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ কোন মিল দেখা যায় না। মঙ্গলকাব্যে পুরাণের অনুসৃতি নাই, আছে লোক-জীবনের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-নির্ভর ও লোক-আখ্যায়িকা-ভিত্তিক নব পুরাণ-মহিমার সৃষ্টি।

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর উদ্ভব-রহস্য

চণ্ডীর উদ্ভবরহস্য আরও জটিল ও মিশ্র-প্রকৃতির। মঙ্গলকাব্যের সমালোচকেরা উহার জন্য অনার্য-কল্পনা ও আর্যশাস্ত্র উভয়বিধ জন্মসূত্রই নির্দেশ করিয়াছেন এবং এই উভয়জাতীয় নির্দেশের মধ্যেই কিছুটা যাথার্থ্য আছে। মাতৃশক্তির আরাধনা আর্যেতর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে হয়ত প্রথম প্রচলিত ছিল। কিন্তু বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি সুপ্রাচীন আর্যধর্ম-গ্রন্থও অতি পুরাকালেই এই বিশ্বব্যাপিনী মাতৃচেতনার স্ফুরণটি স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। মাতৃকল্পনার সমীকরণ-শক্তির নিকট আর্য ও অনার্য-জীবনদর্শনের ভেদটি সহজেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং চণ্ডীদেবী যখন মঙ্গল-কাব্যে আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে আর্য ও অনার্য এই দুই ভাবধারারই সমন্বয় লক্ষিত হয়। মাতৃ-মহিমানুভূতির সার্বভৌমত্ব, মাতৃসত্তার দেবীরূপে সহজ প্রতিষ্ঠা, মাতৃকরুণার একই প্রকারের অহেতুক অজস্রতা এই সমীকরণ-প্রক্রিয়াকে নিবিড়তর করিয়াছে। তথাপি চণ্ডীদেবীর অনার্য-উদ্ভব তাঁহার পূজার শাস্ত্রনিরপেক্ষ সরল রীতি ও

চণ্ডীর উদ্ভব-রহস্য

তাঁহার কৃপার খামখেয়ালী আতিশয্য প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা সাব্যস্ত হয়। জাতিতে হীন, বৃত্তিতে হেয় ও প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধর্মের লৌকিক-অনুষ্ঠানবর্জিত ব্যাধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার পূজার প্রবর্তন, চণ্ডীর স্বর্ণগোধিকার ছদ্মবেশ-গ্রহণ ও কালকেতুর দাম্পত্যজীবনে বিপর্যয় ঘটাইবার স্থূলরুচি কৌতুকপ্রয়াস—এ-সবই দেবীর অনার্য উদ্ভবের পরিপোষক প্রমাণ। কালকেতুর অবোধ বিস্ময়ে স্ফীত দুইটি চোখে, তাহার শর-সন্ধানোদ্যত বাহুযুগের স্তম্ভিত অসাড়তায়, তাহার দারিদ্র্য-ও-অজ্ঞান-সংকুচিত বিমূঢ় বোধশক্তিতে, তাহার আকস্মিক সম্পদ ও ততোধিক আকস্মিক বিপৎপাতের অস্থির আবর্তনে ও স্বপ্নসুলভ অনিশ্চয়তায় যে-দেবীর মহিমা অস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত, তিনি নিশ্চয়ই চণ্ডী—তন্ত্রশাস্ত্রে অভিনন্দিতা, সূক্ষ্ম দার্শনিকমননোদ্ভবা, ষোড়শোপচারে সম্পূজিতা ও বিদগ্ধ ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা বিশ্বের মূলশক্তি-রূপে স্তূয়মানা মহামায়া নহেন। হয়ত মঙ্গলকাব্যে মাতৃতত্ত্বের এই প্রাকৃতজনোচিত রূপান্তরে একটি গূঢ় ভক্তিরহস্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। মা কেবল অসংশয় ভক্তির দ্বারাই লভ্যা। তিনি সর্বসাধারণের বন্দিতা, কেবল অভিজাতবংশীয় ও শাস্ত্রবিৎ সম্প্রদায়ের উপচারবহুল পূজাবিধির দ্বারা অনুভবগম্যা নহেন।

বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্যগুলির উৎপত্তিকালের যদিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের সাহায্যে উহা মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। পঞ্চদশ শতকের পূর্বে কোন সুনির্দিষ্ট-লেখক-রচিত পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্যের দর্শন মিলে না। কিন্তু এই শতকে রচিত বিবিধ মঙ্গলকাব্যধারার বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে আখ্যান-ভাগের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মধ্যে বাঙলা দেশের সুদূর-প্রান্তবাসী বিভিন্ন আঞ্চলিক কবির লেখা মঙ্গলকাব্যের বহিরবয়ব ও উপাদান-বিন্যাসরীতি অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্বে ইহাদের অঙ্কুররূপের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে বিস্তীর্ণ স্থান ও কাল-ব্যবধানে রচিত এই কাব্যগুলির এরূপ আশ্চর্য ঘটনা-সাম্য ও গঠনগত ঐক্যের কোন সঙ্গত কারণ নির্দেশ করা যায় না। অনুমান করা যায় যে, ত্রয়োদশ শতকে অর্থাৎ মুসলমান-অধিকারের সমকালে বা অব্যবহিত পরে ইহাদের প্রথম খসড়াটি কবিচিত্তে দানা বাঁধিয়াছিল। ইহাদের আদিম রূপটি সম্ভবতঃ পাঁচালী-জাতীয় ও ক্ষুদ্র আখ্যানকেন্দ্রিক ছিল। পরে অন্যান্য আখ্যানের সংযোগে ও পুরাণের অনুসরণে সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবদেবী-বন্দনা, শিবপার্বতীর বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ের প্রক্ষেপে ও লৌকিক জীবনের অনিশ্চিয়তা-উদ্ভূত, ভয়ভক্তিমিশ্র ভাবোচ্ছ্বাসের অন্তর্ভুক্তিতে

মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি-কাল

ইহারা অর্বাচীন পুরাণের বিরাট অবয়ব ও যুগোচিত দেবতত্ত্ব-প্রতিপাদক কোষ-গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রতিটি ধারার আদি-কবির রচনা কেবল জনশ্রুতিতেই রক্ষিত আছে। গ্রন্থ হিসাবে ইহারা বিলুপ্ত। মনসা-মঙ্গলের আদিকবি কানা হরি দত্ত, চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিক দত্ত ও ধর্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূর ভট্ট নামসর্বস্ব হইয়া তাঁহাদের পরবর্তীদের উল্লেখে বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত রচনাগুলি পরবর্তী কবিদের বৃহত্তর ও অধিকতর সুবিন্যস্ত কাব্যে নিজ নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে চিহ্নহীনভাবে মিশাইয়া দিয়াছে।

৩

এখন এই মঙ্গলকাব্যসমূহের পিছনে সমাজমনের কিরূপ পরিচয় ও কবিমানসের কিরূপ প্রেরণা সক্রিয় ছিল, তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। কোন্ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বাঙালীর এই নূতন ধরনের দেব-পরিকল্পনা, দেবতার সহিত সম্পর্ক-স্থাপনের এই নূতন আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করিল, সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা বিচার্য। যাঁহারা মঙ্গলকাব্য-বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন যে, মঙ্গলকাব্যগুলি মুসলমান-আক্রমণেপর্যুদস্ত হিন্দুসমাজের আত্ম-রক্ষামূলক ঐক্য-সাধনার নিদর্শন। তৎকালীন জনসাধারণ যেন বুঝিয়াছিলেন যে, আর্য ও অনার্য-গোষ্ঠীসমূহের নিবিড়তর সংহতি ছাড়া আততায়ী বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিরোধ-সংগঠনের উপায়ান্তর নাই। এই রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক প্রয়ো-জনের প্রেরণাতেই মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাদের মুখে এইরূপ সংশ্লেষাত্মক মিলনের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল। দেবশক্তির নিকট এই অসহায় আত্মসমর্পণ, অনার্য-সমাজ হইতে গৃহীত নূতন দেবমণ্ডলীর নিকট নতিস্বীকার, চিত্তের প্রবল বিমুখতা ও স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির অসমর্থন সত্ত্বেও অপ্রতিরোধ্য পীড়নের নিকট পরাজয়বরণ—সবই মুসলমান-বিজয়ের ফলে জাতির মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, যে হীনম্মন্যতাবোধ বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহারই অনিবার্য প্রকাশ। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে পরাভব একদিকে যেমন অসাধ্য-সাধনক্ষম দেবতার আশ্রয়গ্রহণে ও অনুগ্রহভিক্ষায় প্রণোদিত করিয়া ছিল, তেমনি অপরদিকে দৃঢ়তর সমাজ ও ধর্ম-সংহতির প্রতিও প্রেরণা যোগাইয়া-ছিল। এই উভয়বিধ মনোভঙ্গীর মধ্যে যে একটা স্ব-বিরোধ বর্তমান, তাহা থিওরি-আবিষ্ট সমালোচক-গোষ্ঠীর দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রচেতনাহীন, রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে নৈরাশ্যগ্রস্ত ও দিশাহারা বাঙালী যে রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন সংশ্লেষ-

মঙ্গলকাব্যের পটভূমিতে সমাজমন

প্রতিষ্ঠার উপযোগী মনোবল ও বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিবে, ইহা অনেকটা অবিশ্বাস্যই মনে হয়। তাহা ছাড়া, সমগ্র মঙ্গলকাব্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে উহার মধ্যে নবজাত রাষ্ট্রচেতনা ও তদনুযায়ী সংগঠন-ঔৎসুক্যের ক্ষীণতম নিদর্শনও চোখে পড়ে না। এক মনসার কোপে কাজীর দুর্দশার হাস্যকর চিত্র ও লেখকদের এই দুরবস্থার উপভোগে আহত জাত্যভিমানের কিছুটা উপশম ছাড়া কোথাও পরাধীনতার গ্লানির বা স্বাজাত্যবোধের কোন ইঙ্গিতই লক্ষ্যগোচর হয় না। সময়ের দিক দিয়া বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-যুগ স্বীকার করিলেও, মুসলমান-বিজয়ের প্রতিক্রিয়া যে এত শীঘ্র সাহিত্যে সঞ্চারিত হইবে, তাহা সম্ভব মনে হয় না। বিশেষতঃ, নবদ্বীপ হইতে বিতাড়িত সেনবংশ আরও এক শতাব্দী ধরিয়া পূর্ববঙ্গে স্বাধীন রাজার ক্ষীয়মান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন—এই ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলকাব্যসমূহের রাষ্ট্রচেতনা-সম্ভবত্বে সন্দেহ অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

ধর্মাদর্শের অধো-গামিতার কারণ

ইহার সহিত সম্পর্কিত আর একটি প্রশ্নও এই উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক। দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এইরূপ নিম্নগামী কেন হইল, এই হঠাৎ-উদ্ভিন্ন দেবসমাজ মানুষের নিম্নতম প্রবৃত্তির অনুকরণে সমাজে নিজেদের পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য কেন এরূপ লালায়িত হইয়া উঠিলেন, সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী দেবগোষ্ঠী—বিশেষতঃ শিবঠাকুর—কেনই বা ভক্তের মনোরাজ্য হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইলেন, ধর্মজীবনের এই পরিবর্তন-ছন্দটির কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভব কি না, তাহা বিশেষভাবে অনু-ধাবনীয়। মধ্যযুগে দেব-মানবের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যে কেবল রূপক-কল্পনা বা মানস সম্মোহের মরীচিকামাত্র ছিল না, পরন্তু নিঃসংশয় বাস্তব সত্যের পর্যায়ভুক্ত ছিল, তাহা বর্তমান কালের যুক্তিবাদ-প্রভাবমুক্ত হইয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। মধ্যযুগের কাব্যে স্বপ্ন-প্রত্যাদেশের বারংবার উল্লেখ, দেব-দেবীর সশরীরে ভক্তসমক্ষে আবির্ভাব ও ভক্তের মনোবাঞ্ছা-পূরণ, ভক্তের বিপদে তাঁহাদের কল্যাণহস্ত-প্রসারণ, ভক্তের সহিত তাঁহাদের মানবিক ভাবাবেগ-অনুসারী আচরণ এই সার্বভৌম, অব্যভিচারী, সহজ প্রত্যয়ের নিদর্শন। সমগ্র ধর্মসাহিত্য এই বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর রচিত। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের কবিরা দেবমহিমার যে বর্ণনা করিয়াছেন, দেবতা-মানুষে মিলনের যে-অসংখ্য উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিকট প্রত্যক্ষ সত্যরূপেই প্রতিভাত ছিল। তাই তাঁহাদের উক্তিতে কোথায়ও দ্বিধা নাই, কোন প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা

সংশয়-নিরসনের কোন ক্ষীণতম প্রয়াসও নাই। মানবিক ঘটনা ও দৈব সংঘটন যেন একই নিয়মের বশবর্তী হইয়া পাশাপাশি চলিতেছে ও নানা উপলক্ষ্যে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। দেবতা কোন রহস্যময় যবনিকার অন্তরাল হইতে কোন অদৃশ্য সূত্র-সঞ্চালনে এই পৃথিবীর ভাগ্যনির্ণয় করিতেছেন না, তিনি মানুষের সহযাত্রী হইয়া একই জীবনের পথে চলিতেছেন ও তাঁহার অপরিমিত শক্তিকে মানবজীবন-নিয়ন্ত্রণে অকুণ্ঠভাবে প্রয়োগ করিতেছেন। যে-সংস্কার-পটভূমিকায় মঙ্গলকাব্য রচিত, সেই সংস্কার বাঙালী হিন্দুর ধর্মবোধ ও জীবনপ্রত্যয়ের মধ্যে কেমন করিয়া বিকশিত হইল? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে উদাসীন ও বিত্তহীন শিব ভক্তকে যে-নিরাপত্তা-বোধ ও দাক্ষিণ্য-প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না, তাহাই এই নবোদ্ভূত জনদেবতা-গোষ্ঠী অকৃপণ হস্তে পরিবেশন করিয়া অসংখ্য ভক্তের অন্তরলোকে নিজ নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার কি সবটাই কল্পনা ও অপূর্ণ আশা, না ইহার কিছুটা বাস্তব-ফল-প্রাপ্তি-সমর্থিত? শিবের নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে এই সদ্য-আবির্ভূত দেবমণ্ডলীর সক্রিয়তা কোন্ প্রমাণে ভক্তহৃদয়ে অত্যাজ্য সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? দুইপ্রকার দেবতার ফলদাতৃত্বের বিচারে দুই রকমের মানদণ্ড কেন অবলম্বিত হইয়াছিল?

এই দেবতাত্রয়ীর পূজাপ্রচারের উৎকট আকাঙ্ক্ষা, স্বভাব-হিংস্রতা ও অনুসৃত উপায়ের নিন্দনীয়তা ঠিক সমমাত্রিক ছিল না। ইহাদের মধ্যে ধর্মঠাকুর অনেকটা নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয়; হিন্দুধর্ম-প্রভাবিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার আদিদেবতারূপে তিনি ইতিপূর্বেই কতকটা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ভক্তকে প্রলুব্ধ করার তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। বরং তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে ভক্তকে কৃচ্ছ্রসাধনমূলক তপস্যা করিতে হইত। যুদ্ধে অজেয়ত্ব ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্যয় ঘটাইবার শক্তি তাঁহার প্রসাদলভ্য ছিল। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের দেবচরিত্রে যে-ভক্তিলোলুপতার আতিশয্যের একটা সাধারণ লক্ষণ ছিল, ধর্মঠাকুর অনেকটা তাহার স্পর্শমুক্ত। বৌদ্ধধর্মের বিকারযুগে দেবারাধনা যখন পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাবে পূজাবিধির উপচার-বহুলতার দিকে ঝুঁকিয়াছিল ও তান্ত্রিকতার জটিল অভিচারক্রিয়ার সাহায্যে অলৌকিক ফললাভ-প্রত্যাশী হইয়াছিল, ধর্মঠাকুর সেই পরিবর্তনযুগের ভক্তিভাব-সাঙ্কর্যের দেবতা। ইহার হিন্দুধর্মগ্রহণোৎসুক নিম্নবর্ণের উপাসকগোষ্ঠী ইহাকে উচ্চবর্ণের দেবমণ্ডলী-ভুক্ত করিবার প্রয়াসেই মঙ্গলকাব্য-মাধ্যমে ইহার মাহাত্ম্য কীর্তন করে। ইনি হিন্দুদেবতার মধ্যে স্থান না পাইলেও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহার পূজাচর্চা এখনও অক্ষুণ্ণ

ধর্মঠাকুরের বৈশিষ্ট্য

আছে। ইহার সম্বন্ধে উচ্চবর্ণের হিন্দুর প্রবল আকর্ষণ ও প্রবল বিমুখতার মাঝামাঝি একটা নিরুৎসুক উদাসীন মনোভাবই বর্তমান।

চণ্ডী দেবীই তাঁহার দীর্ঘযুগব্যাপী ভাবোন্নয়নের ফলে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বের সহিত প্রায় একাত্মভাবেই মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনার ক্রমবিবর্তন-প্রক্রিয়ায় আমরা তাঁহার অনার্যত্ব প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি। যে-মাতৃশক্তি আর্য-অনার্য উভয়েরই সমভাবে অর্চনীয়, তাঁহারই জ্যোতির্মণ্ডল ও বিশুদ্ধ ভাবাদর্শ তাঁহার আদিম কুলপরিচয়কে এক ভাস্বর যবনিকার অন্তরালে গোপন করিয়াছে। তাঁহার আত্মপ্রচার-ক্রিয়াও অপেক্ষাকৃত মৃদু ও নির্দোষ। তিনি পশুর দেবতা হইতে পশু-হন্তার দেবতায় অনেকটা আকস্মিকভাবেই উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে প্রসন্ন স্নিগ্ধতা ও সরস কৌতুকময়তাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহার খামখেয়ালী মেজাজ ও লৌকিক-মাতৃসুলভ সন্তান-বাৎসল্য কলিঙ্গরাজ্য-প্লাবনেই উদাহৃত। কালকেতু উপাখ্যানে কালকেতুকে বিপন্মুক্ত ও রাজত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি-উপাখ্যানে তাঁহার মঙ্গলচণ্ডীরূপে পূজা বণিক-পত্নীদের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়াছে। শিবভক্ত ধনপতি স্ত্রীদেবতার প্রতি অবজ্ঞা-বশতঃ তাঁহার ঘট পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া তাঁহার রোষভাজন হইয়াছে। তাঁহার ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে মনসার মত প্রাণহননে ও অতন্দ্র প্রতিহিংসাবৃত্তির প্রত্যক্ষতায় নয়, নৌকাডুবির মৃদুতর শক্তিতে ও কমলে-কামিনীর ছলনাময়ী মায়া-বিভ্রান্তিতে। তাঁহার সেবিকা খুল্লনার সপত্নীকৃত নির্যাতনের সময় তিনি নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ধনপতির ত্রুটি-স্বীকারে ও প্রায়শ্চিত্তে তিনি আবার প্রসন্না মাতৃমূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে অনাবিল সংসারসুখে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার দৈবী মহিমা প্রকটিত হইয়াছে দৈহিক শক্তির নিষ্ঠুর পীড়নে নয়, দুর্বোধ্য লীলারহস্যের মায়াজালপ্রসারে। চণ্ডী হইতে অন্নপূর্ণার ক্রমবিকাশ-ধারাটি আমাদের নিকট অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্যে প্রতিভাত হয়—মধ্যযুগের অলৌকিক কুহেলিকা হইতে প্রাক্-আধুনিক কালের স্বতঃ-আলোকিত সহজবোধ্যতায় তাঁহার অবতরণ একান্ত স্বাভাবিক ও অপরিহার্য।

চণ্ডীদেবী-কল্পনার ক্রমবিবর্তন

দেবচরিত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে মনসার ক্ষেত্রে। সর্পমাতার দেবত্বে উন্নয়ন আমাদের নিকট অস্বাভাবিক ও সহজ ন্যায়ের বিরোধী বলিয়াই ঠেকে। এক দৈবী শক্তি ও ক্রূর প্রতিহিংসার চরম নির্মমতা ছাড়া তাঁহার দেবত্বের আর কোন অধিকার নাই। সমাজমন কতটা ভয়চকিত হইলে ও

সম্ভ্রমবোধ হারাইলে দেবত্বপরিকল্পনা এরূপ হীন রূপ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার পরিমাপ করিতেও সংকোচ হয়। মনে পড়ে যে, অষ্টাদশ শতকের শেষে যখন বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ভারত-কুশাসনের অভিযোগ উপস্থাপিত হয়, তখন হেস্টিংসের আপাতজনপ্রিয়তা-যুক্তির খণ্ডনে মহামতি বার্ক বাঙালী-চরিত্রের এই এই সর্পপূজা-প্রবণতার বিদ্রূপাত্মক উল্লেখ করেন। মনসামঙ্গল কাব্যেই বোধ হয় মুসলমান-বিজয়ের পরোক্ষ ছদ্মবেশী প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। অসহায় অদৃষ্টনির্ভরতা ও অত্যাচারী শক্তির নিকট আত্মসমর্পণের বিষ জাতির অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত না হইলে, মনসাপূজা সমাজে অনুষ্ঠিত হইলেও কখনও কাব্যের বিষয়রূপে গৃহীত হইতে পারিত না। ধর্মঠাকুরের মধ্যে আত্ম-সমাহিত মহিমা ও চণ্ডীর মধ্যে মাতার উদ্ভট আচরণে সন্তান-বৎসলার স্নেহোচ্ছলতা আমাদের ভক্তিবিগলিত দেবস্বীকৃতির কিছুটা প্রেরণা দেয়। কিন্তু মনসার হাজার দোষের মধ্যে কোন গুণই আমাদের চিত্তে ক্ষীণতম রেখাপাত করিতে পারে না। ভক্তির মধ্যে কিছুটা ভীতি, সম্ভ্রম ও দূরত্ব-বোধ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যে-ভক্তি একান্তভাবে ভীতিনির্ভর, যাহার মধ্যে উচ্চতর দেবপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার কোনও নিদর্শন নাই, তাহা যেমন বীভৎস দেবতার স্বরূপ কল্পনা করে, সেইরূপ জাতীয় চরিত্রের চরম অধঃপতনেরও নির্দেশ দেয়। অন্য দেবতার পূজা হয় কিছু ফলপ্রাপ্তির আশায়; মনসার পূজা নিছক আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য-মূলক। মনে হয়, বাংলা দেশ একই নীতিতে বৈদেশিক অভিভব ও হিংস্র দেবতার পূজা মানিয়া লইয়াছিল। মনসার পূজা যদি কালের দিক দিয়া অগ্রবর্তী হয়, তবে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সর্পবিষ-স্তিমিত মনোবল লইয়াই বাঙালী বৈদেশিক আক্রমণের ব্যর্থ প্রতিরোধ-চেষ্টায় ব্রতী হয়।

মনসাচরিত্র-কল্পনায় সমাজমনের ভয়ার্ত রূপ

এই-সমস্ত তথ্য ও অনুমানের যথাযথ মূল্যায়নে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তুর্কী-আক্রমণের বহু পূর্ব হইতেই—দশম-একাদশ শতক হইতেই—বাংলার হিন্দু ও বৌদ্ধ এবং আর্য ও অনার্য-স্তরগুলির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ ও মিলনস্পৃহার জন্য ধর্ম ও সংস্কৃতি-গত একটা ব্যাপক পরিবর্তন-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও অনার্যগোষ্ঠীভুক্ত সম্প্রদায়গুলি দৃঢ় অধ্যাত্ম-প্রত্যয় ও সুস্পষ্ট ধর্মস্বাতন্ত্র্য হারাইয়া পৌরাণিক ও তান্ত্রিক হিন্দু-ধর্ম ও দেবতামণ্ডলীর মধ্যে এক মিশ্র-দেবতত্ত্বের আশ্রয়গ্রহণে উৎসুক হইয়া

মঙ্গলকাব্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের আভাস

উঠিয়াছিল। পৌরাণিক বিশুদ্ধ ভক্তিবাদের সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার পার্থিবঐশ্বর্যস্পৃহা মিশ্রিত হইয়া এক আদর্শহীন, দেবপ্রসাদ-লালায়িত, ভক্তিমূল্যে সুখক্রয়লোলুপ ভিক্ষা-মনোবৃত্তি মানুষ ও দেবতার মধ্যে নূতন-সম্পর্ক-নির্ণায়ক হইয়া দাঁড়াইল। ধর্মের উন্নত-আদর্শভ্রষ্ট দুর্বল মানুষ কামনার প্রশ্রয়দাতা দেবতার চরণে ভূলুণ্ঠিত হইয়া কিছু ধূলিমলিন সংসারসুখ অর্জন করিয়াই ভক্তিসাধনার সুলভ চরিতার্থতা লাভ করিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই পরিবর্তন-তরঙ্গেরই কয়েকটি আলোড়ন-বিন্দু বিধৃত হইয়াছে। উহাদের মূল প্রেরণা রাষ্ট্রনৈতিক নয়, ধর্ম ও সমাজতত্ত্ব-ঘটিত; উহাদের উদ্দেশ্য বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগঠন নয়, সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ মানস-আবেগ-প্রবর্তিত সমন্বয়-প্রয়াস। বিদেশী শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য নয়, নিজ ধর্মাশ্রয়চ্যুতির শূন্যতা-পূরণের জন্যই এই নবদেবপরিকল্পনা ও বৃহত্তর মিলনাকৃতি। ক্ষীয়মান বৌদ্ধধর্মধারা ও বিচ্ছিন্ন অনার্যগোষ্ঠীর শীর্ণ পারলৌকিক আকূতি-নির্ঝর যে-ভাবতরঙ্গে স্ফীত হইয়া হিন্দুধর্মবোধের সমুদ্র-সঙ্গমে পৌঁছিতে চাহিয়াছিল, মঙ্গলকাব্যসমূহ সেই তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত কয়েকটি বিরাট হ্রদ। যে-মুষ্টিমেয় সাধক গীতা-উপনিষদের দুষ্প্রবেশ্য ভাবলোকের অধিবাসী বা বৈষ্ণব-ভাবসাধনার অলৌকিক রসমাধুর্যে সংসার-বিবিক্ত, তাহাদের বাদ দিয়া বাকী অগণিত বাঙালী জনসাধারণ এই মঙ্গলকাব্যের ঈষৎ-কষায় কূপোদকেই আপনাদের ধর্মতৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে। সাধারণ বাঙালীর ধর্মজীবন, উহার সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-নিরাপত্তার স্থূল কামনা, উহার পূজা ও প্রসাদের নিত্যসম্পর্কবিষয়ক প্রত্যাশা, উহার নিম্নকোটিক আদর্শ—সবই মঙ্গলকাব্যের সংকীর্ণভাবকল্পনা-পুষ্ট। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ঝটিকাঘাত এই পরিবর্তন-তরঙ্গের গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া থাকিবে, কিন্তু ইহা তরঙ্গোচ্ছ্বাসের আদিম প্রেরণার সহিত নিঃসম্পর্ক।

৪

মঙ্গলকাব্যে সমাজ-জীবনের ছবি

মঙ্গলকাব্যের ব্যাপ্তিকাল চৈতন্য-পূর্ব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় চারিশত বৎসর ধরা চলে। ইহার মধ্যে বাঙালী-সমাজের নানা পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক। পাঠানশাহীর অবসানে তখন মোগল-সাম্রাজ্য বাংলার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়াছিল। কিন্তু পল্লীপ্রধান বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে রাজনৈতিক ঘনঘটা সাময়িক ছায়াপাত করিলেও কোন বাত্যাচঞ্চল দ্রুত পরিবর্তনের প্লাবন আনিতে পারে নাই। স্বাভাবিক ভাবে শম্বুক-গতিতে জীবনধারা প্রবাহিত হইতেছিল এবং যে-পরিবর্তনের পথে সমাজ চলিতেছিল,

তাহার গতিও ছিল মন্থর। এই কারণে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা ওলট-পালট না হওয়াতে, এই চারিশত বৎসরের সামাজিক অবস্থা মোটামুটি অতীতানুসারী ছিল এবং মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য হইতে এই ধীর রূপান্তর-প্রক্রিয়ার একটা নক্শা পাওয়া যায়। কিন্তু বাহিরের আক্রমণের বেগ খুব বেশী না হইলেও শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তাঁহার প্রভাব বাঙালী-সমাজকে শুধু ধর্ম-জীবনে নহে, সামাজিক জীবনেও একটি নির্দিষ্ট পরিণতির পথে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল এবং এই গতির প্রবলতাকে অনেকে সমাজ-বিপ্লব বলিয়াও গ্রহণ করিয়াছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তখন সবে শুরু হইয়াছে। কিন্তু ইহা চৈতন্যদেবের পূর্ব পর্যন্ত নবাব, রাজা, জমিদারের আশ্রয় ছাড়া স্বাধীন বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। কবিগণ, 'গুণরাজ খাঁ', 'কবিকঙ্কণ' প্রভৃতি নানা খেতাব পাইতেন।

বেশভূষা-অলঙ্কারের মধ্যেও এই সময়ে সুরুচি ও উন্নত শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের পোশাক—"একখানি কাচিয়া পিন্ধে, আর একখান মাথায় বান্ধে, আর একখান দিল সর্ব গায়।" মেয়েরা পশ্চিমাদের মত কাঁচুলি পরিতেন, বিশেষতঃ উৎসব-সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। মেঘডম্বুর-আদি নানা রকমারি শাড়ীর নাম পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা পরিত 'খুঞার বসন।' শাঁখা ও স্বর্ণালঙ্কারের নাম পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফুলের গহনার প্রতিও আগ্রহ দেখা যায়। পুরুষদের হাতে বলয়, কানে সোনার কুণ্ডল থাকিত। লম্বা চুল রাখা পুরুষগণেরও সৌন্দর্যবর্ধক ছিল। "পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল। জ্ঞাতিগণ ধরি নিল গাঙ্গুড়ির কূল।" নাগর জীবন সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—"নগরে নাগরজনা, কানে লম্বমান সোনা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তসর রঞ্জন পরিধান।" কানাড়ী প্রভৃতি নানা ছন্দে খোঁপা বাঁধিতেন মেয়েরা।

বিদ্যাচর্চা উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। টোলের অধ্যাপক ব্রাহ্মণই হইতেন এবং উঁহাদের ব্যাকরণ-প্রীতি অধিক ছিল। স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন বেশী ছিল না। তবে কেহ কেহ সামান্য কিছু জানিতেন।

দেশে বণিকদিগের খানিকটা খ্যাতি ছিল। সমুদ্রযাত্রার যে-সব বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা শোনা কথা বলিয়াই মনে হয়। বাণিজ্য-বহর নৌকাতে চলিলেও তাহা যে সমুদ্রপার হইয়াছে, বর্ণনা দ্বারা তাহা বোঝা যায় না। দ্রব্যবিনিময় হইত। কড়ি দিয়া সাধারণতঃ কেনা-বেচার রীতি ছিল। পণ্য-মূল্যের তালিকা দেখিয়া জিনিসপত্র অত্যন্ত সুলভ ছিল বলিয়া মনে হয়।

যুদ্ধের বর্ণনা যেগুলি পাওয়া যায়, তাহা অনেকখানি কৃত্রিম। যথার্থ বীরত্ব তাহার মধ্যে নাই। বাঙালী সৈনিক ছিল এবং নানা জাতির মধ্য হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইত। বড় রকমের যুদ্ধের বর্ণনা মঙ্গলকাব্যে নাই। ধর্মমঙ্গলের যুদ্ধগুলি অতি-প্রাকৃত-প্রভাবপুষ্ট বর্ণনা।

রাজনৈতিক পরিবেশে যে একটা ভয়াবহ অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি বা ব্যাপক মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। মুসলমান ডিহিদার ও নবাবগণ ক্ষেত্রবিশেষে বিধর্মীদের উপর অত্যাচার করিতেন। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে তাহার আভাস আছে। কিন্তু তাহা কদাচ অরাজকতা সৃষ্টি করে নাই—স্থানীয় ও সাময়িক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কালকেতুর নগর-পত্তন-পালার যে নিখুঁত বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাতে যে বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রার ছবি দিয়াছেন, তাহাতে একটা নূতন সমাজ-সংগঠন ও বিরুদ্ধ উপাদানের সমন্বয়ের এক সুনিশ্চিত আভাস মিলে। ইংরাজ-যুগ পর্যন্ত যে-সমাজ-ব্যবস্থা ও রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার যে প্রথম ভিত্তি-পত্তন ষোড়শ শতকে হয়, মুকুন্দরামের মঙ্গলকাব্য হইতে আমাদের এই প্রতীতিই জন্মে। ঘর-গৃহস্থালির কথা, বহুবিবাহের বিষয়, সতীনের জ্বালা, বশী-করণের ঔষধ করিবার চেষ্টা ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিচিত্র বিবরণ আছে। ভারত-চন্দ্রের আমলে আসিয়া গ্রাম্য জীবনের সরলতা নাগর বিলাসিতার রুচি দ্বারা অভিভূত হইয়াছে দেখা যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে এই কারণে ভারতচন্দ্রের কাব্য অনেকখানি অভিজাত। তাহা হইলেও বাঙালী জাতির অন্তরের সাধারণ কথাটি ভারতচন্দ্রের মধ্যে ভাষা পাইয়াছে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" অর্থাৎ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের প্রাচুর্যপূর্ণ সহজ সরল জীবনই তখন অনভিজাত সমাজের প্রধান কাম্য ছিল।

৫

এখন এই তিনজাতীয় প্রধান মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক কৃতিত্ব ও সমাজ-চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা সম্বন্ধে কিছু তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন। ইহাদের ঐতিহাসিক কাল-নির্ণয় এত অনিশ্চয়াত্মক ও অনুমানের উপর নির্ভরশীল যে, এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব। বিশেষতঃ এই আনুমানিক কালক্রমের প্রতি অতিমনোযোগ উহাদের শাশ্বত সাহিত্যমূল্য-

নির্ধারণ বিষয়ে আমাদিগকে অনেকটা উদাসীন করিয়া তোলে। অথচ বাংলা সাহিত্যে উহাদের স্থান সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যগুণনির্ভর।

(ক) ধর্মমঙ্গল কাব্য

রচনার দিক দিয়া না হইলেও বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্বে ও বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়-প্রয়াসের প্রত্যক্ষ নিদর্শনরূপে ধর্মমঙ্গল কাব্যই আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ সমস্ত মঙ্গলকাব্যের দেবতত্ত্ব-অধ্যায়ে যে সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা নাথ ও বৌদ্ধ ধর্মচিন্তার মিশ্রিত আকর হইতে সংগৃহীত। এইগুলিতে শিবদুর্গার যে পরিণয়-কাহিনী ও গার্হস্থ্য জীবন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা অনার্য ও অ-হিন্দু উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে পৌরাণিক ধর্মাদর্শের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুরাণশাস্ত্রসম্মত ও হিন্দুভক্তিসাধনা-পরিশ্রুত পরিণতি লাভ করিয়াছে। ধর্ম সূর্যদেবতাই হউন বা ছদ্মবেশী বুদ্ধই হউন, তিনি যে বাংলার নিম্নবর্ণ সমাজে বহুপূর্ব হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা সুস্পষ্ট। তিনি অনভ্যস্ত পূজালোলুপ নূতন দেবতা নহেন। তিনি সুপ্রাচীন অতীত হইতেই বাঙালী জাতির একটি বৃহৎ অংশের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি উপভোগ করিয়া আসিতেছেন ও যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণেও নিজের ব্যক্তিত্ব যথাসম্ভব বজায় রাখিয়াই উচ্চবর্ণের পৌরাণিক দেবতার সহিত অভিন্নত্ব-লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

পূজা-নিস্পৃহ প্রাচীন মিশ্র দেবতা ধর্মঠাকুর

ধর্মের পূজাবিধির জটিল বিমিশ্রতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ পরম্পরা, উহার মন্ত্রে সংস্কৃত ও লৌকিক বাংলার যুগপৎ প্রয়োগ ও অর্চনায় উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ ও নিম্নবর্ণ ডোম পুরোহিতের নিষ্ঠাপূর্ণ সহযোগিতা, উহার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপে কৃচ্ছ্রসাধনের প্রাধান্য ও অসম্ভব সংঘটনের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও উহার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-সমর্থিত অবিচল প্রত্যয়—এ সমস্তই উহার অসাধারণ সামাজিক ও ধর্মীয় তাৎপর্যের নিদর্শন। আর কোন দেবতার পূজায় জাতিভেদ-বিড়ম্বিত হিন্দু সমাজ এত ভেদবুদ্ধিহীন, সার্বজনীন ভক্তির আশ্রয়ে অখণ্ড ঐক্যের স্ফুরণ অনুভব করে নাই। আর কোন দেবতার পূজায় পূজারী এমন হাতে হাতে ফল পায় নাই। বন্ধ্যার সন্তান-লাভ, কুষ্ঠরোগী ও অন্ধের সদ্যোরোগমুক্তি জাতির মনে আর কোথাও এমন দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করে নাই। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য যে ধর্মের ভক্ত্যাদের আগুনে ঝাঁপাইয়া, হাত-পা-বুক শূলে ফুঁড়িয়া, লৌহকাঁটাবিদ্ধ পাটায় গড়াগড়ি দিয়া

হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে এরূপ অক্ষত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইবার দৃষ্টান্ত আর কোন দেবপূজার মধ্যে নাই। এ সমস্তই ধর্মের অলৌকিক শক্তি ও অসীম ভক্তবাৎসল্যের চাক্ষুষ প্রমাণরূপে ধর্মপূজকদের মনে এক অপূর্ব উন্মাদনা ও সন্দেহ-লেশহীন বিশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছে। ধর্মঠাকুরের কৃপায় স্বর্গ-মর্ত, সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়াছে ও মৃতের পুনর্জীবন ও পশ্চিমে সূর্যোদয়ের ন্যায় অনৈসর্গিক সংঘটনের সম্ভাব্যতা ভক্তমণ্ডলীর মনে একটা সহজ সংস্কারের মতই বদ্ধমূল হইয়াছে। কাজেই ধর্মঠাকুরের প্রভাব-প্রতিপত্তি যে অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর পরোক্ষ আশ্বাস ও বিলম্বিত বিপন্মুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মর্যাদার অপেক্ষা বেশী সজীব ও সক্রিয় ছিল তাহা সহজেই বোঝা যায়।

ধর্মপূজার সার্বজনীন রূপ ও অলৌকিক বিশ্বাস

বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্বে ধর্মমঙ্গল কাব্য সর্বাপেক্ষা পূর্বগামী। প্রায় প্রত্যেক ধর্মমঙ্গলের ঘটনার কালনির্দেশরূপে ধর্মপাল ও তাঁহার পুত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অন্ততঃ এই দুইটি নামকে ঐতিহাসিক বলিয়া ধরিলে ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত ঘটনাগুলি খ্রীষ্টীয় নবম—দশম শতকের ব্যাপার দাঁড়ায়। অন্যান্য চরিত্রগুলির—যথা লাউসেন, ইছাই ঘোষ প্রভৃতির—ঐতিহাসিকতার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না মিলিলেও তাহারা ঐতিহাসিক প্রতিবেশের সহিত বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ। এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে রাঢ়ের যুদ্ধবিগ্রহবিক্ষুব্ধ, রাজনৈতিক-ষড়যন্ত্রকুটিল, গৌড়েশ্বর ও তাঁহার সামন্ত রাজাদের কখনও আনুগত্য, কখনও বিদ্রোহ-চিহ্নিত সম্পর্কের যে পরিচয় মিলে তাহা বাস্তব ইতিহাসের অঙ্গীভূত রূপে কল্পনা করিতে আমাদের কোনই অসুবিধা হয় না।

ধর্মমঙ্গলের প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিকত্ব

অবশ্য যুদ্ধের বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলেও আছে। কিন্তু সেখানে যুদ্ধ ও রাজবর্গপ্রকৃতি সমস্তটাই ঘরোয়া ও দেবতার অলৌকিক শক্তি-বিকাশের পটভূমিকারূপে কল্পিত। দেবতারা যুদ্ধ বাধাইয়া ভক্তকে বিজয়ী করিয়া নিজ মহিমা দেখাইতেছেন ও ভক্তির আরও উচ্চতর রাজকর আদায় করিতেছেন। ভাঁড়ু দত্ত এখানে দেবীর ইচ্ছার অসংজ্ঞান বাহনরূপে কলিঙ্গকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছে। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলে দেবী নিজে ডাকিনী-যোগিনী সহ রণাঙ্গনে অস্ত্র ধরিয়াছেন। মুকুন্দরামে দেবী যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া স্বপ্নাদেশে বিজয়ী কলিঙ্গরাজকে পরাজিত কালকেতুকে নিজরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য করিয়াছেন। মোট কথা এই যুদ্ধ দৈবী মায়ার মতই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়; যুদ্ধের সমস্ত মারামারি-কাটাকাটির পিছনে নেপথ্যবাসিনী মহামায়ার অদৃশ্য উপস্থিতি সমস্ত বিষয়টিকে অমানবিক কুহেলিকায় ঘিরিয়াছে। ধর্মমঙ্গলে যুদ্ধসমূহ বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রয়োজন

ও মানবিক-বৃত্তি-সঞ্জাত। সমস্ত যুদ্ধেই ধর্মপ্রসাদপুষ্ট লাউসেন জয়লাভ করে। কিন্তু রক্তপাত ও নৃশংসতা, অস্ত্রের ক্ষেপ-প্রতিক্ষেপ ও মানবিক বিজিগীষার উত্তাপ-উত্তেজনা উহাদের মধ্যে সুপরিস্ফুট। এইরূপ একটি যুদ্ধে সামন্তরাজ কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হয়, ছয় বধূ সহমরণে যায়, রানী অসহ্য দুঃখে আত্মঘাতিনী হন, ও বৃদ্ধ রাজার অন্তিম জীবনে নিঃসঙ্গতার বেদনা ঘনীভূত হইয়া উঠে। এই শোকের কোন দেবানুগ্রহমূলক সুলভ সমাধান হয় নাই। পক্ষান্তরে মনসার কোপে হত চাঁদের ছয়পুত্র আবার তাঁহার প্রসাদে বাঁচিয়া উঠে, বৈধব্যব্রতচারিনী ছয় বধূর মুখের হাসি সিঁথির সিঁদূরের সহিত আবার উজ্জ্বল হয়, চাঁদের শোকান্ধকার গৃহে শান্তির মঙ্গল দীপ নূতন করিয়া প্রজ্বলিত হয়। শাপভ্রষ্ট দেব-দেবী লখীন্দর-বেহুলা তাঁহাদের দৈবনির্দিষ্ট কার্য সমাপ্ত করিয়া স্বর্গলোকে ফিরিয়া যান, কিন্তু ফিরিবার পূর্বে মানবের বিধ্বস্ত জীবনযাত্রার ভারসাম্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং নির্মম, সান্ত্বনাহীন ভাগ্য-বিড়ম্বনার উদাহরণ-স্বরূপ ধর্মমঙ্গলের জীবনবেদনা মনসামঙ্গলের সহিত তুলনায় আমাদের মনে আরও তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

রাঢ়ের জনজীবনের যে খণ্ডাংশসমূহ ধর্মমঙ্গল-কাব্যে স্থান পাইয়াছে তাহা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুর সহিত তুলনায় সম্পূর্ণ অভিনব ও জাতীয় মানসের একটা নূতন দিক্ উদ্ঘাটিত করে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে সাধারণ বাঙালীর যে মেরুদণ্ডহীন নমনীয়তা, দেবতার অভিপ্রায়ের নিকট আতঙ্কিত আত্মসমর্পণের যে চিত্র পাই, এখানে তাহার বিপরীত রূপটিই আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও দেশরক্ষার প্রয়োজনের মধ্যে যে সংকল্পের দৃঢ়তা, যে অনমনীয় প্রতিরোধস্পৃহা স্বাভাবিক, এখানে বাঙালী চরিত্রে সেই সমস্ত গুণেরই বিকাশ দেখা যায়। বিশেষতঃ মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে হীনবর্ণ বাঙালী সমাজের প্রত্যক্ষ দর্শন মিলে না। উহাদের ঘটনা সমস্ত দেবতাকেন্দ্রিক ও ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন মানব চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। ধর্মমঙ্গলে একমাত্র লাউসেন ও ইছাই ঘোষ দৈবশক্তিসম্পন্ন, দেবানুগৃহীত অতিমানব। কিন্তু অন্যান্য নর-নারী সকলেই দেবতাসম্পর্কহীন সাধারণ মানুষ ও মানবিক শক্তি ও দুর্বলতার উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা জীবনসমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। কালু ডোম, লখাই ডোমনী প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর নর-নারী ও কলিঙ্গা, কানাড়া প্রভৃতি অভিজাতবংশীয়া রমণীরাও অদ্ভুত শৌর্যবীর্যসম্পন্ন ও প্রখর ব্যক্তিত্বসমন্বিত। দেবভক্তি ও বীরত্বময় আত্মপ্রত্যয় যে পরস্পরবিরোধী, ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা বহু পরিমাণে

অপনোদিত হইয়াছে। রাঢ়রমণীগণের অপূর্ব বীরত্ব-গাথায় বাঙালীর অদৃষ্টনির্ভর ভীরুত্বের অপবাদ অনেকটা খণ্ডিত হইয়াছে। মহামদ পাত্রের চরিত্রে রাজনীতিসুলভ কূটচক্রান্তপ্রবণতার চমৎকার নিদর্শন মিলে। লাউসেনের প্রতি ঈর্ষ্যাবিকৃত চিত্ত লইয়া সে তাহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত হীন চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে ও লাউসেন যে উপায়ে সে সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অলৌকিকত্বের সংস্রব থাকিলেও তাহারা প্রধানতঃ বাস্তব রাজনৈতিক-কারণ-উদ্ভূত। মহামদ দুর্বৃত্ত বটে, কিন্তু তাহার দুর্বৃত্ততা তাহার সচিবসুলভ কূটনীতির সহিত জড়িত। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মহামদ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ধর্মঠাকুরের প্রতি যে পূজানিবেদনে প্ররোচিত হইয়াছিল, ধর্মঠাকুর তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সুতরাং যে কোন অজুহাতে পূজা-আদায়ের জন্য লোলুপ মঙ্গলকাব্যের দেব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। সবসুদ্ধ মিলিয়া ধর্মমঙ্গলে রাঢ়ের রাজনৈতিক জীবনযাত্রা ও উহার নিম্নশ্রেণীর নর-নারীর মহিমান্বিত দেশাত্মবোধের যে উজ্জ্বল, বস্তুরসসমৃদ্ধ চিত্র আমরা পাই, তাহাতে ইহাদিগকে রাঢ়ের মহাকাব্যের খণ্ডাংশরূপে অভিহিত করা অসঙ্গত হয় না।

ধর্মমঙ্গলে রাঢ়ের জনজীবনের প্রতিচ্ছবি

ধর্মমঙ্গলের বিষয়বস্তু প্রাচীনতম; কিন্তু উহার কাব্যনিদর্শনসমূহ সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অত্যাধুনিক। ইহার কারণ এই যে ধর্মের পূজাবিধির মধ্যে যে ব্যাপক ও জটিল সংশ্লেষ-ক্রিয়া লক্ষিত হয় তাহা বহু শতাব্দীর অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফল। এই সংশ্লেষ সম্পূর্ণ না হইলে উহার কাব্যরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। আদিতে যে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী উহার বীজরূপে বিন্যস্ত ছিল, তাহাই পরবর্তী কালে ইতিহাসের ঘটনা-অবলম্বনে, গৌড়েশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া লাউসেনের বহু-বিস্তৃত বিজয়াভিযান ও অলৌকিক শক্তিপ্রকাশের দৃষ্টান্তকে নিজ পরিধির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে—ছোট বীজ বৃহৎ শাখাপ্রশাখাসমন্বিত বৃক্ষে প্রসারিত হইয়াছে। তা ছাড়া পূজাবিধির প্রথম প্রবর্তক ডোম পুরোহিতেরা নিরক্ষর ছিল বলিয়া কাব্যাকারে ধর্মমহিমা কীর্তন করিতে পারে নাই। ইহার জন্য উচ্চবর্ণের শিক্ষিত কবিগোষ্ঠীর সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং বহু শতাব্দীর পরে যখন কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা ধর্মমন্ত্রে দীক্ষিত ও ধর্মের নিষ্ঠাবান পূজকে রূপান্তরিত হইল, তখনই ধর্মরাজ হীনবর্ণের ভক্তের প্রকাশকুণ্ঠ ভক্তিসাধনা হইতে সারস্বত প্রসাদে স্ফুটবাক কবিসম্প্রদায়ের কাব্যের বিষয়রূপে আবির্ভূত হইলেন। ইহার

প্রাচীনতম বিষয়বস্তুর অত্যাধুনিক কাব্য-রূপতার হেতু

মধ্যে দীর্ঘকাল উচ্চবর্ণের কবিদের সামাজিক প্রতিকূলতা ও জাতিচ্যুতির ভয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সেইজন্য কবিগণ কাব্যরচনার প্রেরণা-স্বরূপ দেবতার স্বপ্ন-প্রত্যাদেশ কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কেহ কেহ বা ধর্মরাজের নিকট বিনীত অসম্মতিও জ্ঞাপন করিয়াছেন। ধর্ম যখন তাঁহার পূজাপ্রসারের অভিলাষী ছিলেন না, তখন তাঁহার এই ভক্ত কবিদের প্রতি স্বপ্নাদেশ অকারণ বলিয়াই মনে হয়। অনুমান হয় অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে ধর্মমঙ্গলে এই স্বপ্নাদেশ কিঞ্চিৎ বিসদৃশ ভাবেই গৃহীত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ধর্মঠাকুরের নিজ অভিলাষ-পূরণ নহে, তাঁহার উচ্চবর্ণের উদ্গাতাদের সামাজিক অপরাধক্ষালন।

ধর্মমঙ্গলের কবিগোষ্ঠীর বিস্তৃত পরিচয় ও কালনির্দেশ অনাবশ্যক। ইহার আদি কবি ময়ূর ভট্টের আবির্ভাবকাল ও রচনার নিদর্শন অজ্ঞাত। মাণিকরাম গাঙ্গুলির পরিচয়ও অনিশ্চয়ের কুহেলিকাবৃত—তবে মোটামুটি তাঁহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করা যাইতে পারে। রূপরামের রচনাকাল ১৫৯০ খৃঃ অঃ নির্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে আর এক প্রাচীনতর আদি রূপরামের অস্তিত্ব-কল্পনা দুরূহ হইয়া পড়ে। সীতারাম-দাসের পুঁথিগুলির অনুলিখনের সাল যদি মল্লাব্দ অনুসারে নির্দেশিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার ধর্মমঙ্গলের পুঁথিখানির জন্য একটা স্বতন্ত্র কালের মানদণ্ড-অবলম্বন নিরর্থক। সুতরাং ধর্মমঙ্গলখানির রচনাকালও মল্লাব্দ-অনুযায়ী ১৬০৮ খৃঃ অঃ হওয়াই উচিত।

ধর্মমঙ্গলের কবিগোষ্ঠী

ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যরচনা সমাপ্ত হয় ১৭১১ খৃঃ অঃ-এ। তিনিই একমাত্র কবি যিনি স্বপ্নাদেশের কোন উল্লেখ করেন নাই। ঘনরামের কাব্যে ভারতচন্দ্রের ন্যায় স্মরণীয় সুভাষিতাবলীর প্রচুর নিদর্শন মিলে। তাঁহার কাব্যের বীরত্বপূর্ণ বাতাবরণে শোকাকুলা নারীর চোখের জলও মুহূর্তে শুকাইয়া যায়। আশু কঠোর কর্তব্যের তাগিদ অতিপল্লবিত শোকবিস্তারকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনে। লাউসেনের বীরত্বের পার্শ্বে তাঁহার ভ্রাতা কর্পূরের ভীরুতা বৈপরীত্যের সার্থক সন্নিবেশে উভয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকেই চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। সহদেব (১৭৩৫), নরসিংহ (১৭৩৭), হৃদয়রাম (১৭৪৯), গোবিন্দরাম (১৭৬৬?) প্রভৃতি কবিপরম্পরা ধর্মমঙ্গল কাব্যপ্রবাহকে আধুনিক যুগের উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

ঘনরাম

(খ) মনসামঙ্গল

মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে ভাবপ্রেরণার দিক দিয়া কোনটি অগ্রবর্তী তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য হইলেও সাহিত্যিক আবির্ভাবের দিক দিয়া মনসামঙ্গলই প্রাচীনতর। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ উভয়ের আমরা যে বর্ণনা পাই, তাহাতে উভয়ই যে সুপ্রতিষ্ঠিত, বহুজনসেবিত, আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত ও ভোগোপচারবহুল পূজাবিধিরূপে চৈতন্যপূর্ব সমাজে বর্তমান ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হই। হিন্দুধর্মের মূল আদর্শ যাহাই হউক, এই দুইটি উপধর্ম যে লৌকিক উৎসবরূপে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। চৈতন্যদেবের পুরাণানুসারী, আদর্শবিশুদ্ধি ও ভাবৈশ্বর্যে মহনীয় প্রেমধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যে ইহারা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই ইহাদের দেশব্যাপী প্রভাবের নিদর্শন। ইহারা যে ছোটখাট কয়েকটি সম্প্রদায়ের সংকীর্ণগণ্ডীসীমিত, অনার্য ও অশিক্ষিত জনসংঘের সবল-কল্পনা-উদ্ভূত, আদিম স্তরের অনুষ্ঠানমাত্র ছিল না, পরন্তু পৌরাণিক ভক্তি-আবেগ ও রূপারোপপদ্ধতি আত্মসাৎ করিয়া বৃহত্তর হিন্দুসমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহা সুনিশ্চিত। হয়ত চৈতন্য-ধর্ম, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদের মধ্য দিয়া ক্রমপ্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক আদর্শ ও তন্ত্রশাস্ত্রের মাধ্যমে শক্তিপূজার বিশুদ্ধতর ভাবদীক্ষা প্রাচীনতর লৌকিক ধর্মগুলির বেগবান প্রবাহকে প্রতিরুদ্ধ না করিলে মনসা ও অনার্যচিন্তাপ্রসূতা উগ্রচণ্ডী দেবীই আজ পর্যন্ত আমাদের প্রধান দেবতারূপে পূজিতা হইতে থাকিতেন।

মনসামঙ্গল প্রাচীনতর রচনা

বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদিম রূপটি কোথায়ও অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয় নাই। আমরা পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশে প্রচলিত মনসামঙ্গলের ক্ষুদ্রতর ব্রতকথাস্বরূপ কাহিনী হইতে বাংলা কাব্যের আদিমরূপটি কল্পনা করিতে পারি। বাঙলা দেশের কবিদের হাতে লক্ষীন্দর-বেহুলার কেন্দ্র-কাহিনীর সঙ্গে দেবখণ্ডে শিব-পার্বতীর বিবাহ ও সংসারজীবন, মনসার জন্ম ও পার্বতীর সঙ্গে তাঁহার বিরোধ, তাঁহার নিঃসঙ্গ, আত্মীয়-পরিত্যক্ত জীবনের ব্যর্থতাবোধ ও পূজালোলুপতা ও নরখণ্ডে চাঁদের সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা ও ভাগ্যবিপর্যয়, লখাইএর সহিত বেহুলার বিবাহ ও বাসরঘরে সর্পদংশনে তাহার প্রাণত্যাগ, বেহুলার অসাধারণ মনোবল ও একাগ্র ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে তাহার

মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবন—এই সমস্ত বিষয়ের অতিপল্লবিত ও সময় সময় বাস্তবরসপূর্ণ বর্ণনা সংযুক্ত হইয়া কাব্যগুলি একটি বিরাট পুরাণের আকার ধারণ করিয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সমস্ত মনসামঙ্গলেই এই আখ্যানবস্তুর অভিন্নতা লক্ষিত হয়। এইরূপ ঘটনা-কাঠামোর সর্বস্বীকৃত গ্রহণ নিশ্চয়ই দুই-তিন শতাব্দীর অনুশীলন ও প্রচারের ফল। এই হিসাবে দেখা যাইবে যে মনসামঙ্গলের বীজ তুর্কী আক্রমণের পূর্ব হইতেই জাতীয় চেতনায় উপ্ত ছিল। তুর্কী বিজয়ের যদি কোন প্রভাব ইহার মধ্যে থাকে, তবে ইহা এই পূর্বাগত সমীকরণ-প্রক্রিয়াকে কিছুটা ত্বরান্বিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মনসামঙ্গলের আদিরূপ ও কাল

কানা হরিদত্ত জনশ্রুতিতে মনসামঙ্গলের আদি কবিরূপে প্রখ্যাপিত। ইহার সম্বন্ধে ইহার অব্যবহিত পরবর্তী কবি বিজয়গুপ্ত যে তুচ্ছতাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বাংলা-সাহিত্য-প্রচলিত অতীত-প্রশস্তি-রীতির একটি বিরল ব্যতিক্রম। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্য বিজয়গুপ্তের এই অশিষ্ট উক্তিকে বিদ্বেষপ্রসূত ও তথ্যতঃ অযথার্থ মনে করিয়াছেন। কিন্তু হরিদত্তের যে কয়েকটি রচনাংশ-উদ্ধৃতির উপর তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত, তাহা সংখ্যা ও পরিমাণে এত অল্প যে উহাদের সহায়তায় হরিদত্তের প্রশংসা বা অপ্রশংসা কোনটাই চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা যায় না। নিন্দা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা গৌণ, কিন্তু যাহা মুখ্যতঃ আমাদের কৌতূহলের উদ্রেক করে তাহা হইল বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই স্পষ্টভাষণের অসংকুচিত প্রয়োগ। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের আদি কবির সশ্রদ্ধ উল্লেখের সহিত তুলনায় হরিদত্তের প্রতি এই কটুভাষণ আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ায়।

আদি কবি হরিদত্ত

লক্ষ্য করিতে হইবে হরিদত্তের এই নিন্দা শুধুমাত্র কবিত্বশক্তি ও আখ্যানগ্রন্থনৈপুণ্যের অভাবের জন্য নহে। সমস্ত উপস্থাপনারীতি, ছন্দোপতন ও গীতের দিকে আপেক্ষিক অমনোযোগও এই নিন্দার কারণ। অনর্থক লাফালাফি ও অঙ্গভঙ্গীর বাহুল্য সমস্ত অভিনয়টিকে রুচিহীন করিয়া তোলে—ইহাও অভিযোগের অন্যতম হেতু। হরিদত্তের গীত যদি কালে লুপ্ত হইয়া থাকে তবে এই অবলুপ্তির জন্য অন্ততঃ একশত বৎসর লাগিয়াছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

হরিদত্তের পাঁচালীর ত্রুটি

হরিদত্তের রচনার প্রতি বিরুদ্ধ মন্তব্যের পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করিলে ইহাতে মঙ্গলকাব্য রচনা ও পরিবেশনের একটি নূতন রীতিপরিবর্তনই সূচিত হইতেছে

এরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত ঠেকে। মনে হয় হরিদত্ত মঙ্গলকাব্যের যে আদিমরূপ—ইহার ব্রতকথা ও পাঁচালীর ন্যায় সংক্ষিপ্ত আকার ও শিথিল অবয়ব-বিন্যাস—তাহারই প্রবর্তক ছিলেন। ইহার কাব্যমূল্য, বর্ণনাপদ্ধতি ও গীতরূপায়ণ খুব নিকৃষ্ট স্তরেরই ছিল ও ইহা নানাবিধ স্থূল অঙ্গভঙ্গী ও বৈচিত্র্যহীন স্বরপ্রয়োগে আবৃত্তির দ্বারা প্রাকৃত জনসাধারণের কথঞ্চিৎ মনোরঞ্জন করিত। পরবর্তী যুগের নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্ত মঙ্গলকাব্যের বিষয়-সন্নিবেশ ও রচনাশৈলী সম্বন্ধে এক উন্নততর আদর্শ অবলম্বন করিয়া উহাকে উচ্চশ্রেণীর কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। সেইজন্যই মনে হয় হরিদত্তের সঙ্গে তাঁহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশী।

হরিদত্তের কাব্যের সম্ভাব্য রূপ

নারায়ণ দেবের উদ্ভবকাল ও বাসস্থান সম্বন্ধে যে তুমুল বাদানুবাদের অবতারণা হইয়াছে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার কাব্যের রস-আস্বাদনের জন্য তাহার সম্যক্ আলোচনা অপরিহার্য নহে। তাঁহাকে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন মারাত্মক ভুলের মধ্যে পড়িতে হইবে না। তিনি এবং তাঁহার প্রায় সমকালীন কবি বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গলের বিভিন্ন চরিত্র—পরিকল্পনা, নানা আখ্যান ও পুরাণকাহিনীর সমাবেশ, উহার সমাজচিত্র, নীতিগত মান, অধ্যাত্ম ভাবনা ও জীবনদর্শন—এই সমস্ত উপাদানের যথাযথ বিন্যাসে উহার একটি সামগ্রিক রূপ স্থির করেন ও ইহার বহুশতাব্দীব্যাপী অগ্রগতি ও আত্মবিস্তারের একটি সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করেন। ইঁহারা ইঁহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে কতটুকু পাইয়াছিলেন ও নিজেরা কি নূতন সংযোজনা করিয়াছেন তাহা নিশ্চিত করিয়া জানা যাইবে না। তবে তাঁহারা যে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত মনসামঙ্গলের নবরূপের স্রষ্টা তাহা নিশ্চিত।

নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্ত

বিজয় গুপ্তের আত্মপরিচয়ে সুলতান হুসেন শাহের নামোল্লেখ থাকায় তাঁহার রচনাকাল-নির্দেশক ইঙ্গিতের যথাযথ ব্যাখ্যাকে ১৪৯৪ খৃঃ অঃ-র সহিত সমার্থবাচক ধরা সুসঙ্গত। নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের মধ্যে তুলনায় প্রথমোক্তকে করুণরস-বর্ণনায় ও পুরাণ-মহিমা-প্রতিফলনে ও দ্বিতীয়কে বাস্তব চিত্রাঙ্কন ও সময় সময় স্থূল ও অমার্জিত পরিহাস-রসিকতায় শ্রেষ্ঠপদবাচ্য করা যায়। নারায়ণ দেব ভাবপ্রবণ ও আদর্শনিষ্ঠ, পক্ষান্তরে বিজয় গুপ্ত সূক্ষ্মতর শিল্পবোধসমন্বিত ও সমাজসচেতন। বিজয় গুপ্ত চাঁদ সদাগরকে মনসার নিকট নতি স্বীকার করাইয়া তাঁহার চরিত্র-মহিমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন এইরূপ অভিযোগের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। কিন্তু

আমরা আধুনিক আদর্শ-অনুযায়ী চাঁদের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব-গৌরব লইয়া যতটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি, মধ্যযুগের ভক্তিসর্বস্ব দেববাদনির্ভর কবিগোষ্ঠী চাঁদের স্বাধীনচিত্ততায় সেরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বরং যে মানুষ দেবতার সহিত অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইত তাহাকে হঠকারী গোঁয়ার-গোবিন্দ রূপেই তাঁহারা দেখিতেন। সেই জন্যই মনসার সহিত বিবাদে চাঁদকে তাঁহারা নানা বিসদৃশ দুরবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন ও মোটের উপর তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিয়াই দেখাইয়াছেন। সেই জন্য বিজয় গুপ্ত চাঁদের চরিত্রকে কলঙ্কিত করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। সে যুগে পারিবারিক মমতা ও দেবভক্তি ব্যক্তি-চরিত্রে দৃপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ অপেক্ষা শ্লাঘ্যতর গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং আমরা চাঁদের যে আচরণকে অধ:পতনের চিহ্নরূপে গ্রহণ করি, তৎকালীন কবিগোষ্ঠীর চক্ষে তাহাই তাহার সুস্থ জীবনবোধের নিদর্শনরূপে গণ্য হইত।

নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের তুলনা

দ্বিজ বংশীদাস মনসামঙ্গলের বিবর্তনের মধ্যস্তরের কবি বলিয়া অনুমিত হইতে পারেন। তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য ইহার বৈষ্ণবধর্মপ্রভাবিত সমন্বয়মূলক মনোভাব। চাঁদ গোড়াতে চণ্ডী ও মনসা এই উভয় দেবতার প্রতি সমদর্শী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি এই পারিবারিক কলহে জড়িত হইয়া পড়িতে বাধ্য হন। অবশেষে শিবের মধ্যবর্তিতায় এই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। সুতরাং ইহার পরিকল্পনা কতকটা মনসামঙ্গলের মূলধারা-বহির্ভূত। মনসার লৌকিক-সংস্কারাচ্ছন্ন মহিমাপ্রচারের গ্রন্থে বংশীদাস এমন একটি গম্ভীর আন্তরিকতা ও উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রবর্তন করিয়াছেন, যাহার ফলে এই মনসামঙ্গলগাথাটি ময়মনসিংহের জনজীবনের আনন্দ-উৎসব ও স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠানের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

বংশীদাস

মনসামঙ্গলের পরিণতিস্তরের নিদর্শন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল। তাঁহার আত্মপরিচয়ে বারা খাঁ, বিষ্ণুদাস, ভারামল্ল প্রভৃতি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে তাঁহার গ্রন্থের রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। তাঁহার কবিত্বশক্তি যেমন উচ্চাঙ্গের, তাঁহার ভাষাও সেই পরিমাণে মর্যাদাময় ও গ্রাম্যতা-দোষমুক্ত।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

এই কাব্যের অন্তিম স্তরে আমরা জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল পাই। ইহার

রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশের প্রথম বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডঃ আশুতোষ দাস ও পণ্ডিত সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ এই দুই জনের যুগ্ম সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে। জগজ্জীবনের আখ্যান-গ্রন্থন ও কবিত্ব উভয়ই প্রশংসনীয়। মনে হয় যে মনসামঙ্গলের কাহিনী ও দেবতত্ত্বের সহিত দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে ইহার অন্তিম পর্যায়ের কবিগোষ্ঠী ইহার ঘটনাবিন্যাস ও জীবন-রূপায়ণের একটি সহজ সুসঙ্গতি অর্জন করিয়াছিলেন। কাহিনীর উদ্ভটত্ব তখন অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে, দেবরোষপীড়িত মানুষের হৃদয়ার্তির ছন্দ অনেকটা সহজ ও অতিরঞ্জনমুক্ত হইয়াছে, বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের মিলন প্রায় সম্ভাব্য সীমায় পৌঁছিয়াছে ও কবিদের কাব্যরচনা একটি সুনির্দিষ্ট প্রথার অনুসরণে গতির স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। জগজ্জীবনের কাব্যে এইরূপ সুষ্ঠু ও সু-বলয়িত পরিণতির নিদর্শন দেখা যায়। চাঁদের দৃঢ় সংকল্পও শেষ পর্যন্ত যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ আছে। সে শিবের আজ্ঞা লইয়া ও বেহুলার স্নেহপূর্ণ আবদার রক্ষা করিতে বাম হস্তে মনসার পূজা করিয়াছে ও সাষ্টাঙ্গ প্রণতির পরিবর্তে তাহার প্রতি বদ্ধাঞ্জলি নমস্কার নিবেদন করিয়াছে। জগজ্জীবনের পরিকল্পনায় একমাত্র ত্রুটি হইতেছে লখীন্দরকে কামুকরূপে অঙ্কন ও মাতুলানীর সহিত তাহার গর্হিত ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক-বর্ণনা। মনে হয় যে লখীন্দরের পিতা-মাতা তাহার প্রাণরক্ষার জন্য তাহার বিবাহ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এই সিদ্ধান্ত-পরিবর্তনের কারণরূপে লখীন্দরের চরিত্রে উৎকট কামায়ন-প্রবৃত্তি ও বিবাহলোলুপতা দেখান হইয়াছে।

জগজ্জীবন ঘোষাল

মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবির মধ্যে ষষ্ঠীবর দত্ত (যাঁহার উপর ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন 'সেন' উপাধি ভ্রমবশতঃ ন্যস্ত করিয়াছিলেন), জীবন মৈত্র (১৭৪৪ খৃঃ অঃ), বিষ্ণুপাল, তন্ত্রবিভূতি প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। ইঁহারা মনসামঙ্গলের অবসানযুগের কবি।

সর্বশেষে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, মনসামঙ্গল কাব্যধারার পাঠের ফলে বাঙালীর জীবনচেতনায় কিরূপ চূড়ান্ত ফলশ্রুতির উপলব্ধি ঘটিয়াছিল? অবশ্য সর্পভীতি-নিবারণে ইহার অমোঘ শক্তিতে বিশ্বাস বাঙালী সমাজজীবনের একটা ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটাইতে সহায়তা করিয়াছে। প্রাকৃত জনসাধারণের নিকট ইহাই মনসামঙ্গলের চরম আবেদন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মচেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নিকট ইহার একটা উচ্চতর আবেদনও ছিল। মানুষের সঙ্গে দেবতার

সম্পর্কের মধ্যে যে একটা অনিশ্চিত, শঙ্কা-সঙ্কুল সীমান্ত-প্রদেশ ছিল, মনসা সেই রাজ্যেরই অধিবাসিনী। তাহার প্রতি আমাদের ভয় ভক্তিতে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয় নাই। ন্যায়নীতিশাসিত শাশ্বত ধর্ম-প্রত্যয়ের অন্তরাল হইতে আকস্মিক দৈবনিপীড়নের যে মূঢ় বিহ্বলতা আমাদের জীবনে মরীচিকার বিভ্রান্তি আঁকিয়া যায়, সর্পদেবীর তির্যক গতি, সাংঘাতিক ছোবল ও দ্রুত অন্তর্ধান তাহারই রূপক। বাঙালী মনসাপূজায় সাপের ছদ্মবেশ-ধারিনী এই রহস্যময়ী, ন্যায়-অন্যায়ের ঊর্ধ্বস্থিতা নিয়তিরই রোষোপশমের চেষ্টা করিয়াছে। সাধারণতঃ ধর্মসাধনায় একটি সুনিশ্চিত প্রাপ্তির প্রসন্নতা জাগে। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, পুরাণের ভক্তিবিভোর আত্মনিবেদন, রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার বেদনাময় আকৃতির মধ্যে অন্তর্লীন সূক্ষ্ম আনন্দ-প্রত্যয়, হারানোর মধ্যে পাওয়ার পরম আশ্বাস, শাক্ত পদাবলীতে সমস্ত খেদ-বঞ্চনার মধ্যে মাতৃকরুণানির্ভয় অভয়-বোধ—এ সমস্তই ধর্মের চিত্তপ্রশান্তিবিধানশক্তির নিদর্শন। মনসামঙ্গলের কবিগোষ্ঠী এরূপ কোন নিটোল তৃপ্তি দিতে পারেন নাই ; এমন কি কামনাপূরণের নিম্নতর নিশ্চিন্ততাও এখানে অনুপস্থিত। মনসার পূজায় বড় জোর বিপদ এড়ান যায় ; নিশ্ছিদ্র ও ক্রমবর্ধমান সম্পদও ইহার ফলরূপে প্রতিশ্রুত হয় নাই। এমনকি রূপকথার অবাস্তব সুখভোগও ইহার অনায়ত্ত। সমস্ত বিপদোত্তীর্ণ নায়ক-নায়িকা যে বাকী জীবনটা অবিমিশ্র সুখ-স্বস্তিতে কাটাইবে সেরূপ আশ্বাসও এখানে অনুপস্থিত।

মনসামঙ্গলের ফলশ্রুতি

সমগ্র মনসামঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করিয়া দৈবাহত মানবজীবনের প্রতি একটা অনুকম্পা জাগে। দেবরোষের অতর্কিত আবির্ভাব, উহার অতন্দ্র, ক্ষণে ক্ষণে নব নব পীড়নাস্ত্ররূপে দৃশ্যমান প্রতিহিংসা-পদ্ধতি, জালবদ্ধ মানুষের মুক্তির জন্য ব্যর্থ আকুতি, সর্বনাশের অতল গহ্বরমুখে দাঁড়াইয়া তাহার ক্ষণিক, অস্বস্তিকণ্টকিত আনন্দচয়ন, শেষ পর্যন্ত এক অজ্ঞাত ভাগ্যের প্রসাদভিক্ষার উদ্দেশ্যে নানাবিভীষিকাময় নিরুদ্দেশযাত্রা, সিদ্ধি-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী হইতে চিরবিদায়ের আহ্বান—এই সমস্ত মিলিয়া মানবজীবনকে এক করুণ অসহায় দৈবক্রীড়নকরূপেই প্রতিপন্ন করে। চাঁদের নিষ্ফল পুরুষকার, সনকার পুনঃ পুনঃ শোকদীর্ণ মাতৃহৃদয়ের অসহ্য বেদনা, লখীন্দর-বেহুলার অতৃপ্ত জীবনাকূতি, ও বেহুলার অনির্দেশ্য অদৃষ্টনির্ভর নৌকাযাত্রা মানবজীবনের যথার্থ প্রতিরূপ। ক্রূরকুটিল, দৈবশাসন-নিয়ন্ত্রিত জীবনে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্যের জন্য উদ্ভট ও বীভৎস রস সহজেই

মনসামঙ্গলের মানবিক আবেদন

পুঞ্জীভূত হয়। দেবলীলার বিসদৃশ অভিনয়ের পটভূমিকায় নারীদের পতিনিন্দা ও মাছমারা গোদার পারিবারিক আবেষ্টনের বীভৎসতা, চাঁদের হাস্যকর দুরবস্থা, সনকার অতিশয়িত শোকোচ্ছ্বাস ও লখীন্দরের কামোন্মত্ততা যেন জীবনের স্বভাব-ছন্দরূপে প্রতিভাত হয়। কর্কট-দংশনে নলরাজার শারীরিক বিরূপতার মহাভারতোক্ত কাহিনীর ন্যায় এখানে দৈবদষ্ট মানবজীবনও তেমনি সহজ সুষমা ও সঙ্গতি হারাইয়াছে। এই আকস্মিকতার সর্পদংশন-ক্লিষ্ট, পরিণাম-রমণীয়তাহীন, বিষনীল জীবনযাত্রা মনসামঙ্গলের দেবারতিদীপ্ত মন্দিরাঙ্গনের আলোকোৎসবকে নিষ্প্রভ করিয়াছে। দেবতা-মানবের যে মিলন-বাসর ভক্তি-প্রীতি-চরিতার্থতার ঘন প্রলেপে এক নীরন্ধ্র দেউল নির্মাণ করে তাহারই মধ্যে সংশয়ের একটি অলক্ষিত ছিদ্র দিয়া মনসা-প্রেরিত কালনাগিনীর ন্যায় একটি প্রতিকারহীন অভিশাপ প্রবেশ করিয়াছে। মনসামঙ্গলের সমস্ত জোড়াতালা-দেওয়া সমাধান-প্রয়াসের মধ্যে এই দুশ্চিকিৎস্য অসঙ্গতিই আমাদিগকে জীবনের অনির্ণেয় রহস্যময়তার প্রতি সচেতন করিয়া তোলে।

(গ) চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গলের বৈশিষ্ট্য উহার দ্বি-কোটিক, পরস্পর-অসংপৃক্ত আখ্যানভাগ, উহার দেবতা-মানুষের অপেক্ষাকৃত মৃদু সংঘাত ও অনায়াস মিলন, উহার দেবী-প্রকৃতির আর্যধর্মের মাতৃশক্তিতে ত্বরিত রূপান্তর ও বহুমুখী বিস্তার, উহার শিথিল দেবশাসনের অবকাশে সমাজ-চেতনার স্বাধীন স্ফুরণ, সর্বোপরি দেবমহিমাবর্ণনার গতানুগতিকতার মধ্যে প্রতিভার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। বন্যপশুকুলের রক্ষয়িত্রী হইতে পশুপীড়ক ব্যাধের সম্পদদাত্রী ও সেখান হইতে ধনী বণিক পরিবারের মেয়েমহলের পূজাপাত্রী—দেবীর এই ক্রমবিবর্তনের মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্যাধ ও বণিক কাহিনীদ্বয় কেমন করিয়া একসূত্রে গ্রথিত হইল, দেবীর এই সামাজিক উন্নয়ন কেমন করিয়া সম্ভব হইল, ব্যাধসমাজে যে দেবী নির্বিবাদে গৃহীতা হইয়াছিলেন বণিকসমাজে তিনি স্ত্রীদেবতা বলিয়া কেন অবহেলিতা ও প্রত্যাখ্যাতা হইলেন এই সব প্রশ্নের কোন উত্তর মিলে না। কালকেতু-উপাখ্যানে যিনি স্বর্ণগোধিকা, ধনপতি-আখ্যানে তিনি গজলক্ষ্মীর ছদ্মবেশধারিনী সামুদ্রিক মরীচিকায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। কলিঙ্গরাজের রাজ্যে যিনি প্লাবন আনিয়াছিলেন, তিনি কেবল স্বপ্নাদেশ দ্বারা যেমন কালকেতু তেমনি ধনপতি-শ্রীমন্তের কারামুক্তি সাধন করিয়াছেন। যেমন কালকেতুর নগরপ্রতিষ্ঠায়

তেমনি ধনপতির পারিবারিক দ্বন্দ্বমীমাংসায় তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহার নিজস্ব দেবমহিমার গণ্ডীতে তিনি স্থির আসনের আশ্বাস পাইলেই ভক্তের অন্যান্য ব্যাপারে স্বাভাবিক পরিণতির পথে তিনি কোন বাধা দেন না। তাঁহার শাস্তির মধ্যে যেমন হিংস্র আতিশয্য নাই, তাঁহার কৃপার মধ্যেও সেইরূপ অপরিমিত দাক্ষিণ্যের অভাব। তাঁহার ক্রোধ প্রভাত-মেঘের ন্যায় ক্ষণিক বিপর্যয় ঘনাইয়া তোলে; তাঁহার প্রসাদও সেই স্বল্পবর্ষণ মেঘকে গলাইয়া আবার সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ-নীলিমাকে অবারিত করে।

চণ্ডীর বিচিত্ররূপ ও রূপান্তর

দেবতার অনুচিত প্রভাবমুক্ত এই কাব্যজগতে সেইজন্য সমাজ-জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত লীলা, উহার মৃদুবায়ুচঞ্চল, নৃত্যশীল তরঙ্গভঙ্গ, উহার বঙ্কিম কটাক্ষের দ্যুতি ও তির্যক পরিহাসের ঝিলিক। এমন কি এই স্নিগ্ধ পরিহাসের আওতা হইতে স্বয়ং দেবীও বাদ যান নাই। দেবতা সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব যে ভীতি-সম্ভ্রম, এমন কি ভক্তির আতিশয্য হইতে মুক্ত হইয়া সহজ হইতে আরম্ভ হইয়াছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই তাহার প্রমাণ। দেবতা মানুষের জীবনের উপর ছায়াপাত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া দাঁড়ান নাই। ধর্ম ও মনসামঙ্গলে সমাজ আছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন পারিবারিক সংস্থায় বিভক্তরূপে—ইহাদের মধ্যে সমাজের স্থূল সত্তা আছে, সূক্ষ্ম প্রাণরস নাই, উহার কিছুটা বস্তুপরিচয় আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দ বিকাশের ছন্দ নাই। চরিত্রের দিক দিয়া ধর্মমঙ্গলের লাউসেন, ইছাই ঘোষ, কলিঙ্গা, কানড়া, মহামদ, কালু, লখাই প্রভৃতি কেহ বা অতিমানবিক, কেহ কেহ বা একমুখীন কর্তব্যনিষ্ঠা বা দুষ্প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর, সনকা, লখীন্দর, বেহুলা, মাছমারা গোদা, পতিনিন্দাকারিনী পুরনারীগণ—সবই যেন এক একটি কঠিন প্রথাগত সমস্যার বন্ধনে আড়ষ্ট বা উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় আস্ফালনশীল। সহজ, সমস্যামুক্ত প্রাণলীলা ইহাদের কাহারও মধ্যে দেখা যায় না।

চণ্ডীমঙ্গলে মানবিকতা

চণ্ডীমঙ্গলের সমাজচিত্র ও চরিত্র-কল্পনায় বহিরবয়ব ও অভ্যাসসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তরচেতনা ও প্রাণলীলা দ্যোতনারও পরিচয় আছে। সমাজ এখানে একটি বিশিষ্ট সত্তায় সংহত ও একটি অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়ের আধাররূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কালকেতু ও তাহার পিতা-মাতার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার চারিদিকে রীতি-নীতি-আচারে দৃঢ়বদ্ধ, কেন্দ্রীভূত জীবনোদ্দেশ্যে স্থিরলক্ষ্য, অস্তিত্বের আনন্দে ও গোষ্ঠী-সংহতিবোধে উচ্ছল একটি বৃহত্তর ব্যাধসমাজের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গুজরাট

চণ্ডীমঙ্গলে জীবন্ত সমাজ

সহরে নবনগর-পত্তনের বর্ণনায় আমরা বৃত্তিবিন্যস্ত, বিভিন্ন জাতির কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, ব্যাপকতর সংশ্লেষ-বিধৃত এক নূতন সমাজের প্রাণস্পন্দন অনুভব করি। চাঁদ সদাগরের বেণে সমাজের কথা শুনি, কিন্তু উহার সক্রিয়তার বিশেষ কোন নিদর্শন পাই না। কিন্তু ধনপতির স্বজাতীয়েরা মোটেই নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন নয়—তাহারা সমাজবিধিরক্ষার জন্য অত্যুৎসাহী, কুৎসায় মুখর, দণ্ডে নির্মম, সন্দেহে তীক্ষ্ণ। এখানে সমাজশাসন দেবশাসনের উত্তরাধিকারীরূপে ক্ষুদ্রতর মানুষ ও পরিবারের নিয়ন্ত্রণভার নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে।

চরিত্র-পরিকল্পনায় চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃপ্রমাণিত। মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত, দুর্বলা দাসী—ইহারা আপন আপন প্রাণদীপ্তিতে স্বয়ং-সমুজ্জল। ইহারা দেবতার ছাড়পত্র বা কোন নীতির অনুশাসন হাতে লইয়া সংসারে প্রবেশ করে নাই—বাঁচিবার জন্মগত অধিকার, স্ব-ইচ্ছার স্বাধীন প্রেরণা, অবিমিশ্র জীবনানন্দ লইয়াই ইহারা আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা কোন উদ্দেশ্যের বাহন নহে, কোন বলিষ্ঠতর শক্তির করদ প্রজা নহে, কোন দৈব ঘটনার পুচ্ছতাড়িত অসহায় ক্রীড়নক নহে—অসংবরণীয় প্রাণবেগচাঞ্চল্যেরই অনিবার্য, অকারণ প্রকাশ। ইহারা আখ্যানের পিছন দরজা দিয়া আসে নাই, আসিয়াছে জীবনসমারোহের সিংহদ্বার দিয়া। ইহারা একতাল কাদা নয়, এক কণা বহ্নিস্ফুলিঙ্গ, যাহাকে নিভান যায় না বা আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করা যায় না। কালকেতু ও ফুল্লরা জাতিতে অন্ত্যজ ব্যাধ হইলেও প্রাণৈশ্বর্যে শাশ্বত অভিজাতবংশীয়। তাহারা সাহিত্যের প্রথানুযায়ী নায়ক-নায়িকা নয়, তাহাদের প্রবল জীবননিষ্ঠা, জীবনরস-উপভোগের একান্ত স্পৃহাই তাহাদের জন্য এক অলঙ্কারশাস্ত্রবহির্ভূত রাজাসন রচনা করিয়াছে। আশ্চর্যের কথা এই যে যখন তাহারা চণ্ডীর অনুগ্রহে সত্যিকার রাজা-রানীর পদে উন্নীত হইয়াছে তখন তাহাদের নৈসর্গিক রাজদীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়াছে। তবু কালু যুদ্ধে পরাজয়ের পর ধান্যগৃহে লুকাইয়া নিজ অনির্বাণ প্রাণমহিমার শেষ ঝলক বিকীর্ণ করিয়াছে। মাংসের পশরাহীন ও বারমাসী দুঃখচক্রের সহিত অসংশ্লিষ্ট রানী ফুল্লরাকে আমরা চিনিতে পারি না। শ্রীমন্তের সহিত সিংহল রাজকন্যা সুশীলার বিবাহ গতানুগতিক রোমান্স-অনুসারী। কিন্তু ধনপতি খুল্লনার প্রতি যে প্রেমনিবেদন করিয়াছে তাহা তাহার প্রাণের উদ্বৃত্ত ভোগলালসা ও রূপাসক্তিরই প্রত্যক্ষ ফল। পায়রা-উদ্ধারের ছলে হৃদয়-অধিকারের দাবী এই নূতন প্রাণোচ্ছলতা ও অধিকারবোধ হইতে উদ্ভূত। লহনা ও খুল্লনার নির্যাতন-লাঞ্ছিত

চণ্ডীমঙ্গলে প্রাণবন্ত চরিত্র

সপত্নীবিদ্বেষটি আমাদের সাধারণ পারিবারিক জীবনের মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। খুল্লনার উপর অত্যাচার ও তাহার সতীত্ব-পরীক্ষা পৌরাণিক আতিশয্য-প্রভাবিত। তথাপি গঙ্গা-দুর্গার সপত্নী-কোন্দলের সহিত তুলনায় লহনা-খুল্লনার ঈর্ষ্যা-বিকৃত সম্পর্কটি অধিকতর বাস্তবধর্মী।

কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য এই ধারায় মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র এই দুই অসাধারণ কবিপ্রতিভার আকস্মিক আবির্ভাব। দৈবপ্রভাবাবিষ্ট জনকল্পনার সমুদ্রতীরে বিকীর্ণ শত শত দ্রুত-উদ্ভাবিত ও যুগে যুগে বিবর্তিত আখ্যান-শুক্তিমালার মধ্যে যে কেমন করিয়া এই দীপ্তিসমুজ্জ্বল মৌক্তিকযুগলের জন্ম হইল তাহা প্রতিভা-রহস্যের একটি অনুদ্‌ঘাটিত সত্য। হাজার কবির হস্তক্ষেপজীর্ণ, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্ধ সংস্কারে মলিন, চিরতরে নির্ধারিত আখ্যান-কাঠামোর মধ্যে এই দুইজন কবি কেমন করিয়া প্রচুর জীবনরসসঞ্চয়ের অবকাশ পাইলেন, জীবন্ত চরিত্র-সংযোজনার প্রেরণা পাইলেন, অপূর্ব সরস বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে জীবনের তির্যক প্রকাশ পরিস্ফুট করিলেন তাহা সত্যই এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। চণ্ডীদেবী এক অনার্য ব্যাধনন্দনকে কৃপা করিয়াই চণ্ডীমঙ্গলের কবিদিগকে এক অপরিচিত বিষয়ের সন্ধান দিয়াছেন। তিনি অরণ্যপশুবৃন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মানুষের অন্তরবেদনা-প্রকাশের এক নূতন রূপকপদ্ধতি কবিদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। নূতন নগরপ্রতিষ্ঠার ব্যপদেশে তৎকালীন বাঙলা দেশে নূতন স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী নবসমাজ-সংগঠনের উপলক্ষ্যটি যুগের দাক্ষিণ্য বলিয়াই মনে হয় ও সমাজসচেতন কবিগোষ্ঠী এই দাক্ষিণ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপে নূতন উপাদানপুষ্ট কবি-প্রতিভা আবার এই উপাদানকেই অবলম্বন করিয়া ইহাদের মধ্যে জীবনরসস্ফুরণ ও শিল্পকলা-মণ্ডনের শাশ্বত সৌন্দর্যরূপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গল-রচনায় মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিযুগল

চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোন কবিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। আদি কবি বলিয়া খ্যাত মাণিক দত্তের যে একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার অনুলিপিকাল ১৭৮৫ খৃঃ অঃ। ইহা মাণিক দত্তের মৌলিক রচনা কি না তাহা খুবই সন্দেহের বিষয়। পুঁথিটিতে যে ছড়াজাতীয় রচনার নিদর্শন মিলে তাহাই বোধ হয় চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর আদিম অমার্জিত রূপ। কবি বোধহয় মালদহের লোক ছিলেন, কেননা তাঁহার কাব্যে ঐ জেলার নদী, নালা, বিল, সহর, গ্রাম ও মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি

দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম—চণ্ডীমঙ্গলের দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি—কালের দিক দিয়া অত্যন্ত সন্নিহিত। দ্বিজ মাধবের কাব্যরচনার কাল ১৫৭৯ খৃঃ অঃ ও মুকুন্দরামের কাব্যরচনা-সমাপ্তি নানা মতবিরোধ সত্ত্বেও ষোড়শ শতকের শেষ দশকে হইয়াছিল এই অনুমানই সঙ্গত মনে হয়। এত অল্পকালব্যবধানে অগ্রবর্তী কবি যে পরবর্তীকে প্রভাবিত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্ভব ঠেকে না।

চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি-যুগল

দ্বিজ মাধবের হাতে চণ্ডীমঙ্গল-আখ্যান সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। কালকেতু ও ধনপতি উভয় আখ্যানই ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে। কালকেতুকে কেন্দ্র করিয়া ব্যাধসমাজের রীতি-নীতি ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দ্বিজ মাধবের কাব্যে সরস বস্তুনিষ্ঠার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তবে মুকুন্দরামের সহিত তুলনায় বর্ণনা কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত ও বস্তুভারাক্রান্ত মনে হয়। মুকুন্দরামের মত এই কাব্যেও কালকেতু-প্রপীড়িত বন্য-পশুদের নিকট কাতর প্রার্থনার মধ্যে মানুষের দুঃখদুর্দশার রূপকারোপ অনুভূত হয়। তবে মুকুন্দরামের কাব্যে তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের স্পর্শ যেমন একটি সার্বভৌম রসসঞ্চারের হেতু হইয়াছে, নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ যেমন অপূর্ব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ও জীবনরসিক চিত্তের মধ্যবর্তিতায় সূক্ষ্ম রসানুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, দ্বিজ মাধবের কাব্যে তথ্যের রসরূপে পরিণতি ততটা শিল্পগুণান্বিত ও ব্যঞ্জনাগর্ভ হয় নাই।

দ্বিজ মাধব

দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম উভয়েরই কাব্য বৈষ্ণবভাবাদর্শ-প্রভাবিত। তবে মুকুন্দরামে ইহা দেবীর রূপবর্ণনা ও তাঁহার চরিত্রে স্নিগ্ধ মহিমা-আরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বিজ মাধব এই সীমা ছাড়াইয়া আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি আখ্যানের বিভিন্ন অংশের ভাবানুযায়ী বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে ছোট ছোট গীতিকবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—উহাদিগকে তিনি 'বিষ্ণুপদ' নাম দিয়াছেন। এই যুগে বৈষ্ণব ভাবধারা জনচিত্তে এরূপ সার্বভৌম প্রসার লাভ করিয়াছে যে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবপরিমণ্ডলে বিচরণশীল মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া উহাকে কোমলরসপ্রধান করিয়াছে। মুকুন্দরাম সমগ্র মঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি চণ্ডীমঙ্গলের বিষয়টি প্রায় যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহার মধ্যে এরূপ পরিণত বস্তুরস ও জীবনমুখীনতা প্রবর্তন করিয়াছেন যাহা সে যুগে ত অসাধারণ বটেই, পরবর্তীকালের মানবপ্রীতিরও পূর্বাভাসরূপে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁহার হাতে সর্বপ্রথম কাব্যে কবির মেজাজ, তাঁহার প্রসন্ন জীবন-স্বীকৃতি প্রতিফলিত হইয়াছে। এমন কি তাঁহার ব্যক্তিগত তিক্ত ও

মুকুন্দরাম

দুঃখময় জীবন-অভিজ্ঞতা এক পরম আস্বাদনীয় আনন্দলীলায় পরিণত হইয়াছে। তাঁহার দুঃখ পশু-সমাজে আরোপিত হইয়া, পশুদের মুখে এক বিসদৃশ পরিবেশে স্থানান্তরিত হইয়া এক অপরূপ অসঙ্গতির কৌতুকহাস্য সৃষ্টি করিয়াছে। সুখ ও দুঃখ, হাসি ও কান্না, লাঞ্ছনা ও উপভোগ এক অপূর্ব মিশ্রণে একীভূত হইয়া রসপরিণতি লাভ করিয়াছে। মুকুন্দরাম এই বিরল সমন্বয়শক্তির আধকারী ছিলেন। কলিঙ্গরাজ্যপ্লাবনের উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় নদনদী-সম্মেলনের বিবরণ যেমন কাব্যগুণসমৃদ্ধ, তেমনি কল্পনার সরসতায় উপভোগ্য। মুরারি শীল তাঁহার মৌলিক সৃষ্টি—তৎকালীন সমাজজীবনের ফাঁকি, মিষ্ট কথার আবরণে ঠকাইবার কৌশল, সমাজমনের সুড়ঙ্গপথ-সঞ্চরণশীলতা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে উপভোগ্য রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। ধনপতি-অংশ অপেক্ষা কালকেতু-অংশে তাঁহার মৌলিকতা অধিকতর সমুজ্জ্বল। হরজটাবিহারিণী গঙ্গার নিষ্ক্রমণ-পথ-প্রাপ্তি ও সমতলভূমিতে স্বচ্ছন্দ প্রবাহের ন্যায় দৈবসম্পর্কের চক্রাবর্তনক্ষুব্ধ বাংলা কাব্য হঠাৎ কেমন করিয়া মানবজীবনের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিক্ষেপের কৌশল আয়ত্ত করিয়া বিচিত্রপথগামিনী হইল !

ডঃ আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' আমাদের একটি অজ্ঞাতপূর্ব চণ্ডীমঙ্গল-ধারার কাব্যের সন্ধান দিয়াছে। গ্রন্থখানির রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। ইহার নগরপ্রতিষ্ঠার বর্ণনার মধ্যে 'ফেরাঙ্গি' নামে একটি সদ্যো-আগত পাশ্চাত্ত্য জাতির উল্লেখ থাকায় ইহার রচনাকালকে পোর্টুগিজ জল-দস্যুদের উপদ্রবের পরবর্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। 'বিষ্ণুপদের' বহুল ও সময় সময় মূল ঘটনার সহিত অসংপৃক্ত প্রয়োগে দ্বিজ রামদেব যেন দ্বিজ মাধব-প্রবর্তিত ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দের ও ভাষারীতির বহুল ব্যবহার তাঁহার আঞ্চলিকতার পরিচয় বহন করে।

অভয়ামঙ্গল

চণ্ডীদেবী যে পরিমাণে আর্যধর্ম-প্রভাবিতা হইতেছিলেন ঠিক সেই পরিমাণে তাঁহার সংজ্ঞাও হিন্দু দেবীর গুণানুযায়ী বৈচিত্র্য আহরণ করিতেছিল। চণ্ডী অভয়া, সারদা প্রভৃতি নামে পরিচিত হইতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ভারতচন্দ্রের যুগে পৌঁছিয়া তিনি অত্যন্ত ঘরোয়া দেবী অন্নদা নাম পরিগ্রহ করেন। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যধারার অন্তর্ভুক্ত কি না সে বিষয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার আলোচনা এক স্বতন্ত্র পরবর্তী অধ্যায়ে করা যাইবে।

চণ্ডীর নানা নাম

(ঘ) শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যধারার অনুকৃতিতে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হইতে আরম্ভ হয়। শিব অবশ্য সুপ্রাচীন দেবতা; তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া উৎসাহ জাগিবার কোন উপলক্ষ্য সৃষ্ট হয় নাই। তথাপি শিব বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটি অপরিহার্য যোগসূত্ররূপে উপস্থিত আছেন। হর-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবন ও মান-অভিমান-খণ্ডিত, দারিদ্র্য-বিম্বিত দাম্পত্য লীলা সমস্ত মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের বিষয় ও আখ্যানের ভূমিকারূপে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে। চণ্ডী ও মনসা উভয়েই শিবের সহিত সম্বন্ধসূত্রেই আর্যদেব-পরিবারে অন্তর্ভুক্তির দাবী করেন। কাজেই মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তা ও প্রসারের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপেই দেবপরিবারের কর্তারূপে শিব-মহিমা সম্বন্ধে সমস্ত লৌকিক ও পৌরাণিক গল্প ও কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া একটি বিরাট কোষগ্রন্থ-প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিশেষতঃ শিবের নানা জটিল, স্ব-বিরোধী আচরণ, তাঁহার উদ্ভট কার্যকলাপ, তাঁহার চরিত্রে নানা বিসদৃশ উপাদানের সমাবেশ ও তাঁহার সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠা—এই সমস্ত মিলিয়া তাঁহাকে এক নূতন ধরনের মঙ্গলকাব্যের নায়করূপে নির্বাচন করিবার প্রেরণা যোগায়। অবশ্য এখানে নূতনত্বের কৌতূহল নাই, আছে পরিচিত আদি-দেবতার বিচিত্র জীবনস্তরের একত্র গ্রন্থন। শিবচরিত্রের দার্শনিক তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার বা বিভেদের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার কোন সুপরিকল্পিত প্রয়াসও এখানে লক্ষিত হয় না। সকল তথ্যের একস্থানে সন্নিবেশ, পৌরাণিক ও লৌকিক শিবের দ্বৈত প্রকৃতির বিস্তারিত পরিচয়দান ও নব দেবতার অভিভবে তাঁহার কিঞ্চিৎ ক্ষীয়মান মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই লেখকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে মঙ্গল-কাব্যের তীব্র সংঘর্ষ ও ইচ্ছাশক্তির দ্বন্দ্বের বা সমাজ-জীবনচিত্রের বিশেষ পরিচয় নাই; আছে মাহাত্ম্য-ঘোষণার উচ্চকণ্ঠ আরাব ও বিষয়ের মঙ্গলকাব্যানুসারী বহিরঙ্গমূলক বৈচিত্র্য।

শিব ও মঙ্গলকাব্য

রামকৃষ্ণ রায় এই শিবায়ন-ধারার প্রথম প্রবর্তক। সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদ ইহার রচনাকাল বলিয়া মনে হয়। ইহা কেন্দ্রীয়-উদ্দেশ্যহীন, যদৃচ্ছবিন্যস্ত পালার সমষ্টি। এই গ্রন্থটি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পৌরাণিক শিবের মহিমাকীর্তনে ব্যাপৃত; লৌকিক শিবের কাহিনী এখানে গৌণ ও সংক্ষিপ্ত। শিবের সাংসারিক অভাব-অনটন ও তজ্জন্য গৌরীর সহিত কোন্দল অন্যান্য মঙ্গলকাব্যশাখায় বহুধা পুনরাবৃত্ত হওয়ায় উহার

শিবায়নের প্রবর্তক কবি

নূতনত্ব হারাইয়াছে। কিছুটা ছন্দোবৈচিত্র্য, ভাষার সংযম ও মর্যাদা এবং সাহিত্যিক গল্পের কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক নিদর্শন রামকৃষ্ণের শিবায়নকে কতকটা স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন'ই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও প্রসার অর্জন করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে রচিত এই গ্রন্থে শিবসংক্রান্ত লৌকিক কাহিনীগুলির পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। পৌরাণিক শিব নিঃসঙ্গ মহিমায় ভক্ত-হৃদয়-বিবিক্ত; লৌকিক শিবই তাঁহার চারিত্রিক দুর্বলতা, গৃহস্থালীর প্রতি অমনোযোগ ও নানা হাস্যকর আচরণ দ্বারা প্রাকৃত জনসমাজের ভক্তি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছেন। সুতরাং শিব-চরিত্র হইতে এই লৌকিক উপাদানগুলি বাদ দিলে তিনি তাঁর প্রধান আকর্ষণই হারান। রামেশ্বর কিন্তু 'ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য' রচনার দাবী জানাইয়াছেন। হয়ত তাঁহার সংস্কৃত পাণ্ডিত্য ও ভাষা-প্রয়োগনৈপুণ্য এ দাবীকে কিছু পরিমাণে সমর্থন করে। কিন্তু যিনি কৃষিকার্যরত ও বাগ্‌দিনীর প্রতি আসক্ত, গৃহসম্বন্ধে উদাসীন, ভোজনরসিক কিন্তু অর্জনবিমুখ শিবের চিত্র তাঁহার কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাঁহার রুচিশীলতা ও ভদ্রপ্রথানুবর্তন সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত নহে। শিবের কৃষিচর্চার মধ্যে লেখকের চাষ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কৃষক জীবনের নানা সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যে দেশে শতকরা নব্বইজন চাষী, সে দেশের জনসাধারণের দেবতাকে কৃষিকার্য-সংশ্লিষ্ট করিয়া দেখানতে দেবতাকে জীবনের সহজ পরিবেশেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

রামেশ্বরের শিবায়ন

শিবমঙ্গলকাব্যগুলি মঙ্গলকাব্যের পরিধির কৃত্রিম সম্প্রসারণরূপেই গণ্য হইবে। একদিকে কৃষ্ণমঙ্গল, অপরদিকে শিবমঙ্গল আর্যধর্মের দুই প্রধান দেবকে পৌরাণিক প্রতিবেশ হইতে মঙ্গলকাব্যের মিশ্র পরিবেশে স্থাপন মঙ্গলকাব্য প্রথার সর্বব্যাপিত্ব, উহার বিশেষ প্রেরণাহীন, গণরুচির দ্বারা শিথিলগ্রথিত বিস্তারপ্রবণতারই প্রমাণ দিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের কৃত্রিম সম্প্রসারণ

পঞ্চম অধ্যায়

রামায়ণ ও মহাভারত

১

রামায়ণ

বাঙলার জাতীয়-কাব্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা শ্রীরামপাঁচালী রচিত হইয়াছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। কৃত্তিবাস এই কাব্য রচনা করিয়া শুধু যে নিজে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন তাহা নহে, শত শত বৎসর ধরিয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল বাঙালীর ভক্তি-ব্যাকুল হৃদয়ে যে পরিমাণ আনন্দ-সুধা বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা অন্য কোন বাঙালী কবির ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই।

কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাস আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। ইঁহার প্রপৌত্র বনমালী কৃত্তিবাসের পিতা। মাতা মালিনীর গর্ভে ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

মালিনী নামেতে মাতা বাবা বনমালী
ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী ॥

নিজের জন্ম সম্বন্ধে কবির উক্তি—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

বার বৎসরে কৃত্তিবাস পদ্মানদী পার হইয়া পড়াশুনা করিতে যান এবং যথাকালে গৌড়ে আসিয়া নিজের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তিতে গৌড়েশ্বরকে মুগ্ধ করিয়া আসন-পুষ্পমাল্যাদি পুরস্কার লাভ করেন। এইভাবে রাজসভায় স্থায়ী আসন লাভ করিয়া কৃত্তিবাস শ্রীরামপাঁচালী রচনা শেষ করেন।

আত্মপরিচয়ে কৃত্তিবাস যে রাজ্য ও রাজসভার কথা বলিয়াছেন, স্পষ্টতঃ সেই রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকালনির্ণয়ে কতকগুলি বিশেষ পূর্বধারণার প্রভাবে গবেষকদিগকে পরস্পরবিরোধী কাল-পরিস্থিতির মধ্যে কষ্টকল্পনাপ্রসূত সামঞ্জস্যবিধান-প্রয়াসের সম্মুখীন হইতে হওয়ায় মীমাংসা জটিলতর হইয়াছে। শ্রীমান্ সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁহার "বাংলা প্রাচীন সাহিত্যের কালক্রম" গ্রন্থে এই বিষয়সংক্রান্ত নানা তথ্য ও অনুমান আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্যরূপে স্বীকৃত হইতে পারে।

অবশ্য কোন যুক্তিই একেবারে চূড়ান্তরূপে সংশয়-নিরসক নহে। তথাপি রাজা ও রাজসভা-প্রতিবেশ সম্বন্ধে নানা প্রমাণের, বিবিধ আকর হইতে সংগৃহীত তথ্যাদির পরস্পর-পোষকতার জন্য ইহা যে সত্যাভিমুখী তাহা নিঃসংশয়। এই যুক্তিপরম্পরার অনুসরণে আমরা কৃত্তিবাসের জন্মসময়কে মোটামুটি ১৪৬০ হইতে ১৪৯০ খৃঃ অঃ এই কাল-পরিধির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। ইহাতে ইহার চৈতন্য-পূর্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, অথচ তাঁহাকে চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে স্থাপন করার যে অনুমান আমাদের অতিরিক্ত প্রাচীনত্ব-প্রীতির পরিচয় দেয় তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রচনায় যে ভাষারূপ ও লেখকের মানস-সংস্থিতি প্রতিফলিত তাহা অতিপ্রাচীনত্বের বিরোধী ও তাঁহার চৈতন্যের অব্যবহিত পূর্বযুগে অবস্থিতির অনুকূল।

কৃত্তিবাসের কালবিচার

তাঁহার চৈতন্যপূর্বতা সম্বন্ধে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেন নাই। অথচ আভ্যন্তরীণ বিষয়-প্রমাণে শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালিক কোন গ্রন্থে তাঁহার অনুল্লেখ-দর্শনে কেহ কেহ কৃত্তিবাসকে চৈতন্যোত্তর বলিয়াও মনে করেন। কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া নবদ্বীপ-শান্তিপুরের অতি সন্নিহিত ও উহাদের ভাব পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ যদি চৈতন্যদেবের পূর্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করিত তবে নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য এই ভক্তিসমুদ্রে অবগাহন করিতেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল'-এ কৃত্তিবাসের উল্লেখ অন্ততঃ চৈতন্যগোষ্ঠীর নিকট তিনি যে অপরিচিত ছিলেন না তাহা প্রমাণ করে।

কৃত্তিবাসের চৈতন্য-পূর্বতা বিচার

যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমরা এখন পাঠ করি তাহার ভাষার মধ্যে কৃত্তিবাসের নিজের ও তৎকালের ভাষা কতখানি রক্ষিত হইয়াছে বলা কঠিন। কারণ প্রভূত জনপ্রিয়তার ফলে অসংখ্য পাঠক ও গায়কের মুখে মুখে স্বাভাবিকভাবেই উহার বিপুল পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাষা যে কারণে পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল—কৃত্তিবাসের ভাষাও সেই কারণে উহার প্রাচীনত্বের প্রায় সমস্ত লক্ষণ বিসর্জন দিয়া বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের ভাষা

শুধু ভাষায় নহে, বিষয়বস্তুতেও প্রক্ষিপ্ত অংশ কম অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। বাল্মীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ কৃত্তিবাস করেন নাই এবং বাঙালী দৃষ্টিকোণ হইতেই তিনি বিষয়বস্তু ও চরিত্রসমূহ লক্ষ্য করিয়াছেন। ফলে বাল্মীকির চরিত্রের দৃঢ়তার সহিত বাঙালী-জীবনের

কৃত্তিবাসের বাঙালী দৃষ্টি

কমনীয়তা মিশিয়া কাব্যখানি একটি অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় মহাকাব্য-রূপে পরিণত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের আসল রূপ পাওয়া যায় নাই, বহুল প্রচারের জন্য তাহার ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছে। যদি ইহা চৈতন্যপূর্ববর্তী রচনাও হয়, তথাপি ইহার মধ্যে যে প্রেমধর্মের ও ভক্তিরসের প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে তাহাতে ইহার বর্তমান রূপ যে বিশেষভাবে চৈতন্যপ্রভাবিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বহু কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু ৫১ জন রামায়ণ-লেখকের নাম করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে **অদ্ভুতাচার্যের** নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। অদ্ভুতাচার্যের আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। তিনি তাঁহার রামায়ণের কাহিনী শুধু বাল্মীকির রামায়ণ হইতে সংগ্রহ না করিয়া অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতি হইতেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের কন্যা **চন্দ্রাবতী**—রামায়ণ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ-গীতিকায় চন্দ্রাবতীর কাব্যময় জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা ছাড়া কৈলাস বসু, রামশংকর দত্ত, ভবানী দাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, রামানন্দ ঘোষ, রঘুনন্দন, হরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শেষের দিকের অর্থাৎ উনবিংশ শতকের রামায়ণের কবিদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন **রঘুনন্দন গোস্বামী**। তাঁহার রচিত রামরসায়ন সুলিখিত বিরাট গ্রন্থ।

অন্যান্য কবি

২

মহাভারত

বাংলা মহাভারত রচিত হইয়াছিল রামায়ণের পরে। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর কাছে অবিদিত ছিল না। মোটামুটি মহাভারতের বিচ্ছিন্ন কাহিনীও হয়ত জনসাধারণের পরিচিত থাকিতে পারে, কিন্তু অনুবাদ-কার্যের স্থির প্রমাণ **কবীন্দ্র পরমেশ্বরের** পূর্বে আর পাওয়া যায় না। অবশ্য আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন **সঞ্জয়** নামক কবিকে কবীন্দ্রপরমেশ্বরের পূর্ববর্তী বলিয়া স্থান দিয়াছেন। মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ হয় ষোড়শ শতকের প্রথমে হুসেন শাহের আমলে। হুসেনের পরাগল খাঁ নামে

মহাভারতের কবি

একজন লস্কর চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং তাঁহারই উৎসাহে ও আদেশে কবীন্দ্রপরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। এই জন্য এই মহাভারতকে পরাগলী মহাভারতও বলা হইয়া থাকে। বোধ হয় কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নাই, মুখ্যতঃ যুদ্ধকাহিনীই বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম ছিল—পাণ্ডব-বিজয়। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় **শ্রীকরনন্দী** বিস্তৃতাকারে মহাভারত রচনা করিয়াছেন। ইহার পর কোন বিশেষ পর্ব বা সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছেন রামচন্দ্র খান, রঘুনাথ, অনিরুদ্ধ, ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, কাশীরাম দাস, নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতি।

ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন **কাশীরাম দাস**। কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমান জিলার ইন্দ্রাণী পরগনার সিঙ্গি গ্রামে। সপ্তদশ শতকের সুরুতেই তিনি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত কাশীদাসী মহাভারতকেও প্রচারবাহুল্য ও জনপ্রিয়তার জন্য বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনিও মহাভারতের কোন আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই এবং বাঙলাদেশের বহুপ্রচলিত কাহিনীকে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন, বাঙালী দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রের নবরূপায়ণ করিয়াছেন। কাশীরাম দাসের আসল ভাষা হয়ত জনপ্রিয়তার স্পর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে, তবু বর্তমান কাঠামো দেখিয়া শব্দের বাঁধুনি ও ভাষার লালিত্য সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক

৩

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণ রচনার দিক দিয়া অগ্রবর্তী। ইহার শান্ত রস ও পারিবারিক জীবন বাঙালী জীবনাদর্শের সহিত এমন সহজ-সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে ইহা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা-বলেই লেখা হইয়াছিল। কৃত্তিবাস রাজসভায় অভিনন্দিত হইলেও তিনি যে রাজাদেশে রামায়ণ রচনা করেন এমন কোন উল্লেখ নাই। রামায়ণ-কাহিনী একজন আদর্শ পুরুষ বা অবতারের জীবন-কথা; ইহার রস গভীর কিন্তু একমুখী; আখ্যায়িকার বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু মহাভারতে যদিও কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি ইহা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী নহে; শ্রীকৃষ্ণ ইহার মধ্যে প্রধান চরিত্র নহেন। তিনি যেমন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সারথি ও নেপথ্যের অন্তরালে কূট-কৌশলী উপদেষ্টা, তেমনি মহাভারতের কাহিনীতে তিনি পাণ্ডব-সখারূপে গৌণ অংশে অবতীর্ণ। মহাভারতের বিষয়-বৈচিত্র্য ও রসের বিভিন্নতা রামায়ণ অপেক্ষা

রামায়ণ ও মহাভারত

অনেক বেশী। ইহার শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত আখ্যায়িকা-বিন্যাস অনেক বেশী কৌতূহল উদ্রেক করে। বিশেষত ইহার যুদ্ধবর্ণনা রামায়ণের মত কেবল গাছ-পাথর-ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপার নয়, রাক্ষস ও বানরের বীভৎসরসপ্রধান শক্তি-আস্ফালনের ক্ষেত্র নয়। ইহার মধ্যে ব্যূহ-নির্মাণ, সৈনাপত্য-কৌশল, কূট ষড়যন্ত্র ও মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রাধান্য। ইহাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিবরণ এবং রাজনীতি ও ধর্মনীতির সূক্ষ্ম আলোচনা অনেক স্থান অধিকার করে। মোটের উপর মহাভারতে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ও পরস্পর বিবদমান রাজশক্তির যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহার পাঠান আমলের ভারতবর্ষের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে কেন আমাদের তুর্কী-শাসকেরা রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ও মহাভারত-কাহিনীকে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রমুখ শাসকেরা রামায়ণে হিন্দুধর্মের গুণগান ও হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদনের অতিরিক্ত আর কিছু আকর্ষণীয় বস্তু দেখিতে পান নাই। রামায়ণ সম্পূর্ণরূপে ধর্মকেন্দ্রিক গ্রন্থ ও পরিবার-জীবনের করুণ ইতিহাস বলিয়া অন্যধর্মাবলম্বী পাঠক যে ইহার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিবেন না ইহা স্বাভাবিক। মহাভারতে ধর্মের একাধিপত্য নাই। ইহাতে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত জড়িত হইয়া বাস্তব কৌতূহল ও আখ্যান-রসের আনুষঙ্গিক উপাদান-রূপে বর্তমান। হিন্দুধর্মে অবিশ্বাসীও ইহার বস্তুরস আস্বাদন করিতে উন্মুখ হইবেন। ইহার মানবিক আবেদনই ইহার সার্বভৌম জনপ্রিয়তার মূলে। পক্ষান্তরে হিন্দু অধ্যাত্মরুচি শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত-লীলা-আস্বাদনেই চরিতার্থ; মহাভারতীয় কৃষ্ণলীলার প্রতি ইহা অপেক্ষাকৃত উদাসীন। কাশীরাম দাসের অনুবাদের পূর্বে হিন্দুধর্মের যে উদার ও ব্যাপক রূপ মহাভারতে পরিস্ফুট তাহার রসাস্বাদনে হিন্দু প্রাকৃত জনসাধারণ খুব বেশী উৎসাহী ছিল না। সেইজন্যই রামায়ণ-অনুবাদের প্রেরণা আসিয়াছে অন্তর হইতে; আর মহাভারতের অনুবাদ-প্রেরণা আসে বিজাতীয় শাসকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য। অবশ্য পরিচয়ের ফলে ক্রমশঃ মহাভারতের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়াছে। তথাপি এখন পর্যন্ত রামায়ণের সহজ, সরল ধর্মাদর্শের প্রভাব জাতীয় অনুভূতিতে যতটা সর্বস্তরব্যাপী —মহাভারতের সূক্ষ্ম ও জটিলতর ধর্মবোধ ততটা প্রসারিত হইতে পারে নাই। আমরা রামায়ণকে জানি ইহার একমুখীন রসের সমগ্রতায়; মহাভারতকে জানি ইহার খণ্ড খণ্ড বিচিত্ররসবাহী আখ্যানে।

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের কবিত্বশক্তি-ও এই কাব্যদ্বয়ের স্বরূপ-পার্থক্যের অনুসারী। কৃত্তিবাস স্বল্প পরিসরের মধ্যে করুণ ও ভক্তিরস-উদ্রেক ও বাল্মীকির অনুসরণে প্রকৃতি-বর্ণনায় নিপুণ; এই সীমার বাহিরে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায় না। রামায়ণে যে সমস্ত পরিহাস-রসিকতার উদাহরণ আছে তাহা অধিকাংশই অন্য কবির রচনা, পরবর্তী যুগে কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতকারের পরিসর আরও বহু বিস্তৃত ও বিচিত্র রসাপ্লুত। কাশীরাম দাসের বর্ণনা ও রস সৃষ্টি আরও বিবিধ ও বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত, এবং তাঁহার চরিত্র সৃষ্টি আরও জটিলতর।

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম

৪

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত বাল্মীকি-রামায়ণ ও বেদব্যাস-মহাভারতের যুগোপযোগী ও বাঙালী মানসিকতার রুচি-অনুসারী অনুবর্তন। সুতরাং একদিকে উহারা সংস্কৃত মহাকাব্যের কাব্যরীতি প্রভাবিত, অন্যদিকে যুগচিত্তের রুচিকর ও হিতসাধক স্বাধীন রচনা। উহাদের কাব্যমূল্য নির্ধারণ করিতে হইলে উভয় দিক দিয়াই উহাদের আলোচনা প্রয়োজনীয়। এই দুই অনুবাদগ্রন্থ এরূপভাবে বাঙালীর জীবন-সংস্কার ও বাস্তব ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত হইয়াছে যে ইহাদের স্বতন্ত্র কাব্যমূল্যবিচার আধুনিক যুগ পর্যন্ত উপেক্ষিতই হইয়াছে। চৈতন্যোত্তর ভক্তিপ্লাবন ও ধর্মসর্বস্বতা ইহাদের যুগজীবননিদর্শন-গুলিকে ত অবলুপ্তই করিয়াছে, এমন কি মূল সংস্কৃত মহাকাব্যের জীবন-মুখিতাকেও এই নূতন ভাবোচ্ছ্বাসে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাই বাল্মীকির "নরচন্দ্রমা" মানবশ্রেষ্ঠ রাম কৃত্তিবাসে বৈষ্ণব দীনতার মূর্ত প্রতীক, মানব প্রেম, ক্ষমা ও করুণরসের ঘনীভূত নির্যাস এক আত্মবিস্মৃত অবতারত্বে নিজ মানবিক পরিচয় বিসর্জন দিয়াছেন। সমাজজীবননির্ভর, মানবিকবৃত্তির অকুণ্ঠিত বিকাশে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকাহিনী আদর্শলোকের অলৌকিকতাপ্রধান, বাষ্পাকুল ভক্তিশাস্ত্রে রূপান্তরিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা নামকীর্তন মুখরিত, ভক্তিবিহ্বলতার অশ্রুপ্লাবিত রঙ্গভূমিতে পরিণত হইল। গুহক চণ্ডালের মিতা রামচন্দ্রের চৈতন্যাদর্শপ্রভাবিত পতিতপাবন রূপটি পরিস্ফুট হইল। ক্ষাত্র শৌর্যবীর্যের সমস্ত পরুষতা কোমল অনুভবের স্পর্শে, প্রীতিরসের আতিশয্যে আর্দ্র হইয়া উঠিল। বাঙালী রামজীবন হইতে কেবল অবিমিশ্র ভক্তিবাদ ও জীবনবন্ধন হইতে মুক্তি-আকূতির প্রেরণা লাভ করিল।

কাশীরাম দাসের মহাভারতে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ক্রূরসংঘাতময় কর্মজটিলতা

ও ঘটনাবৈচিত্র্যের নানামুখী রসাবেদন ধর্মাদর্শের একাধিপত্যে এতটা আচ্ছন্ন হয় নাই। উহার ভক্তিপ্লাবন জীবনরসের বিচিত্র প্রবাহকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই। মহাভারতের আখ্যানের মধ্যে মানবমনের উচ্চনীচ ভাবসমূহ, হিংসা, ঈর্ষ্যা, অধিকারস্পৃহা, অন্যায় আচরণ প্রভৃতির সঙ্গে ক্ষমা, উদারতা, আদর্শ-পরায়ণতা ও ধর্মনিষ্ঠার সহাবস্থান গ্রন্থটিকে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রামায়ণের মত এখানে একটানা করুণ রসের প্রসার নাই। সীতা ও দ্রৌপদী উভয়েই ভাগ্যবিড়ম্বিতা; এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা আরও অসহনীয়রূপে অপমানকর। কিন্তু সীতার ন্যায় দ্রৌপদী নিরবচ্ছিন্ন রোদনশীলা নহে; তাহার এক চোখে জলধারা, অন্য চোখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছে। মহাভারতের নারীচরিত্রগুলি রামায়ণের সহিত তুলনায় আরও বৈচিত্র্যরূপিনী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না। রামায়ণে সীতা ও কৈকেয়ী ছাড়া আর কোন নারীর চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য নাই। মহাভারতে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, কুন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি নারী আপন আপন স্বতন্ত্র চরিত্র-মহিমায় সমুজ্জ্বল। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও রাবণ জীবন্ত চরিত্র হইলেও ইঁহারা ব্যক্তিত্ব-দ্যোতক গুণ অপেক্ষা আদর্শনিষ্ঠার বিভিন্ন বিকাশের দ্বারা অধিকতর চিহ্নিত।

দশরথ ও ধৃতরাষ্ট্র এই দুই রাজপিতার চরিত্রের তুলনা করিলেই মহাভারতের চরিত্র-পরিকল্পনার গভীরতর ও জটিলতর বাস্তবতা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। ইন্দ্রজিতের মানবিক রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে আমাদিগকে মধুসূদনের চরিত্রাঙ্কন-প্রতিভার জন্য আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে। কিন্তু অভিমন্যু ইন্দ্রজিতের সহিত অভিন্ন শোকাবহ পরিণতির সমসূত্রবদ্ধ হইয়াও মানবিক গুণে ও করুণরস উৎসারে অধিকতর সমৃদ্ধ। রামায়ণে হনুমান ও বিভীষণ তাহাদের পরম ভক্তিপরায়ণতা ও একান্ত আত্মনিবেদনের দ্বারা পাঠকের গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতি চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছে। তাহারাই পাঠকের প্রতিনিধিস্থানীয়রূপে কাব্যের রসাবেদনটি আমাদের মনে অপরিবর্তনীয়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। এমন কি রাবণও শেষ পর্যন্ত বৈরসাধনের অন্তরালে আত্মগোপনকারী ছদ্মবেশী ভক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রাবণের সহিত সমধর্মী দুর্যোধন কিন্তু নিজ বৈরভাবে ও ক্ষাত্র অভিমানে অচল থাকিয়া এই হঠাৎ-উচ্ছুসিত ভক্তির জোয়ারে আপন চরিত্রদৃঢ়তা বিসর্জন দেয় নাই। মূল রামায়ণ-মহাভারতের এই স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য অনুবাদগুলিতেও যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্র তুলনা

মোট কথা রামায়ণ গার্হস্থ্যরসপ্রধান, ভক্তি-উদ্বেল, শান্ত জীবনপরিণামের কাহিনী। উহার সব সুর ছাপাইয়া পারিবারিক জীবনের বিয়োগবিধুর শোকোচ্ছ্বাস ও ঐশী মহিমার নিকট একান্ত আত্মনিবেদনের সুরটিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার চরিত্রপরিকল্পনা ও কাব্যকৃতিও এই প্রধান সুরের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। মহাভারতের পরিসমাপ্তিতে একটি শান্ত নির্বেদ ও উদাসীন ত্যাগ-বৈরাগের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থটিতে উচ্চতম নীতিসাধনার সহিত অকুণ্ঠিত জীবনমমতা ও রাজনীতিসুলভ কুটিল ও ছলনাময় আচরণের একটি বাস্তব সমন্বয় লক্ষিত হয়। অর্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সমস্ত আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিকে, এমন কি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও মাঝে মধ্যে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে ও অসাধু নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত কাব্যটিতে ধর্মের মহিমা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইলেও ও জীবনযাত্রায় উন্নত আদর্শের নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত হইলেও ইহার অলৌকিক পরিবেশ ও উচ্ছ্বসিত ভক্তিনিবেদনের মধ্যে একটি বাস্তব জীবনস্তরের স্পর্শ সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের সার্বভৌম ঈশ্বরত্ব সর্বত্র স্বীকৃত হয় নাই—ঐশীশক্তি-প্রয়োগ অপেক্ষা কূটনীতির সহায়তাই তাঁহাকে অধিকাংশ স্থলে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মহাভারতের মধ্যে নানা লোকসংস্কারের বিচিত্র কাহিনী, নানা রোমান্সধর্মী উপাখ্যান, ধর্ম, নীতি ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে নানা যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা, স্থানে স্থানে আদিম ও অসংস্কৃত প্রাণবেগের অতর্কিত উচ্ছ্বাস, লৌকিক আবেগের উত্তপ্ত উৎক্ষেপ উহাকে ধর্মগ্রন্থের সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে উদ্ধার করিয়া এক উদারতর জীবনবেদের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মহাভারতে পরিবারজীবনের কাহিনী অপেক্ষাকৃত গৌণ পর্যায়স্থিত। রামায়ণে লঙ্কার যুদ্ধ বিধ্বস্ত পারিবারিক জীবনের পুনরুদ্ধারের উদ্যোগমাত্র ; যুদ্ধরত রাম একদিকে ভ্রাতৃস্নেহবিহ্বল, অপরদিকে দাম্পত্য পুনর্মিলনের জন্য স্বপ্নাতুর। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মহাভারতের কেন্দ্রীয় ঘটনা ; ইহার সর্বগ্রাসী উত্তেজনা কৌরব-পাণ্ডবের গার্হস্থ্য জীবনের ছবিকে ম্লান-পাণ্ডুর বর্ণে নিষিক্ত করিয়াছে।

রামায়ণে গার্হস্থ্য রস—মহাভারতে রাষ্ট্রীয় সংঘাত

কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের রচনাদ্বয়ে যে রীতি-পার্থক্য ও কাব্যগুণের তারতম্য আছে, তাহা কতকটা মূলগ্রন্থপ্রভাবিত, কতকটা কবিদের শিল্পসৃষ্টির বিভেদ-প্রসূত। উভয় অনুবাদেই মূলের প্রত্যক্ষ জীবনস্পর্শ প্রথাবদ্ধতার জন্য স্তিমিত হইয়াছে। কিন্তু এই জীবনসম্পর্কক্ষীণতা রামায়ণে যত প্রকট, মহাভারতে ততটা

নহে। উপমা-অলঙ্কার-নির্বাচনে কৃত্তিবাস অধিকাংশ স্থলেই স্বাধীনচেতনাহীন ও নিরুত্তাপ; কাশীরামে এই চেতনা অপেক্ষাকৃত প্রবল ও জীবনবোধ-উদ্দীপ্ত। উভয়েরই রূপবর্ণনার মনোভঙ্গী ও উপমা-প্রয়োগ তুলনা করিলেই এই পার্থক্যটি পরিস্ফুট হইবে। রামায়ণে রাম বা সীতার রূপ-বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত অলঙ্কার-রীতির যান্ত্রিক অনুসরণ; বর্ণনার সময় কবিমনে যে রূপমোহ ক্ষীণভাবেও উদ্রিক্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণ অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে কাশীরাম দাসের স্বয়ংবর-সভায় দ্রৌপদীর বা ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের রূপবর্ণনায় মামুলি উপাদানগুলির মধ্যে নববিন্যাসরীতির চমক ও রূপানুভূতির উল্লাস-স্পন্দন ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃত্তি-বাসের যুদ্ধবর্ণনা নির্জীব ও নেপথ্যশায়িনী ভক্তির পিছনটানে শিথিল ও উত্তাপহীন। কাশীরামের সতেজ বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে রণোন্মাদনা ব্যঞ্জিত। কৃত্তিবাসের প্রধান আবেদন আমাদের ভক্তিবৃত্তির তৃপ্তিতে ও করুণরসের উদ্দীপনে। ঐশী শক্তির প্রতি স্তবস্তুতির উচ্ছ্বাসে ও সীতাবিরহখিন্ন রামের হৃদয়দ্রাবী বিলাপেই তাঁহার কবিত্বশক্তির মুখ্য পরিচয়। তাঁহার মহাকাব্যের পাত্রে গার্হস্থ্য জীবন-রসই অকৃপণভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। কাশীরামের মহাভারতে একদিকে যেমন অলঙ্কার প্রয়োগ দক্ষতা বেশী, অন্যদিকে তেমনি ভক্তি ও করুণরসের পরিমাণ অপেক্ষা জীবনলীলার বিভিন্ন রস ও ক্ষাত্র জীবনাদর্শের ঐশ্বর্যময়, বর্ণবহুল বাঙালী মানসলোকের উপর বিকাশ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃত্তিবাসের যুগে চৈতন্যলীলাস্মৃতির অসপত্ন অধিকার। কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে আবির্ভূত কাশীরামের প্রেমভক্তির আবেশ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের কঠোর সংঘাত, রাজনীতি-ধর্মনীতিতত্ত্বের যুক্তিনিষ্ঠ মনন-প্রাধান্য ও ধর্মসংপৃক্ত জীবন-কৌতূহলের সহজ আকর্ষণ কবিচেতনায় প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। কৃত্তিবাসে ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাব কাশীরামে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া ধর্মশাসিত জীবনানুরাগকে একটি বৃহৎ স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে। বৃন্দাবনলীলার মিলিত-রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য হইতে মহাভারতীয় কৃষ্ণে উত্তরণই বাঙালী মানস-চেতনার কৃত্তিবাস হইতে কাশীরামে অগ্রগতির নিয়ামক মানদণ্ড।

কৃত্তিবাস ও কাশী-দাসের রচনারীতির পার্থক্য

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী

১

বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বাভাস যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ-এ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে পাওয়া যায় ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এই রচনাগুলিতে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার নিম্নলিখিত তত্ত্ব, আখ্যান ও কাব্যরূপ দেখা যায়:—(১) এই লীলার সূচনা হইতে শেষ পরিণতি পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিহাস; (২) এক সৌন্দর্যময় বাস্তব পরিবেশে, গ্রাম্য বা নাগরিক জীবনের পটভূমিকায়, ইহার একটি উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ-পূর্ণ ও কবিত্বরসসমৃদ্ধ বর্ণনা; (৩) ক্রমপরিণতির পর্যায়-বিন্যস্ত ও সুনির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ক্রমানুসারী পালাগানের আকারে ইহার বিন্যাস; (৪) ঈষৎ-উন্মেষিত ভক্তিরসের স্পর্শে, মানবিক প্রেমকাহিনীর রূপকে, ইহার মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের পবিত্র সম্পর্কের ব্যঞ্জনা-আরোপ। এই রচনাগুলি হইতে বুঝা যায় যে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই রাধাকৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে জনসাধারণের মনে একটা ভক্তিমিশ্র রূপমুগ্ধ আগ্রহ জাগিয়াছিল ও অন্যান্য পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের ভীতিসঞ্জাত ও রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধুররস-পুষ্ট ভক্তির কাহিনীও বাঙালীর চেতনায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে ও প্রেমধর্মপ্রচারে, তাঁহার জীবনলীলার প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম বাঙলার জাতীয় ধর্ম-রূপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করিল ও ধর্মানুভূতি একটি প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য-রূপে জনসাধারণের মনে প্রতিভাত হইল।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার তথ্যকথা ও পীঠভূমি

শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও জীবনলীলা শুধু বাঙলার নয়, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। পৃথিবীতে সংঘটিত আর কোন ঘটনাই জাতীয় জীবনে এত সুদূর প্রসারী ও বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। চৈতন্যধর্মের ভাবপুষ্ট বাঙালী জাতি যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার জীবনযাত্রায়, তাহার কর্মে ও মনন-চিন্তনে, তাহার কাব্যসাহিত্যে, তাহার সমাজ-আদর্শ-সংগঠনে ইহার প্রভাব অক্ষয় হইয়া আছে। পৃথিবীর কোন এক ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া এত ভক্তির উচ্ছ্বাস, এত ভালবাসার আত্মীয়তাবোধ, দেবত্বের এত নিকট স্পর্শ, অন্তরের এত আলোড়ন, কবিত্বের এত অফুরন্ত

শ্রীচৈতন্য-জীবন বাঙালীর বহুমুখী আত্মপ্রকাশের অক্ষয় উৎস

নির্ঝর, অলঙ্কার, দর্শন ও বিধি-রচনায় এমন আশ্চর্য মননশক্তি, ধর্মচেতনায় এত প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠানের এমন আন্তরিক সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। গৌরাঙ্গলীলা যেমন একদিকে আমাদের সমস্ত জীবনকে উর্ধ্বায়িত করিয়াছে, তেমনি আমাদের বাস্তব-চেতনা ও ইতিহাস-বোধকেও উদ্দীপ্ত করিয়া আমাদের দিনলিপি (diary), জীবনী (biography) প্রভৃতি নানা নূতন ধরনের সাহিত্য-সৃষ্টি করিতেও প্রেরণা দিয়াছে। তাহা ছাড়া, চৈতন্য-যুগে যত অধিকসংখ্যক কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়াছে, কাব্যের সঙ্গে ধর্মানুভূতি ও সমাজ কল্যাণ সাধনের যত নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, এমন আর অন্য কোন যুগে সম্ভব হয় নাই। দুই শতাব্দীর মধ্যে বাঙালীর কণ্ঠে যত গান ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার ধর্মপ্রচার ও সমাজ-সংগঠনে যত উৎসাহ দেখা গিয়াছে, তাহার মনন শক্তির যত বিচিত্র প্রকাশ তাহার অন্তর-ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়াছে এমন আর কখনও হয় নাই। সুতরাং চৈতন্যোত্তর যুগকে বাঙালীর সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

যে মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে বাংলা-সাহিত্য ও জীবনের শুষ্ক তরু ফলে-ফুলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার বহির্জীবন ঘটনা-বিরল, কিন্তু অন্তর্জীবন বিচিত্র ভাব ও লীলারসে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার জীবনে বিবৃতির অবসর কম, কিন্তু রস-আস্বাদনের অবসর প্রচুর ও অফুরন্ত। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম নবদ্বীপ নগরে, ১৪৮৬ খৃঃ অঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। এই দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যা-কালে চন্দ্রগ্রহণের সময়, যখন গঙ্গাতীর ও নবদ্বীপ নগর তুমুল হরিধ্বনিতে ও নাম-সঙ্কীর্তনে মুখরিত, তখনই শ্রীচৈতন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র ও ডাকনাম নিমাই। তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ও অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। শোনা যায় যে তাঁহার শৈশব-চাপল্যে সমস্ত নবদ্বীপবাসী জ্বালাতন হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহার শাস্ত্রাচারে উপেক্ষার জন্য তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনে তাঁহার এই দুরন্তপনার মধ্য দিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-লীলার ছায়াপাত হইয়াছিল। শিক্ষা-সমাপনান্তে তিনি টোল খুলিলেন ও তাঁহার অসাধারণ অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার জন্য শীঘ্রই প্রসিদ্ধি অর্জন করিলেন। কথিত আছে যে এই সময় তিনি ন্যায়-শাস্ত্রের একখানি

শ্রীচৈতন্যের জীবন-কথা : কৈশোর-লীলা

টীকা রচনা করেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ শিরোমণির টীকা অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, বন্ধুর যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি স্বরচিত টীকাখানি গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে প্রথম যৌবনেই তিনি কীর্তিলাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়া তাঁহার বৈরাগ্য-প্রবণতার প্রমাণ দেন। এই সময়ে তাঁহার প্রথমে লক্ষ্মী-দেবীর সঙ্গে ও তাঁহার অকাল-মৃত্যুর পর বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। সকলেই আশা করিয়াছিল যে এই তরুণ মেধাবী যুবক সংসার-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করিবেন ও বাঙলা দেশে প্রচলিত পাণ্ডিত্যের মানকে বর্ধিত করিয়া এই জ্ঞানানুশীলনের রাজ্যেই স্মরণীয়তা লাভ করিবেন।

কিন্তু পূর্ণযৌবনে তাঁহার জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন আসিল তাহা কেহই প্রত্যাশা করেন নাই। এই সময় তিনি পিতৃকৃত্য করিতে গয়াধামে যান ও সেখানে প্রথিতনামা বৈষ্ণব ভাবসাধক শ্রীঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্য দীক্ষা-গ্রহণ করেন। এই দীক্ষার ফল-স্বরূপ তাঁহার জীবনে অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বার খুলিয়া যায় ও ক্রমশঃ ভগবৎ-সাধনা তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। তিনি পাণ্ডিত্যের অভিমান, বুদ্ধির গর্ব, সমস্ত বিসর্জন দিয়া ধ্যানতন্ময়, দিব্যভাববিভোর হইয়া পড়িলেন ও ঐশী লীলার স্ফুরণ তাঁহার বাস্তব চেতনাকেও অভিভূত করিল। তিনি সব সময় ও সর্বত্র রাধাকৃষ্ণলীলার বিচিত্র বিকাশ অনুভব করিতে লাগিলেন ও সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট এই লীলারসে অভিষিক্তরূপে প্রতিভাত হইল। শেষ পর্যন্ত তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস জীবনগ্রহণের সঙ্কল্পে স্থির হইলেন ও মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সমগ্র জগতের পাপ-তাপ দূর করিয়া ভগবৎ প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি বিসর্জন দিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই নূতন নাম গ্রহণ করিলেন এবং এই নামেই তিনি বৈষ্ণব-জগতে পরিচিত।

মধ্য-লীলা ও সন্ন্যাস-গ্রহণ

তাঁহার জীবনের শেষ চব্বিশ বৎসর তিনি প্রধানতঃ নীলাচলে (পুরীধামে) অবস্থান করিলেন। এখানে থাকিয়াই তিনি দাক্ষিণাত্য, বঙ্গদেশ ও বৃন্দাবনধাম পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রেমধর্মপ্রচারে ও শিষ্যসংগ্রহে ব্রতী হইলেন। এই চব্বিশ বৎসরের ইতিহাস একেবারে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্জীবনের নিগূঢ় অনুভূতির

কাহিনী। এই সময় তিনি নিজেকে কখনও রাধা, কখনও কৃষ্ণরূপে কল্পনা করিয়া উঁহাদের পারস্পরিক প্রেমলীলা নিজের মধ্যেই অনুভব করিতেন। দিব্যদম্পতীর মনে পরস্পরের অপ্রাপ্তি ও অদর্শনের জন্য যে মর্মান্তিক খেদ ও আকূতি জাগিত তাহাই চৈতন্যদেবের নিজের আচরণে অনুকৃত হইত। এই বাস্তবচেতনাহীনতার অবস্থাকে দিব্যোন্মাদ আখ্যায় অভিহিত করা হইত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত নামক চৈতন্য-জীবনীতে এই দিব্যোন্মাদের নানা ভাববৈচিত্র্য বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত ও আলোচিত হইয়াছে। ফলতঃ শ্রীচৈতন্যের শেষের জীবন-কাহিনী কেবল ভাবজীবনেরই বিবরণ। তাঁহার তিরোভাব সম্বন্ধেও একটা রহস্যের আবরণ এখনও রহিয়া গিয়াছে। ১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ আষাঢ় মাসে কাহারও মতে তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহের মধ্যেই লীন হন; কেহ কেহ বা বলেন যে তিনি ভাব-সমাধি অবস্থায় সমুদ্রে অবগাহন করিয়া সমুদ্রগর্ভেই দেহ বিসর্জন করেন।

অন্ত্যলীলা

২

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কেবল কাব্যক্ষেত্রেই নবসৃষ্টি-প্রেরণা জাগায় নাই; নূতন দর্শনশাস্ত্র ও অলঙ্কার প্রণয়নের দ্বারা ও জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও সমাজ-সংগঠনের উৎসাহ উদ্রেক করিয়া বাঙালীর মনীষা ও কর্মশক্তির মধ্যেও এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। শ্রীচৈতন্য নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও ধর্মতত্ত্বের আদর্শ-বিচারে নবধর্ম প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। কিন্তু মনে হয় যে বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপনির্ণয় ছাড়া ইহার সাংগঠনিক প্রয়াসের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। তিনি বিশুদ্ধ দিব্য অনুভূতির খাঁটি সোনা অপর্যাপ্ত পরিমাণে যোগাইয়াছিলেন কিন্তু সমাজবিধির যে টাঁকশালে এই স্বর্ণ দেশ-প্রচলিত মুদ্রার আকার ধারণ করে সেই টাঁকশালের কর্মাধ্যক্ষগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তিনি ছিলেন না। তিনি কেবল পদাবলী-সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দীপনা-সঞ্চার, নামকীর্তন-প্রবর্তন ও তাঁহার ভাবধারায় ও চরিত্রাদর্শে অনুপ্রাণিত শিষ্যমণ্ডলীপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা বাঙালীর বিশেষ সৌভাগ্য যে তাঁহার তিরোভাবের পর তাঁহার ধর্ম একদল অতি সুনিপুণ তত্ত্বব্যাখ্যাতা ও প্রচারক-মণ্ডলীর সহযোগিতায় সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হয় ও লীলাকীর্তনের মধ্য দিয়া

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

জাতির মর্মস্থলে অনুপ্রবেশ করে। সুতরাং বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে ধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাতার যেরূপ গুরুত্ব, তাঁহার অনুচরবৃন্দেরও প্রায় সেই প্রকারেরই প্রধান অংশ; কারণ চৈতন্য-ভক্তবৃন্দের আন্তরিক সাধনা ও কর্মোদ্যম ব্যতীত এই প্রেমধর্ম বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইতে পারিত না।

চৈতন্যধর্ম-সংগঠকদের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রায় চৈতন্যের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব সমাজে ও কীর্তনিয়াদের কণ্ঠে গৌর-নিতাই—এই যুগ্ম নাম অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। কৃষ্ণ-বলরামের সাদৃশ্য রক্ষা করিবার জন্যও এই উভয় মহাপুরুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ কল্পিত ও আরোপিত হয়। নিত্যানন্দ ব্যতীত অদ্বৈত আচার্য, যিনি চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রেমধর্মের প্রথম বাঙালী সাধক, শ্রীবাস পণ্ডিত, বাসুদেব ঘোষ, গদাধর পণ্ডিত, নরহরি ঠাকুর ও পরবর্তী যুগের শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস প্রভৃতি বাঙলা দেশে চৈতন্যধর্মবিস্তারের প্রধান সহায়ক ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীর চৈতন্য তত্ত্ব-ব্যাখ্যা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদকেই বাঙালী বৈষ্ণব সমাজের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন ও বৈষ্ণব সাধনার উভয় ধারার মধ্যে সংযোগ-সূত্র রচনা করেন।

চৈতন্য-ধর্মের সংগঠক-মণ্ডলী

তত্ত্বানুশীলনের দিক দিয়া বৃন্দাবনের ষড়্‌-গোস্বামী—রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও জীব গোস্বামী—নূতন বৈষ্ণবদর্শন রচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ যে অবতারশ্রেষ্ঠ ও স্বয়ং ভগবান এবং কৃষ্ণলীলা যে ভগবানের সর্বোত্তম লীলা ইহাই শাস্ত্রবাক্য-উদ্ধার ও প্রগাঢ়-পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রতিপাদন করেন ও শ্রীচৈতন্য যে রাধা-কৃষ্ণের যুগল তত্ত্বের মিলিত বিগ্রহ ও নিজ জীবনে রাধাকৃষ্ণ-লীলার মাধুর্য-প্রকটনকারী ইহাও দেখাইয়া—প্রেমধর্মের মাহাত্ম্য সর্বজনস্বীকৃত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই দার্শনিক তত্ত্বগুলি চৈতন্য-জীবনের আলোকে আলোচনা করিয়া চৈতন্য-লীলা ও কৃষ্ণ-লীলার মধ্যে একটি নিগূঢ় ঐক্যের অস্তিত্ব অনুপম মনীষা ও উচ্ছ্বসিত ভক্তিবাদের সাহায্যে প্রচারিত করেন।

ষড়্‌-গোস্বামী ও বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা

৩

জীবনী কাব্য ও কৃষ্ণমঙ্গল

এই যুগের যে দুইটি প্রধান কাব্যধারা—মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী—ইহারা পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ও একের রীতি-বৈশিষ্ট্য অপরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যেরূপ মঙ্গলকাব্যের, বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতারা—যেমন দ্বিজ মাধব ও রামদেব—কৃষ্ণলীলার কথা মনে রাখিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করেন ও সুযোগ পাইলেই আখ্যায়িকার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের ফাঁকে ফাঁকে গীতি-কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস প্রবেশ করাইয়াছেন—সেইরূপ মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পুরাণ ও ভাগবতের অনুবাদসমূহকে কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয় ও কৃষ্ণের মহিমা-প্রকাশই যে ইহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য তাহা ঘোষিত হয়। চৈতন্যলীলা-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই লীলার যে মূল উৎস ভাগবত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী—তাহার প্রতি বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, ও ভাগবতের অনুবাদ চৈতন্য-প্রেমধর্মের পরিপোষকরূপে অধিক-সংখ্যায় রচিত হইতে থাকে। মাধব আচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, দেবকীনন্দন সিংহের গোপালবিজয়, রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল এই অনুবাদপ্রবণতার উদাহরণ। ভাগবতের তত্ত্ব ও কাহিনী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে গিয়া এই লেখকগোষ্ঠী শুধু যে দেশে পৌরাণিক চেতনা বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা নহে, কৃষ্ণলীলার ব্যাপক পরিচয়ের মধ্য দিয়া পদাবলীর রসাস্বাদনে সহায়ক হইয়াছিলেন এবং কাহিনীর সূক্ষ্ম ও বাঙালী-রুচিসম্মত রূপান্তরের দ্বারা বাংলা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি ও বাঙালীর রসানুভূতির দৃঢ়ীকরণও সাধন করিয়াছিলেন।

ভাগবতের অনুবাদ

অবশ্য ভাগবতের প্রথম অনুবাদ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) প্রাক্‌চৈতন্য যুগের রচনা। চৈতন্যদেব এই গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে তাঁহার যে আদর্শ ও অনুভূতি ছিল তাহার পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন ও ইহার একটি পংক্তির—"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"—জন্য গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের গ্রামবাসী সমস্ত ব্যক্তিকেই উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাইয়াছেন। চৈতন্যযুগের পূর্বে কোনও ভক্তের পক্ষে রাধিকা-ভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণকে মধুর রসের বিগ্রহরূপে উপলব্ধি

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

করা ও তাঁহাকে দয়িত সম্বোধন করা এতই অসাধারণ ছিল যে, চৈতন্যদেব ইহার দ্বারা অভিভূত না হইয়া পারেন নাই। ইহা ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে বাল্য ও কৈশোর লীলা বর্ণিত আছে, যাহার মধ্যে তাঁহার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয় গুণেরই প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহার আক্ষরিক নহে, ভাবানুবাদ। অবশ্য যে আকারে এই গ্রন্থটি আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে চৈতন্যোত্তর যুগের প্রচুর ভাব-প্রক্ষেপ ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ কীর্তন-মাহাত্ম্যের যে সুবিস্তৃত বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায় তাহা চৈতন্য-পূর্ব যুগের ভক্তিবাদের যথাযথ প্রকাশ বলিয়া মনে হয় না। চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই যে ভাগবতের অনুবাদের সূচনা হয় ইহাতে প্রমাণিত হয় যে জয়দেব-বিদ্যাপতির মধুর পদাবলীর প্রেরণাতেই লৌকিক ভাষায় ভাগবততত্ত্ব ও কাহিনী জনসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল—ফলের রসমাধুর্য হইতেই রসবাহী মূলের পরিচয়-গ্রহণের কৌতূহল জাগিয়াছিল।

চৈতন্য-প্রভাবে বাঙালীর মানসক্ষেত্রে যে সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহারই ফলে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম তথ্যানুস্মৃতি ও ইতিহাস-চেতনার উন্মেষ দেখা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র-মাধুর্য ও দিব্যলীলা-প্রকটনের দ্বারা জাতির মনে এরূপ গভীর রেখাপাত করেন যে এযাবৎ ইতিহাস-বিমুখ বাঙালী তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী ও অলৌকিক অনুভূতিসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রেরণা লাভ করে। অবশ্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে—বেদ, উপনিষদ ও পুরাণগুলিতে—প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার প্রচ্ছন্ন নিদর্শন যে পাওয়া যায় তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ধর্মগত উদ্দেশ্যের এত প্রাধান্য, ধর্ম-চেতনার প্রলেপ এত ঘন, ও এই আখ্যানগুলি সূত্র-বিচ্ছিন্ন হইয়া এরূপ একক ভাবে আমাদের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে যে ইহারা যুগের ব্যাপক পরিচয় বহন করে না। সেইজন্য বলা যায় যে চৈতন্য ও তাঁহার মুখ্য পরিকরবৃন্দের জীবন-চরিতই বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক চিত্রাঙ্কনের প্রথম প্রয়াস। অবশ্য সে যুগের ইতিহাসবোধকে বর্তমান যুগের আদর্শে বিচার করা চলে না। চৈতন্য-জীবনীকারদের নিকট চৈতন্যের অলৌকিক লীলাবিলাস ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষাও অধিক বাস্তব ছিল এবং এইগুলির বর্ণনার সময় তাঁহাদের ভক্তির উচ্ছ্বাস ও কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ বাস্তব সীমার মর্যাদারক্ষার প্রয়োজনকে একেবারেই স্বীকার করে নাই। তা ছাড়া

চৈতন্য-জীবনীতে ঐতিহাসিক সত্য-নির্দেশ

ভক্তের মনোভূমিতে যাহা স্ফুরিত হয় তাহা যে বাস্তব সংঘটনের অপেক্ষা অধিক সত্য, এ বিষয়ে তাঁহাদের সংশয়াতীত প্রতীতি ছিল। সেইজন্য চৈতন্য-জীবনী-কারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের মুখে যে সমস্ত তত্ত্বালোচনা আরোপ করিয়াছেন তাহা সব সময় বস্তুগত তথ্য হয় নাই, কিন্তু উচ্চতর ভাবসত্যের অনুসরণ করিয়াছে। প্রেমধর্মের স্বরূপ-নির্ণয়-ব্যাপারে শ্রীমহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের যে সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল—যাহা সাধ্যসাধন-তত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়াছে—তাহা সত্য সত্যই গ্রন্থবর্ণিত পদ্ধতিতে ও কালে ঘটিয়াছিল, অথবা উহা সুবিদিত চৈতন্য-প্রেমতত্ত্ব-বিচারের একটা ভক্তকল্পনাপ্রসূত বিবরণ ও অনেক দিন ধরিয়া যে টুকরা টুকরা তর্ক চলিয়াছিল তাহারই একটি সুসংবদ্ধ সার-সঙ্কলন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু এই বিবরণের মধ্যে যেটুকু নিশ্চিত সত্য তাহা এই যে রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই প্রেমধর্মের রহস্য জানিতেন ও চৈতন্যদেব তাঁহার নিকট নিজ অনুভূতির শেষ সীমা উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহার পূর্বজ্ঞানকে দৃঢ়তর করিলেন ও তাঁহাকে সাধন-পথে চূড়ান্ত নির্দেশ দান করিলেন। সেইরূপ চৈতন্যের কণ্ঠে যে সমস্ত গান আরোপিত হইয়াছে সেগুলি হয়ত তাঁহার সময় রচিতই হয় নাই, কিন্তু তাঁহার তদানীন্তন ভাবপ্রকাশের সুষ্ঠু উপায়স্বরূপই নির্বাচিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে যে সমাজচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা প্রেমধর্মের অনুকূল প্রতিবেশ-রূপেই গ্রহীতব্য। তাহাতে হয়ত সমাজের সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যায় না, কিন্তু যুগের ধর্মপিপাসার স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়। এইরূপ বিচারের মানদণ্ডে চরিত-কাব্যগুলির ঐতিহাসিকতা ও তথ্যগত ভিত্তি নিরূপণ করিতে হইবে।

চৈতন্যদেবের যে কয়খানি জীবনী লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত, কবি কর্ণপূরের মহাকাব্য চৈতন্যচরিতামৃত (১৫৪২) ও নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয় (১৫৭২) উল্লেখযোগ্য। মুরারি গুপ্ত বোধ হয় চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই ও কবি কর্ণপুর তাঁহার তিরোধানের দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের চরিতগ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। সমসাময়িক সুহৃদ্ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত-পরিকরের দ্বারা লিখিত হইলেও এই গ্রন্থগুলি সংস্কৃত রীতির অনুবর্তনের জন্য চৈতন্যের মানবিক জীবনের বস্তুরসপ্রধান পরিচয় দেয় না; বরং তাঁহার অবতারত্ব-প্রতিষ্ঠার অত্যুৎসাহে ইহারা অলৌকিক উপাদানেই পরিপূর্ণ। চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব এত দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে তাঁহার নিকটতম

সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্য-জীবনী

প্রতিবেশীরাও তাঁহাকে ঠিক মানুষ হিসাবে দেখিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার জীবনের বাস্তব-তথ্য-নির্ণয়ের জন্য আমাদের যে স্বাভাবিক কৌতূহল তাহাও তাঁহারা পূর্ণ করেন নাই। ইহারা প্রধানতঃ চৈতন্য-জীবনে কৃষ্ণলীলার সাদৃশ্য আরোপ করিতে উন্মুখ ছিলেন এবং তাঁহাদের মহাকাব্যকে যতদূর সম্ভব ভাগবতের ছাঁচে ঢালিয়াছেন। বরং তাঁহার বাংলা ভাষায় রচিত জীবনীগুলিতে অলৌকিকের দিব্য জ্যোতির অন্তরালে তাঁহার মানবিক পরিচয় অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। বাংলা ভাষা দেব-ভাষার ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্যকে একেবারে আবৃত করিতে পারে নাই। তবে মুরারি গুপ্ত ও কর্ণপুর যে ভবিষ্যৎ জীবন-চরিতকারদের পথপ্রদর্শক ও তাঁহাদের বর্ণনাভঙ্গী ও মনোভাব অনেক পরিমাণে নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ।

বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবনের প্রথমার্ধ ভক্তিরস, কাব্যকুশলতা ও তথ্যপ্রাচুর্যের সঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে চৈতন্য-জীবনীর সন্ন্যাসোত্তর অংশ, তাঁহার নীলাচল-লীলার অপরূপ দিব্যোন্মাদ-কাহিনী বর্ণিত হয় নাই। চৈতন্যভাগবত প্রধানতঃ সরস আখ্যায়িকা-মূলক—ইহাতে চৈতন্য-ধর্মতত্ত্বের বিশেষ আলোচনা নাই। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপ অঞ্চলের ধর্মজীবন ও সমাজযাত্রার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক তথ্যরূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলো-দ্দীপক। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

চৈতন্যভাগবত

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
যক্ষ পূজা করে কেহ নানা উপচারে।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ও পূজাপদ্ধতি প্রাক্‌চৈতন্য যুগেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ও নানা অনার্য ভৌতিক দেবতা-সমূহের আরাধনাও প্রসার লাভ করিয়াছিল। মুসলমান শাসকবৃন্দ কর্তৃক হিন্দু উৎপীড়নের চিত্রও তাঁহার চরিতগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এগুলি চৈতন্যপূর্ব যুগের বাঙলার যে যথাযথ অবস্থার পরিচয় সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীকার বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ আদৃত এবং তাঁহাকে চৈতন্যলীলার ব্যাসদেব—এই গৌরবময় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

পদকর্তা লোচনদাস ও জয়ানন্দ উভয়েই বৃন্দাবন দাসের পরে "চৈতন্যমঙ্গল" নামে জীবনী-কাব্য রচনা করেন। লোচনের কাব্য পাঁচালি-গীত রূপে গীত হইত ও লঘু সুরে রচিত বলিয়া সমাজের নিম্নতর স্তরে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। জয়ানন্দের গ্রন্থখানি বৈষ্ণবদর্শনের সহিত সর্বদা সামঞ্জস্য রক্ষা করে নাই বলিয়া ইহার প্রামাণ্যতা অস্বীকৃত হইয়াছে।

চৈতন্যমঙ্গল

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাসের কড়চা নামে অভিহিত গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব ধর্ম ও আদর্শের প্রবল জনপ্রিয়তার জন্য কিছু কিছু আধুনিক-কল্পনা-প্রসূত রচনাকে প্রাচীন ও ঐতিহাসিক তথ্যমূলক বিবৃতিরূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা হয়। শ্রীচৈতন্যের জীবনের যে অংশ প্রামাণ্য চরিত-গ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সেই-ফাঁক পূরণের জন্য এই জাতীয় কাল্পনিক গ্রন্থ রচিত হয়। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে সেবকরূপে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। এই তথ্য অবলম্বনে তাঁহার নামে এই ভ্রমণের একটি সুখপাঠ্য ও তথ্যবহুল বৃত্তান্ত একখানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থরূপে উনবিংশ শতকে প্রকাশ করা হয়। এই গ্রন্থে চৈতন্যভাবপরিমণ্ডল ও তাঁহার ভাববিভোর লীলাভিনয়ের যথাযথ অনুস্মৃতি আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক আধুনিক স্থানের উল্লেখ ও পরবর্তী যুগের ভাব-প্রক্ষেপ ইহার প্রামাণ্যতাকে সন্দেহভাজন করিয়াছে। সেইরূপ অদ্বৈত আচার্যের ও তাঁহার পত্নী সীতাদেবীর কয়েকখানি জীবনীগ্রন্থ—ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল ও বিষ্ণুদাস আচার্যের সীতাগুণকদম্ব—তথ্য ও কল্পনায় মিশ্রিত, শিষ্য কর্তৃক নিজ গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে অতিরঞ্জনস্ফীত, অনুকরণপ্রয়াসী রচনাপদ্ধতি ও মনোভাবের সাক্ষ্য প্রদান করে।

গোবিন্দদাসের কড়চা ঐতিহাসিকতা

চৈতন্যজীবনীকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্যচরিতামৃত-এর রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এই গ্রন্থখানি চৈতন্যলীলার বাঙ্ময় বিগ্রহরূপে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সমাজে পূজিত হইয়া আসিতেছে। মহাপ্রভুর জীবনের শেষার্ধ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহা কেবল ঘটনামূলক তথ্যসঙ্কলন নহে। ইহাতে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ও অধ্যাত্ম আদর্শ গভীর মনীষা, ভক্তিপরায়ণতা ও অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও কাব্যকুশলতার এরূপ আশ্চর্য সমন্বয় জগতের যে-কোনও ধর্মগ্রন্থে বিরল। কৃষ্ণদাস তাঁহার বিষয়-গৌরবের দ্বারা এরূপ আবিষ্ট ছিলেন যে তিনি সচেতনভাবে কাব্যসৌন্দর্যসৃষ্টির দিকে একেবারেই মনোযোগ দেন নাই।

চৈতন্যচরিতামৃত

প্রতিবেশীরাও তাঁহাকে ঠিক মানুষ হিসাবে দেখিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার জীবনের বাস্তব-তথ্য-নির্ণয়ের জন্য আমাদের যে স্বাভাবিক কৌতূহল তাহাও তাঁহারা পূর্ণ করেন নাই। ইঁহারা প্রধানতঃ চৈতন্য-জীবনে কৃষ্ণলীলার সাদৃশ্য আরোপ করিতে উন্মুখ ছিলেন এবং তাঁহাদের মহাকাব্যকে যতদূর সম্ভব ভাগবতের ছাঁচে ঢালিয়াছেন। বরং তাঁহার বাংলা ভাষায় রচিত জীবনীগুলিতে অলৌকিকের দিব্য জ্যোতির অন্তরালে তাঁহার মানবিক পরিচয় অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। বাংলা ভাষা দেব-ভাষার ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্যকে একেবারে আবৃত করিতে পারে নাই। তবে মুরারি গুপ্ত ও কর্ণপুর যে ভবিষ্যৎ জীবন-চরিতকারদের পথপ্রদর্শক ও তাঁহাদের বর্ণনাভঙ্গী ও মনোভাব অনেক পরিমাণে নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ।

বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত। এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবনের প্রথমার্ধ ভক্তিরস, কাব্যকুশলতা ও তথ্যপ্রাচুর্যের সঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে চৈতন্য-জীবনীর সন্ন্যাসোত্তর অংশ, তাঁহার নীলাচল-লীলার অপরূপ দিব্যোন্মাদ কাহিনী বর্ণিত হয় নাই। চৈতন্যভাগবত প্রধানতঃ সরস আখ্যায়িকা-মূলক—ইহাতে চৈতন্য-ধর্মতত্ত্বের বিশেষ আলোচনা নাই। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপ অঞ্চলের ধর্মজীবন ও সমাজযাত্রার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক তথ্যরূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলো-দ্দীপক। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

চৈতন্যভাগবত

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
যক্ষ পূজা করে কেহ নানা উপচারে।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ও পূজাপদ্ধতি প্রাক্‌চৈতন্য যুগেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ও নানা অনার্য ভৌতিক দেবতা-সমূহের আরাধনাও প্রসার লাভ করিয়াছিল। মুসলমান শাসকবৃন্দ কর্তৃক হিন্দু উৎপীড়নের চিত্রও তাঁহার চরিতগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এগুলি চৈতন্যপূর্ব যুগের বাঙলার যে যথাযথ অবস্থার পরিচয় সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীকার বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ আদৃত এবং তাঁহাকে চৈতন্যলীলার ব্যাসদেব—এই গৌরবময় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

পদকর্তা লোচনদাস ও জয়ানন্দ উভয়েই বৃন্দাবন দাসের পরে "চৈতন্যমঙ্গল" নামে জীবনী-কাব্য রচনা করেন। লোচনের কাব্য পাচালি-গীত রূপে গীত হইত ও লঘু সুরে রচিত বলিয়া সমাজের নিম্নতর স্তরে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। জয়ানন্দের গ্রন্থখানি বৈষ্ণবদর্শনের সহিত সর্বদা সামঞ্জস্য রক্ষা করে নাই বলিয়া ইহার প্রামাণ্যতা অস্বীকৃত হইয়াছে।

চৈতন্যমঙ্গল

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাসের কড়চা নামে অভিহিত গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব ধর্ম ও আদর্শের প্রবল জনপ্রিয়তার জন্য কিছু কিছু আধুনিক-কল্পনা-প্রসূত রচনাকে প্রাচীন ও ঐতিহাসিক তথ্যমূলক বিবৃতিরূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা হয়। শ্রীচৈতন্যের জীবনের যে অংশ প্রামাণ্য চরিত-গ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সেই-ফাঁক পূরণের জন্য এই জাতীয় কাল্পনিক গ্রন্থ রচিত হয়। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে সেবকরূপে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। এই তথ্য অবলম্বনে তাঁহার নামে এই ভ্রমণের একটি সুখপাঠ্য ও তথ্যবহুল বৃত্তান্ত একখানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থরূপে উনবিংশ শতকে প্রকাশ করা হয়। এই গ্রন্থে চৈতন্যভাবপরিমণ্ডল ও তাঁহার ভাববিভোর লীলাভিনয়ের যথাযথ অনুস্মৃতি আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক আধুনিক স্থানের উল্লেখ ও পরবর্তী যুগের ভাব-প্রক্ষেপ ইহার প্রামাণ্যতাকে সন্দেহভাজন করিয়াছে। সেইরূপ অদ্বৈত আচার্যের ও তাঁহার পত্নী সীতাদেবীর কয়েকখানি জীবনীগ্রন্থ—ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল ও বিষ্ণুদাস আচার্যের সীতাগুণকদম্ব—তথ্য ও কল্পনায় মিশ্রিত, শিষ্য কর্তৃক নিজ গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে অতিরঞ্জনস্ফীত, অনুকরণপ্রয়াসী রচনাপদ্ধতি ও মনোভাবের সাক্ষ্য প্রদান করে।

গোবিন্দদাসের কড়চা ঐতিহাসিকতা

চৈতন্যজীবনীকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্যচরিতামৃত-এর রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এই গ্রন্থখানি চৈতন্যলীলার বাঙ্ময় বিগ্রহরূপে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সমাজে পূজিত হইয়া আসিতেছে। মহাপ্রভুর জীবনের শেষার্ধ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহা কেবল ঘটনামূলক তথ্যসঙ্কলন নহে। ইহাতে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ও অধ্যাত্ম আদর্শ গভীর মনীষা, ভক্তিপরায়ণতা ও অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও কাব্যকুশলতার এরূপ আশ্চর্য সমন্বয় জগতের যে-কোনও ধর্মগ্রন্থে বিরল। কৃষ্ণদাস তাঁহার বিষয়-গৌরবের দ্বারা এরূপ আবিষ্ট ছিলেন যে তিনি সচেতনভাবে কাব্যসৌন্দর্যসৃষ্টির দিকে একেবারেই মনোযোগ দেন নাই।

চৈতন্যচরিতামৃত

বাংলা পয়ারের শিথিল অঙ্গবিন্যাসের মধ্যে ও এই অচিরজাত ভাষার অপরীক্ষিত শক্তি-প্রয়োগে, তিনি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ববিচারে ও নিজ মতবাদপ্রতিষ্ঠায় এরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন যে ইহা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। শ্রুতিকর্কশ পারিভাষিক শব্দসমূহ তিনি এমন অবলীলাক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার গভীর নিষ্ঠা ও প্রত্যয়ের বেগবান স্রোতে এই ওজনে ভারী কথাগুলি এমন স্বচ্ছন্দগতিতে ভাসিয়া গিয়াছে, যে ইহাদের মধ্যে যে কোন বিসদৃশতা আছে তাহা আমাদের লক্ষ্যগোচরই হয় না। মনে হয় যে তাঁহার প্রকৃতি-ধর্ম কবিত্বের অনুকূল ছিল না ; কিন্তু যে দৈবী কৃপা মূককে বাচাল করে, তাহার প্রতি একান্ত-নির্ভর আত্মসমর্পণই তাঁহার অন্তর্লীন কবিত্বকে স্ফুরিত করিয়াছে। চৈতন্যদেবের যে প্রেমবিহ্বল, ভাবতন্ময় রূপটি এই মহাগ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই ভক্ত ও কাব্যরসিকের অনুভূতিতে চিরকালের জন্য যেন পাষাণরেখাঙ্কিত হইয়াছে। কাব্যের চকিত বিকাশ, ভক্তির ক্ষণিক উচ্ছ্বাস দার্শনিকতার এই স্থির আধারে চিরন্তন আশ্রয় লাভ করিয়া বৈষ্ণবধর্মের আবেদনকে শাশ্বত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

৪

বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবনীকাব্য-চতুষ্টয়ের তুলনা করিলে প্রত্যেকেরই একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও নির্মিতি-কৌশল লক্ষ্য করা যায়। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের অতিসন্নিহিত কালবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার অলৌকিক ঐশীরূপ প্রতিষ্ঠা করিতেই অত্যন্ত আগ্রহশীল। সুতরাং তাঁহার তথ্যপ্রাচুর্যপরিবেশনের মধ্যেও চৈতন্যের মানবিক সত্তাটি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। কৃষ্ণলীলার সহিত চৈতন্যলীলার অভিন্নত্ব-প্রতিপাদনে তিনি এতই নিবিষ্টচিত্ত যে তাঁহার সমস্ত উপমা-প্রয়োগ এই উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত। কৃষ্ণ ও রামলক্ষ্মণের সহিত সাদৃশ্য-আরোপ ছাড়া তিনি চৈতন্যলীলাবর্ণনার উপযোগী আর কোন জাতীয় উপমান খুঁজিয়া পান নাই। কাজেই তাঁহার তথ্য-সঞ্চয়নের মুকুরে অপার্থিব ব্যঞ্জনার বাষ্পাবরণ এত ঘনবিন্যস্ত হইয়াছে যে উহাতে চৈতন্যদেবের মানবিক রূপটির পরিবর্তে তাঁহার অতিকায় ভগবৎমহিমাস্ফীত মুখাবয়বটি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাসের অধ্যাত্মতত্ত্ববিগ্রহ-মূর্তির স্থলে তিনি এক অতিমানবিক, অলৌকিক লীলারহস্যময় দেবমূর্তিই অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার দুইটি-উপমায় শিল্পীজনোচিত রূপচেতনার স্ফুরণ দেখা যায়।

চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর দেবমূর্তি

লিখন কালীর বিন্দু শোভে গৌর-অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে॥
(আদিখণ্ড-৪র্থ অধ্যায়)

এখানে গৌরাঙ্গের পড়ুয়ারূপটি কালির ছিটায় মলিন হইয়াও কবির রূপাবিষ্ট দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে অধ্যাত্ম মহিমার ক্ষীণ ব্যঞ্জনা থাকিলেও লোকজীবনের তাজা গন্ধ সমস্ত ভাবমণ্ডলকে সুবাসিত করিয়া তুলিয়াছে।

পরম অদ্ভুত সভে দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকাগণে যেন অন্ন খায় লৈয়া॥
এইমতে প্রভুকে অনেক লোক ধরি।
লইয়া যাহেন সভে মহানন্দ করি॥
(অন্ত্য খণ্ড—২য় অধ্যায়)

লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'—এ চৈতন্যের মানবীয় রূপটি কিছুটা অতিরঞ্জনমুক্ত হইয়া সহজভাবে প্রকাশিত। মহাপ্রভুর বাল্যলীলা মাতৃমমতামণ্ডিত হইয়াই তাঁহার জীবনী-কাব্যে বর্ণিত। চৈতন্যের রূপ ও গুণ লোচনের কবিচেতনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া পাঠকমনে শিল্পরমণীয়তার সঞ্চার করিয়াছে।

লোচন দাসের সহজ মানবীয়তা

চৈতন্যের রূপবর্ণনায় পদাবলী-সাহিত্যের কোমল অনুভূতি ও উচ্ছ্বসিত রূপমুগ্ধতা মাঝে মধ্যে নিবিড় ভাবাবেশ সৃষ্টির হেতু হইয়াছে। চৈতন্যলীলাকে এক সৌন্দর্যময় পরিবেশে স্থাপন ও মানবীয় ভাবমণ্ডিত করার প্রয়াস লোচনের কাব্যে কিছুটা লক্ষিত হয়। ইহার সঙ্গে লঘু ছড়ার ছন্দের প্রয়োগ ও গৌরাঙ্গ-নাগরীভাবের প্রবর্তন গৌরাঙ্গের লোকোত্তর জীবনের জন-আবেদন অনেকাংশে বাড়াইয়াছে। এই সমস্ত দিক্ দিয়া লোচনের চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যের মানবিকতা ও কাব্যসৌন্দর্য-মিশ্রিত একটি ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ প্রধানতঃ ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে চৈতন্যজীবন-চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস। ভক্তির প্রবল আবেগই কবির রূপনির্মাণের প্রেরণা যোগাইয়াছে। চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ-উপলক্ষ্যে তাঁহার মস্তকমুণ্ডন কবির মনে যে অপূর্ব ভাবোন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই তাঁহার কাব্যদেহে ক্ষণিক লাবণ্য-রোমাঞ্চ জাগাইয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্য-বর্ণনায় কবি যে করুণ রসের উদ্দীপন করিতে চাহিয়াছেন তাহা বৈষ্ণবতত্ত্বের সমর্থনহীনতায় আত্মপ্রত্যয়ের

স্থিরতা হারাইয়াছে। সুতরাং জয়ানন্দের জীবনীকাব্য নিজের দৃঢ় প্রতীতি ও বৈষ্ণব জগতের অনুমোদন এই উভয়বিধ আশ্রয়ের মধ্যে সংশয়াচ্ছন্ন ভাবে আন্দোলিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিতগ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মনোভাবপ্রসূত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী বিশুদ্ধ অধ্যাত্মতত্ত্বের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদাসের মনে মানব শ্রীচৈতন্যের বিশেষ কোন আবেদন নাই। তাঁহার তত্ত্বাবিষ্ট মন চৈতন্যজীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার বস্তুরসকে গৌণ করিয়া উহার দার্শনিক তাৎপর্য ও অধ্যাত্ম ভাবানুরঞ্জনকে প্রধানরূপে দেখিয়াছে। চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদের বিবরণেও তিনি তাঁহার প্রাচীনশাস্ত্রানুগত ভগবৎ-স্বরূপের লীলাবিলাসই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার উপমা-অলঙ্কার-প্রয়োগে রূপরস অপেক্ষা অমূর্ত মননক্রিয়ারই প্রাধান্য, সৌন্দর্যসৃষ্টি অপেক্ষা বিশুদ্ধ ভাবসত্যের ইঙ্গিতের প্রতিই অধিক মনোযোগ। অপূর্ব চৈতন্যলীলা ভক্তের চিত্তে যে বিপুল ভাবোচ্ছ্বাস, যে আত্মহারা আবেগমত্ততার ঘূর্ণী-চক্র উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিল, কৃষ্ণদাসের মনে তাহার ঢেউ দোলা দিয়াছে। কিন্তু এই ভক্তিবিহ্বলতায় আত্মসমর্পণই তাঁহার চরম মানস প্রতিক্রিয়া নহে। তিনি দৃঢ় দার্শনিক মননের তটভূমিতে এই আবেগ-উদ্বেলতাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার মহাগ্রন্থে চৈতন্যতত্ত্বের যে প্রশান্ত, চিরন্তন রূপটি নির্মাণ করিয়াছেন তাহা সমস্ত আকুল, অধীর ভাবোৎক্ষেপের উর্ধ্বে শাশ্বত স্থির উপলব্ধির উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান।

কৃষ্ণদাসে দার্শনিকতা ও অধ্যাত্মতত্ত্ব

পদাবলী-সাহিত্যে রূপের যে অজস্রপ্রবহমানতা ও ভাবের যে অশ্রান্ত, পৌনঃপুনিক রোমন্থন ঈশ্বরতত্ত্বকে রসে পরিণত করিয়াছে, সুদূর ভগবৎরূপের উপর মানব প্রেমের অন্তরঙ্গ নৈকট্য আরোপ করিয়াছে, কৃষ্ণদাসে তাহারই বিপরীত প্রক্রিয়াটি লক্ষ্যগোচর হয়। তাঁহার দার্শনিক অভিপ্রায় রূপোজ্জ্বল ও রসঘন দেববিগ্রহের বহির্মণ্ডলকে অন্তর্লোকে সংহরণ করিয়াছে, তাত্ত্বিক অনুভবকে সৌন্দর্যের সর্বগ্রাসী অভিভব হইতে উদ্ধার করিয়া উহাকে নিজ অন্তর্নিহিত সুষমায় ও স্বরূপ-লাবণ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যে ভাবসত্য রূপকের অত্যধিক প্রয়োগে ও মানবিক রসের অবিরল অভিসিঞ্চনে নিজ সত্তার সুস্পষ্টতা হারাইতে বসিয়াছিল, কৃষ্ণদাসের জীবনীকাব্যে তাহাই আপনার ছদ্মপ্রসাধন ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার নিজস্ব গৌরবে প্রতিভাত হইল।

অথচ শঙ্খের মধ্যে সমুদ্র-স্বননের ন্যায়, গীতার শ্লোকের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের ক্ষণিক-স্তব্ধ সৈন্যকোলাহলের ন্যায়, কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই ভাবনিয়ন্ত্রিত চৈতন্যতত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার অন্তরালে পদাবলী-সাহিত্যের সমস্ত সঙ্গীত-মূর্ছনা, রূপোন্মাদ ও আবেগ-কল্লোল নিঃশব্দে আত্মগোপন করিয়া আছে। বৈষ্ণবপদাবলী যদি ভাব হইতে রূপে নিষ্ক্রমণ হয়, তবে কৃষ্ণদাসের চৈতন্যতত্ত্ব রূপের বহুবিসর্পিত প্রসার হইতে ভাবের কেন্দ্রবিন্দুতে নিগূঢ় গুহাপ্রবেশ। রূপের মোহ ও রসের আবেদন যদি কখনও বাঙালীর অনুভব-শক্তিকে উদ্রিক্ত করিবার ক্ষমতা হারায়, তখন এই দৃঢ় মনন-প্রতিষ্ঠিত, দার্শনিক-ভাবনা-নিরূপিত অধ্যাত্ম তত্ত্ব উহার শাশ্বত প্রত্যয় লইয়া আমাদের অন্তর্লোকে স্থির আলোকস্তম্ভের ন্যায় প্রোজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

৫

চৈতন্যোত্তর ভাগবত-কাহিনী

রামায়ণ-মহাভারতের সহিত তুলনায় বাঙালী মনে ভাগবত-কাহিনীর আকর্ষণ একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উৎস ও ভাবাদর্শের দার্শনিক আশ্রয়রূপে ভাগবত-প্রভাব বাঙালী সমাজে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের মত ভাগবত-কথা বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত জীবন-সংস্কারে পরিণত হয় নাই। চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমভক্তিধর্মে দীক্ষিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ তাহাদের ভাববিহ্বলতার পোষক তত্ত্বসমর্থনলাভের জন্য ভাগবত-পাঠের প্রেরণা পান। ভাগবতের রাধাকৃষ্ণপ্রেমাত্মক রসতত্ত্ব সমসাময়িক বৈষ্ণবগোষ্ঠী ইতিপূর্বেই শ্রীচৈতন্যলীলাবিলাসের মাধ্যমে আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যে অপরূপ রসমাধুরীময় দিব্য নাটক অভিনীত হইতেছিল তাহার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণের বিশেষ আবশ্যক ছিল না। যাঁহারা ভাবতন্ময় গোরাকে দেখিয়া বা তাঁহার অপার্থিব রসবিভোরতার কথা শুনিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছিলেন তাঁহারা ভাগবতে বিবৃত কৃষ্ণপ্রেমলীলাকাহিনীর মধ্যে পরিচিত বিষয়ের ভাবোন্নয়নমহিমা অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু ঘটনার নূতনত্ব তাঁহাদের মনে বিশেষ কোন রেখাপাত করে নাই। রামায়ণ-মহাভারতের সরল আখ্যানসমূহ যেমন প্রাকৃত জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছে, তেমনি ইহাদের মাধ্যমে প্রচারিত ভক্তিবাদ সমস্ত তত্ত্বসীমা উত্তীর্ণ

ভাগবতের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য-

হইয়া এক স্বতঃস্ফূর্ত সুনিবিড় অধ্যাত্মপ্রত্যয়াবেশে তাহাদের চিত্তকে রসাপ্লুত করিয়াছে। ভাগবতে কাহিনীর আবেদন গৌণ ও তত্ত্বের আবেদন মুখ্য বলিয়া ইহা প্রধানতঃ পণ্ডিতসমাজের অনুশীলনের বিষয় হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ জনসাধারণ ভাগবতের বঙ্গানুবাদের রসাস্বাদনশক্তি অর্জন না করিয়া পণ্ডিতের মৌখিক ভাষণ ও ব্যাখ্যার উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছে। ইহার এক পরোক্ষ ফল হইয়াছে এই যে ভাগবতের কোন অনুবাদ কৃত্তিবাস-কাশীরামের অনুবাদ-গ্রন্থের মত ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও জাতীয় মর্যাদা লাভ করে নাই। সুতরাং ভাগবতের অনুবাদকার্যে কবিগণ বাঙালী মনোধর্ম ও জীবনরুচির আদর্শে মূলের সামগ্রিক রূপান্তরীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। তাঁহারা মূলের অনেকটা যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন ও উহার তত্ত্বপ্রাধান্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভাগবতের দুরূহ অধ্যাত্মতত্ত্বের লোকায়ত, রুচিকর, সরল সংস্করণ পূর্বেই পদাবলীসাহিত্য ও চৈতন্যজীবনীর মাধ্যমে অনেকটা সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া উহার অনুবাদে আর সর্বজনবোধ্যতা ও রসতারল্যের আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ভাগবতের অনুবাদ অচিরোদ্ভূত বাংলা ভাষার শক্তিপরীক্ষার এক নূতন ক্ষেত্র রচনা করিল।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' চৈতন্যপূর্ব যুগের রচনা ও অনুবাদ-শাখার প্রথম প্রয়াস। ইহাতে চৈতন্যদেবের যে আসন্ন আবির্ভাব সমস্ত বাতাবরণকে প্রতীক্ষা-চঞ্চল করিয়াছিল তাহার পূর্বাভাসটি পরোক্ষভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি গীতিমূর্ছনার সুরে সুরে, ভাবমুগ্ধতার নিবিড় আবেশে যে দিব্য প্রেমের লীলা কীর্তন করিয়াছেন, মালাধর তাহারই তথ্য ও দর্শনভাবনামূলক ভূমিকা যোগাইয়াছেন। ইহারা সকলে মিলিয়া চৈতন্যধর্মের ভাবভূমি রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর যুগে ভাগবতের অনুবাদকবৃন্দ—মাধবাচার্য, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, কৃষ্ণদাস ও দুঃখী শ্যামদাস—কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলার সম্মিলিত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ক্রমবর্ধমান উদ্বেলতাকে উচ্চতর তত্ত্ববেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে উহার চৈতন্যতত্ত্বে রূপান্তর শুধু অত্যুচ্ছ্বাসময় ভাববিলাসের পর্যায় হইতে প্রকৃত জ্ঞানমূলক সত্যবোধে উন্নীত হইবে ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তাঁহারা কেবল আখ্যানভাগের বিবরণে সন্তুষ্ট হন নাই; ভাগবতের গভীরভাবাত্মক, স্বল্পতম কথায় ব্যক্ত দুর্বোধ্য অধ্যাত্ম তত্ত্বকূটসমূহের ভাষান্তরের প্রতিও মনোযোগ দিয়াছেন। এই

উভয়-উদ্দেশ্যমূলকতার জন্যই এই অনুবাদগুলির কাব্যোৎকর্ষ ও ভাবপ্রকাশিকা শক্তির সামর্থ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের সহিত সহযোগিতায় ইহারা বাংলা কাব্যের দার্শনিক মনন-সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছে।

ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ ও মাধুর্যরূপ উভয় দিকই প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদক কবিরা যদিও দশম স্কন্ধের রাসলীলা প্রভৃতি ভগবানের রসবিলাস-প্রধান লীলার প্রতিই অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহার অসুরসংহাররূপ ঐশ্বর্যশক্তিরও যথাসম্ভব বিস্তৃত পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেন নাই। সুতরাং ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবৎস্বরূপই বাঙালী পাঠকের গোচর হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা

ঐশ্বর্যগুণপ্রধান বর্ণনার মধ্যে উদ্ধবের নিকট বিশ্বরূপপ্রদর্শন, পুতনা ও অঘাসুরের মৃত্যুপূর্ব বীভৎসরূপ, কংসবধ, যুদ্ধচিত্র প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে। সংস্কৃতের গাঢ়বদ্ধ, ব্যঞ্জনাঘন ও ধ্বনিমন্দ্রিত বাক্য-বিন্যাসের তুলনায় বাংলা অনুবাদ অনেকটা লঘু, স্বল্পশক্তি ও নিছক তথ্যবিবৃতিমূলক হইলেও দেবভাষার গাম্ভীর্যের ও তত্ত্বচিন্তার খানিকটা বাংলায় সঞ্চারিত হইয়াছে।

ঐশ্বর্য-বর্ণনা

মাধুর্যরূপবর্ণনায় রাসলীলার ঘন রূপসম্মোহের মধ্যেও মাধবাচার্য দার্শনিক মনের একটু ত্বরিত স্পর্শে সমস্ত বর্ণাঢ্যতার মধ্যে একটা অবাস্তবতার ম্লান ইঙ্গিত দিয়া উহাকে রূপ হইতে অরূপলোকে উন্নীত করিয়াছেন। কৃষ্ণের গোপীদের লইয়া খেলা

মাধুর্য-লীলা

যেন শিশু খেলা করে লৈয়া আপন ছায়া।

কৃষ্ণরূপের সম্মোহন-শক্তিতে স্থাবর-জঙ্গম কিরূপ মন্ত্রমুগ্ধ তাহা বর্ণনা-প্রসঙ্গে মাধবাচার্য বলিতেছেন :—

পল্লব-পুলকে অতি আকুল স্থাবর।
প্রেমেতে শিশিরধারা বহে নিরন্তর॥

রাসলীলার সৌন্দর্য-আবেদন, কৃষ্ণ ও গোপীবৃন্দের বর্ণের পার্থক্য মূলের অনুসরণে প্রথাবদ্ধ উপমা-প্রয়োগে ব্যক্ত হইয়াছে। এইসব স্থলে উপমার অভিনব ঔচিত্য অপেক্ষা শব্দের কোমল ধ্বনিই মোহ-পরিমণ্ডল-রচনায় সহায়তা করিয়াছে।

কৃষ্ণের মথুরাগমন জন্য গোপীদের বিরহবেদনাদ্যোতনায় মাধবাচার্য বৈরাগ্য ও মৃত্যুসূচক ভাবের অবতারণা করিয়াছেন।

বিবেকী গৃহস্থ যেন লড়ে দূর দেশে।
দেহ ছাড়ি চলে যেন পরাণ-পুরুষে ॥

নিসর্গবর্ণনায় মূল ভাগবত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মাঝে মধ্যে কোন বিশেষ ঋতুতে প্রকৃতিপরিবেশের রূপ-পরিবর্তন ভাগবতকারকে রূপক-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

মার্গাঃ বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণাচ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব ॥

বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন অপরিষ্কৃত পথ সন্দেহের বিষয় হইয়াছে—কালের প্রতিকূলতায় ব্রাহ্মণ কর্তৃক অপঠিত বেদের মত। এই অর্থঘন শ্লোকটির ভাষান্তরে বিভিন্ন কবি আপন যুগ-প্রতিবেশ, মানস প্রেরণা ও জীবনাভিজ্ঞতা অনুযায়ী যে বিভিন্ন প্রকারের অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে তাঁহারা কেহই এই চমৎকৃতিময় রচনাটির দীপ্তি-চমকটি ঠিকমত ধরিতে পারেন নাই। ভাগবতের যুগের বেদ-বিলুপ্তির আশঙ্কা কাহারও নিকট দ্বিজের জাতিগত অধোগতি (মালাধর), কাহারও নিকট কুলীন পণ্ডিতের দারিদ্র্য (কৃষ্ণদাস), কাহারও নিকট বা কলিযুগের অধর্মপ্রবণতা (রঘুনাথ) রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। মোটকথা ভাগবতের মূল অবলম্বনে বিভিন্ন কবি নিজ নিজ স্বাধীন কল্পনাবিকাশ ও জীবন-সমালোচনার প্রেরণা পাইয়াছেন।

অনুবাদে স্বাধীন কল্পনা

ভাগবতের অনুবাদগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই শ্রীচৈতন্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। মাধবাচার্য তাঁহার আত্মীয় ছিলেন ও রঘুনাথের সুললিত ভাগবতপাঠ তিনি পানিহাটি-আগমনের সময় স্বকর্ণে শুনিয়া তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সমস্ত যোগাযোগ হইতে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে ইঁহাদের ভাগবত-আস্বাদন মূলতঃ চৈতন্যলীলা-প্রণোদিত। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বিশেষতঃ কেবল দশম স্কন্ধে স্বীয় ধর্মানুরাগ ও রসরুচি সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি ভাগবতের ৪র্থ, ৫ম স্কন্ধেও নিজ রুচিকর বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন। মনে হয় যে ভাগবতের উপাখ্যানের মধ্যে তিনি বিস্তারিত রূপকার্থপ্রয়োগের অনুকূল অবসর পাইয়াছিলেন ও বাংলা কাব্যে সার্থক রূপকারোপের দ্বারা উহার অর্থগূঢ়তা ও কাব্যসম্ভাবনা অনেকটা বর্ধিত করিয়াছেন।

চৈতন্যলীলার প্রভাব

ভাগবত বাংলা সাহিত্যের মর্মমূলে প্রবেশ না করিয়াও চৈতন্যলীলার সহিত অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্য বাঙালী ধর্ম-চেতনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত

করিয়াছে ও পদাবলীসাহিত্যের প্রেরণা-উৎসের সহিত নিগূঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। বাঙালী জীবনের ভৌগোলিক সংস্থার ন্যায় উহার সাংস্কৃতিক সংস্থায়ও গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিধারা-সঙ্গম ঘটিয়াছে ইহাদের মধ্যে রামায়ণকে প্রসন্নসলিলা গঙ্গা ও মহাভারতকে রহস্য-গভীরা যমুনার সহিত তুলনা করিলে, ভাগবতকে সরস্বতীর অন্তর্হিত ফল্গু-স্রোতোধারার সহিত যথার্থভাবে তুলনা করা যায়।

সংস্কৃতির ত্রিবেণী-ধারা

সপ্তম অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী

১

বৈষ্ণব ভাবধারার কাব্য-প্রকাশ পদাবলীর মাধ্যমে। কয়েকটি ক্ষুদ্র, স্বয়ং-সম্পূর্ণ খণ্ড-কবিতার মালা গাঁথিয়া রাধাকৃষ্ণ ও চৈতন্য-লীলার বিভিন্ন ভাবপর্যায় ও ঘটনা-পরিণতি এই পদাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির উপস্থাপনারীতির চরম বিকাশ ও রস-পরিপূর্ণতা পদাবলী-সাহিত্যে। পদাবলী-রচয়িতারা কৃষ্ণলীলা অনুভব করিয়াছেন চৈতন্যদেবের দিব্য অনুভূতি ও অধ্যাত্ম দর্শনের আলোকে। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের নির্দেশ তাঁহারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণলীলার যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি অলঙ্কার ও মীমাংসা গ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে তাহাই পদাবলী-সাহিত্যের ঘটনা-বিন্যাস ও ভাবধারাকে নিয়মিত করিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্য

বিদ্যাপতির পদে লৌকিক রসেরই প্রাধান্য; উহারই মাঝে মাঝে অধ্যাত্ম তাৎপর্যের স্ফুরণ অনেকটা আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়। বিদ্যাপতি অধিকাংশ স্থলেই রাজসভার বিদগ্ধ কবি। কোথাও কোথাও তিনি সাধক ও ভক্ত কবি। তাঁহার প্রেমলীলাবর্ণনা সর্বদা অধ্যাত্ম অনুশাসনে আবদ্ধ নয়। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের সমস্ত বৈষ্ণব কবি দার্শনিক তত্ত্ব ও ভক্তিবাদের নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা শাসিত; তাঁহাদের সমস্ত কল্পনাবিলাস ও রূপানুরাগের পিছনে এই সদা-জাগ্রত অধ্যাত্ম চেতনার নিয়ন্ত্রণ। তাঁহাদের ভণিতায় বা অন্তিম মন্তব্যে তাঁহারা কোনও না কোনও রূপে দিব্য লীলার সহায়ক রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কেহ বা সখীরূপে, কেহ বা দূতীরূপে, কেহ বা সহানুভূতিশীল দর্শক বা সেবকরূপে প্রেমপরিপুষ্টির কার্যে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির ভণিতায় কেবল তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের প্রকাশ, কিন্তু চৈতন্যোত্তর কবির ভণিতায় তাঁহার ভক্তরূপ, সমস্ত প্রাকৃত বর্ণনার পিছনে প্রচ্ছন্ন ধর্মের ইঙ্গিতের প্রতি তাঁহার সচেতনতা পরিস্ফুট। পদাবলী-সাহিত্যে সমস্ত প্রকৃতি-সৌন্দর্য, মানবিক প্রেমের সমস্ত সুকুমার ভাববিলাস কেবল এক অলৌকিক রস-স্ফুরণের, এক অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম রহস্যের পরিস্ফুটনের উপায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি ও চৈতন্যোত্তর পদাবলী

পদাবলী-সাহিত্যে কৃষ্ণ ও চৈতন্য লীলা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে। কৃষ্ণ-লীলার যে কোন পালাগানের পূর্বে চৈতন্য-জীবনে তাহার সূচক বা অনুরূপ

ভাবকে গৌরচন্দ্রিকারূপে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। নবদ্বীপ-লীলা যে বৃন্দাবনলীলারই পুনরভিনয়, কৃষ্ণের জীবনের প্রধান প্রধান ভাবসমূহ যে শ্রীচৈতন্য-জীবনে নবরূপায়ণ লাভ করিয়াছে, উভয়ের মধ্যে এই অভিন্নত্ববোধই গৌরচন্দ্রিকায় ব্যঞ্জিত হয়। কাজেই চৈতন্যোত্তর কবির চক্ষে কৃষ্ণলীলাবর্ণনার সময় চৈতন্য-লীলা সর্বদাই প্রকট থাকে। চৈতন্যের ভাববিহ্বলতা, রস-আস্বাদন-পদ্ধতি, কীর্তনোল্লাস, ও প্রেমধর্মসাধনার উজ্জ্বল স্মৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ইহারা রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-রহস্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন। যেমন চৈতন্যের মধ্যে ইহারা রাধাকৃষ্ণ-দ্যুতি প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি কৃষ্ণলীলাতেও চৈতন্যলীলাভিনয় আরোপিত হয়। বৈষ্ণব কবির মুগ্ধ অনুভূতিতে যেন দুই জ্যোতিষ্কের আলোক এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। সেইজন্যই পদাবলীর আক্ষরিক, অর্থের পিছনে একটা গভীরতর ভাবব্যঞ্জনা সর্বদা অনুভূত হয়।

গৌরচন্দ্রিকা

পদাবলী-সাহিত্য বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি, বাঙালী জীবনের বিশুদ্ধতম কাব্যময় প্রকাশ। বাঙালীর সমস্ত মধুর ও কোমল অনুভূতি, তাহার রূপমুগ্ধতা ও ভাবতন্ময়তা, তাহার জীবন-দর্শনের স্নিগ্ধ, ভক্তিনির্ভর কমনীয়তা, তাহার ভালবাসার আগ্রহ এই পদগুলির ক্ষুদ্র পরিসরে এক অপরূপ প্রকাশ-সুষমা লাভ করিয়াছে। মনে হয় বাঙালী-হৃদয়ের সবটুকু মধু, উহার অন্তরের সমস্ত সুবাস যেন এই পদ-গুলির মধ্যে কবিরা ঢালিয়া দিয়াছেন। হয়ত ইহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও বৈচিত্র্যের অভাব, একই সুরের পুনরাবৃত্তি আছে; হয়ত জীবন-জটিলতার সম্পূর্ণ পরিচয় ইহাদের মধ্যে মেলে না। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের প্রেমময় মূর্তিতে বিশ্বাসী বা মধুর আত্মনিবেদনেই সমস্ত জীবন-সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পান, তাঁহাদের নিকট পদাবলী-সাহিত্য মানবজীবনের পরম পরিণতি, ভক্তিসাধনার শেষফলরূপে প্রতিভাত হয়।

বাঙালী জীবনের বিশুদ্ধ কাব্যময় প্রকাশ পদাবলী

পদাবলী-রচয়িতা-গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁহারা কালের দিক দিয়া অগ্রবর্তী ছিলেন তাঁহারা প্রায়ই চৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সহচর এবং প্রধানতঃ গৌরলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। নরহরি সরকার, বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব ঘোষ এই তিন ভ্রাতা, বংশীবদন, পরমানন্দ গুপ্ত, রামানন্দ বসু ও মুরারি গুপ্ত—ইহারা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা গৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। মনে হয় যে গৌরাঙ্গের মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়দ্রাবী ভাববিলাস প্রত্যক্ষ করিয়াই এই প্রথম পর্যায়ের কবিরা,

চৈতন্যের সমসাময়িক পদকর্তাগণ

নূতন করিয়া বিদ্যাপতির অনুকরণে পদরচনার প্রেরণা পান, এবং কিছু পরেই চৈতন্যলীলার সীমা অতিক্রম করিয়া উহার ভাব-প্রেরণা যে উৎস হইতে আসে সেই বৃন্দাবনলীলার প্রতি ইঁহারা ক্রমশঃ আকৃষ্ট হন। নরহরি সরকার এই নব-পর্যায়ের পদরচনার আদি স্রষ্টা বলিয়া মনে হয়, কেননা তিনিই প্রথম গৌরাঙ্গ-দেবের লীলা-মাধুরী পদাবলীর মাধ্যমে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বয়সেও বোধ হয় ইনি সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। রায় রায়ানন্দের ব্রজবুলি পদ 'পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল' পদাবলীর একটি প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহাতে শুধু প্রেমের বিরহার্তি নহে, রসতত্ত্বের নিগূঢ় সঙ্কেত সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ বসু, যদুনাথ দাস, বংশীবদন, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কবিসম্প্রদায় গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা, কৈশোর-দুরন্তপনা, সন্ন্যাস-গ্রহণ, শচীবিলাপ প্রভৃতি গৌরাঙ্গ-জীবনীর বিভিন্ন অধ্যায় লইয়া পদরচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই পদে গৌরাঙ্গনাগরলীলাবিষয়ক আখ্যানও কৃষ্ণলীলার অনুকরণে পরিকল্পিত হইয়া উভয় লীলার মধ্যে সংযোগসূত্র রচনা করিয়াছে। নরোত্তম দাসের প্রার্থনা-পদগুলি বৈষ্ণবীয় দীনতা ও আত্ম-ধিক্কারের গভীর প্রভাবচিহ্নিত হইলেও ইহারা বিদ্যাপতির অনুরূপ পদাবলীর ন্যায় এক উদার, সার্বভৌম আত্মনিবেদনের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।

২

দ্বিতীয় যুগে পদাবলী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। এই যুগে বৈষ্ণবধর্ম সাধারণের মধ্যে বিপুল বিস্তৃতি লাভ করে ও প্রেমধর্ম জীবনসাধনার অঙ্গীভূত হয়।

চৈতন্যোত্তর পদাবলীর মূলতত্ত্ব

প্রথম যুগে বৈষ্ণবতত্ত্ব কতকটা প্রতিপাদনের বিষয় ছিল এবং এই তত্ত্বের গন্ধ মাঝেমধ্যে উগ্রভাবে প্রকট হইয়াছে। চৈতন্যের অবতারত্ব ও তাঁহার তাত্ত্বিক রূপনির্ণয়ও কিছু পরিমাণে অনিশ্চয়তাগ্রস্ত ছিল এবং সর্বসাধারণের সহজ স্বীকৃতি লাভ করে নাই। কিন্তু পরবর্তী যুগে যে পদাবলী রচিত হয়, তাহাতে চৈতন্যের দেবত্ব এবং কৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলার অভিন্নত্ব একটা সুগভীর স্বতঃস্ফূর্ত অধ্যাত্ম প্রত্যয়ে দাঁড়াইয়াছে এবং লেখকের অনুভূতিতে ও লেখনীমুখে সহজ-উৎসারিত রসধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে—রস-চেতনার এই পূর্ণ বিকশিত পুষ্প আর তত্ত্বের কণ্টকবিদ্ধ নহে। এখানে কবিত্ব ও ধর্মবিশ্বাস, রূপ ও অরূপ চেতনা, মানবিক প্রেম ও ঐশী ব্যঞ্জনা অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গতায় একীভূত হইয়াছে।

বাঙলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবিও এই যুগে আবির্ভূত হইয়া এই লীলা-কাহিনীকে অবিস্মরণীয় কাব্যরূপ দান করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আছেন শ্রীখণ্ড-গোষ্ঠীর কবিরঞ্জন (বাঙালী বিদ্যাপতি), কবিশেখর বা শেখর রায় ও লোচন দাস (চৈতন্য-জীবনীকার), নিত্যানন্দ শাখার জ্ঞানদাস ও বলরাম দাস, সহজিয়া মতবাদের পুষ্টিকর্তা ও পরকীয়া প্রেমের সাধক চণ্ডী-দাস ও শাক্তধর্ম হইতে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত, ভাষা ও ভাবের আলঙ্কারিক প্রয়োগে ঐশ্বর্যময়, বিদ্যাপতি-রীতি-প্রভাবিত গোবিন্দ দাস। ইঁহাদের রচনায় গোষ্ঠীর সাধারণ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ব্যক্তি-বিশেষত্বের সন্ধান মিলে। কবিরঞ্জনের মধ্যে বিদ্যাপতির সুর ও রচনা-রীতি বৈষ্ণবতত্ত্বে জারিত হইয়া এক অভিনব প্রকাশোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ও ইহার বাঙালী বাগ্‌ভঙ্গী-মিশ্রিত (idiom) ব্রজবুলিতে রচিত বহু পদ বিদ্যাপতির রচনার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কবিশেখর গোবিন্দদাসের সহিত অভিসার-বর্ণনার শ্রেষ্ঠ কবি। লোচন দাস হালকা সুরে ও লঘু বাচনভঙ্গীতে (ধামালীপদ) কৃষ্ণলীলার বর্ণনাকে সাধারণ পাঠকের তরল রুচির নিকট আস্বাদনীয় করিয়াছেন—ইনি গৌরাঙ্গকেও কৃষ্ণের অনুসরণে নবদ্বীপে প্রেমলীলার নায়করূপে এক বিসদৃশ ভূমিকায় চিত্রিত করিয়াছেন। বলরাম দাসের পদগুলির অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাসম্বন্ধীয় ও বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ।

চৈতন্যোত্তর শ্রেষ্ঠ পদ-কর্তাগণ

গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস পদাবলীসাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠতম কবি। গোবিন্দদাসের পদে গভীর ভাবাবেগের সহিত যুক্তিশৃঙ্খলার অনুবর্তন ও অলঙ্কার-বহুল, ঝঙ্কারপ্রধান, মর্যাদাপূর্ণ ভাষাপ্রয়োগের চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। ইনি অভিসার ও নায়িকার আত্মবিস্মৃত প্রণয়াবেগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। মান ও ভাব-সম্মিলনের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট পদও ইঁহার আছে। জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কাব্য-গগনের দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক—বৈষ্ণব-ভাব-রাজ্যের উন্নততম মহিমা ও কারুণ্য ইঁহাদের রচনায় উদাহৃত। নায়ক-নায়িকার রূপ-বর্ণনা, মিলনের জন্য ব্যাকুলতা, অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার অন্তর্দাহ ও প্রেমের প্রকৃতি-দুর্বোধ্যতার স্বরূপনির্ণয়, বিরহের মর্মস্পর্শী আর্তি ও পুনর্মিলনের সংযত-গম্ভীর আনন্দনিবিড়তা প্রভৃতি সর্ববিধ ভাবপ্রকাশে ইঁহারা সিদ্ধহস্ত ও অতুলনীয়। ইঁহাদের ভাষা সহজ, অনাড়ম্বর ও ব্যঞ্জনাশক্তির বিকিরণে দীপ্তময়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা অনুমাত্র প্রভাবিত না হইয়াও বাংলা ভাষা আত্মশক্তিতে প্রেমের নিগূঢ় রহস্য-উদ্ঘাটনে

তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি—গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস

কিরূপ আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করিতে পারে, বাঙালী ধর্ম ও সমাজের সমস্ত সংস্কার-আবরণ ভেদ করিয়া ইহা কিরূপে অভ্রান্ত লক্ষ্যে মর্মের গভীরতম অনুভূতিকে বিদ্ধ করিতে সক্ষম, এই কবিদ্বয় তাহার অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্থল। জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাসের কবিধর্মের মধ্যে এমন একটি নিগূঢ় সাদৃশ্য লক্ষিত হয় যে ইহাদের কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর পদের রচয়িতা যে কে তাহা আভ্যন্তরীণ বিচারে নির্ণয় করা অসম্ভব। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু'—এই বিখ্যাত পদটি কোন কোন পুঁথিতে জ্ঞানদাস ও আর কয়েকটি পুঁথিতে চণ্ডীদাসে আরোপিত হইয়াছে এবং উভয় শ্রেণীর পুঁথির সংখ্যাগণনা ছাড়া এ বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত-গঠনের কোন উপায় নাই। জ্ঞানদাস সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা এই মাত্র যে বর্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামে তাঁহার আশ্রম ছিল ও তিনি খেতুরি বৈষ্ণব-সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্জীবন বা বহির্জীবন সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য আমাদের অজ্ঞাত। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ও তিনি বৈষ্ণব-ভাব-সাধনার মূর্ত প্রতীকরূপে বৈষ্ণব কবিকুলের প্রতিনিধিস্থানীয় হইয়া আমাদের জ্ঞানে না হউক কল্পনায় বিরাজিত। তিনি যে পরকীয়া প্রেমের জন্য অনেক সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, প্রেমের রহস্যময় অলিতে গলিতে বিচরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা যে তাঁহার ছিল ও এই প্রেমই যে তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার প্রধান মন্ত্র ছিল তাঁহার অন্তর্জীবনের এই কাহিনী জনশ্রুতির পথ বাহিয়া আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। ইহা লৌকিক তথ্য না হইলেও যে ভাবসত্য তাহাতে সংশয় নাই। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে প্রেমতত্ত্ববিষয়ক পদগুলি, যাহাতে প্রেমের গভীর অন্তর্বেদনা ও বিপরীতধর্মী প্রকৃতিরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহারা চণ্ডীদাসেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাব্যপ্রকাশ ও প্রধানতঃ তাঁরই রচনা। জ্ঞানদাসের ক্ষেত্রে এরূপ সমর্থক প্রমাণের অভাব; তবে কবিপ্রতিভার সহজ সংস্কারের বলে তিনি যে প্রেমরহস্য ভেদ করিতে সমর্থ এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে।

জ্ঞানদাস নায়িকা অপেক্ষা নায়কের রূপ-বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যে বা অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়কের রূপের কোনো আদর্শ নাই—সুতরাং জ্ঞানদাস অনেকটা স্বাধীনভাবেই নায়কের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই রূপকল্পনায় শুধু অলঙ্কার-সজ্জা-বর্ণনা বা বাঁধা-ধরা উপমারই প্রয়োগ নাই, আছে মুগ্ধা নায়িকার দৃষ্টিতে নায়কদেহে সৌন্দর্যতরঙ্গের সচল প্রবাহ। শ্রীকৃষ্ণের রূপকে যমুনা তরঙ্গে আন্দোলিত চন্দ্র-প্রতিবিম্বের সহিত ও উহার রক্ত-চন্দন-চর্চিত শ্যামদেহকে কালিন্দীর জলে ভাসানো জবা-পুষ্পের সহিত

জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস

তুলনা করা হইয়াছে। চণ্ডীদাস নায়িকার রূপ অপেক্ষা তাহার আত্মহারা ভাবতন্ময়তা, কৃষ্ণ-নাম-জপে অভিনিবিষ্টচিত্ততার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। আক্ষেপানুরাগের পদে উভয়েরই সমান কৃতিত্ব। উভয়েরই ভাষা সরল, অলঙ্কার-বর্জিত ও মর্মস্পর্শী; জ্ঞানদাসের পদে আবেগের সহিত দার্শনিক তত্ত্ব ও আধুনিক অন্তর্দৃষ্টিশীল কল্পনা-মননের কিছুটা সংমিশ্রণ আছে। প্রেমের আত্মনিবেদনের পদে উভয়েই, মানব-জীবনের সীমা ছাড়াইয়া ভাবাদর্শের ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করিয়াছেন। ভাব-বৈচিত্র্যে জ্ঞানদাসের ও অনুভূতি-গভীরতায় চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব। পদাবলী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও কাব্যগুণের পরাকাষ্ঠা এই দুই মহাকবির রচনায় উদাহৃত হইয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্যের এই স্বর্ণযুগ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। তাহার পরই বৈষ্ণবভাবপ্রবাহের জোয়ার শেষ হইয়া ভাটা আরম্ভ হইল। তৃতীয় স্তরের কবিদের মধ্যে ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ (গোবিন্দ দাসের পৌত্র), নরহরি চক্রবর্তী, জগদানন্দ, রাধামোহন, দীনবন্ধু, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর প্রভৃতি মহাজন কবিত্বশক্তিতে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াও বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিসাধনাধারাকে প্রবাহিত রাখিতে সহায়তা করিয়াছেন। কল্পনার সরসতা প্রথাগত গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হইল—ভাবের গাঢ়তা কমিয়া বাক্‌চাতুর্য, কষ্ট-কল্পনা, আখ্যানের পল্লবিত বিস্তার দেখা দিল। বৈষ্ণব ধর্ম জাতীয় ভাবধারার সর্বব্যাপী মানস প্রসার হারাইয়া সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত হইল। জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল, জাতির মর্মানুভূতি হইতে ইহা দূরে সরিয়া আসিয়া অতিরঞ্জিত কল্পনার রূপ গ্রহণ করিল। সমাজের বাস্তব অবস্থা আর এই প্রেম-ধর্মের অনুকূল রহিল না। স্মৃতির অনুশাসন, মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত পদাবলীর মাধ্যমে মাতৃচেতনার প্রসার, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্নীতি, অনাচার ও দলাদলির আবির্ভাব, সমাজ-জীবনে প্রেমের পরিবর্তে শক্তির প্রতিষ্ঠা—এইসব কারণেই বৈষ্ণব-সাহিত্য ধীরে ধীরে শুষ্ক ও প্রাণহীন হইয়া উঠিল। তথাপি সমগ্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের কিছুদিন পর্যন্ত পদাবলী-সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত ছিল। এই সময় ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি, পদামৃত-সমুদ্র, পদরসসার ও পদরত্নাকর প্রভৃতি পদাবলীর সংকলনগ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। নূতন পদ-রচনা বন্ধ হইয়া পুরাতন পদের সংগ্রহ ও শ্রেণী-বিভাগ চলিতে লাগিল। জীবনের ধারা প্রবহমান নদীর রূপ ত্যাগ করিয়া সরোবরের তটবন্ধনে স্থির ও গতিহীন হইল।

পদাবলী সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ ও সংকলন-গ্রন্থ-প্রকাশ

এই অবক্ষয়ের যুগে যে সমস্ত কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দীন চণ্ডীদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবি সমগ্র কৃষ্ণলীলা লইয়া এক বিরাট গীতি-আখ্যান রচনা করেন। এ পর্যন্ত তাঁহার যত পদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চণ্ডীদাসের সুপ্রসিদ্ধ পদগুলির মধ্যে একটিও নাই—সুতরাং তিনি যে স্বতন্ত্র কবি ও পরবর্তী যুগের কবি এই সিদ্ধান্তে আপাতত পৌঁছিতে হয়। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি মাঝামাঝি ধরনের —ভাবস্ফুরণ অপেক্ষা আখ্যানের ধারাবাহিকতাই তাঁহার লক্ষ্য। রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে যত কাহিনী পল্লবিত হইয়াছিল তাঁহার কাব্যের বিরাট পরিধিতে তিনি সে সমস্তই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মনে হয় যে পদাবলী-সাহিত্যের যে প্রকৃত আদর্শ ও নির্দিষ্ট রূপ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র গীতিকবিতার সাহায্যে লীলারসবিকাশ—তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি মঙ্গলকাব্যের আখ্যান-প্রাধান্যের রীতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। দীন চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ রাঢ়ের লোক ছিলেন।

দীন চণ্ডীদাস

এই যুগে কয়েকজন মুসলমান বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হয়। ইঁহারা প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা লইয়া কবিতা লেখেন ও বাৎসল্যরসেরই বিশেষ অনুশীলন করেন। মুসলমান কবিগোষ্ঠী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সবটা গ্রহণ না করিয়া ও নিজেদের লীলাভিনয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মনে না করিয়া, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবধান রক্ষা করিয়াছেন ও তাঁহাদের ভণিতায় কেবল সর্বধর্ম-সাধারণ মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিগোষ্ঠীর অভ্যুদয় বৈষ্ণবধর্মের সর্বব্যাপী জাতীয়তারই নিদর্শন এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে কতকটা ধর্মসমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহাও প্রমাণ করে। হিন্দু যেমন মুসলমানের সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ আখ্যা দিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলমানও তেমনি ভগবানের রসময় ও আনন্দময় মূর্তির নিকট কাব্যশ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে দ্বিধা করে নাই।

মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙালী মনের এক উচ্ছল ভাবাবেগ, এক অপূর্ব আনন্দানুভূতি ভগবৎ-উপলব্ধির একান্ত আকূতির সহিত মণিকাঞ্চনযোগে সংযুক্ত হইয়াছে। ভগবানের রূপগুণ-আকর্ষণীয় শক্তি লইয়া এরূপ আবেগমত্ততা ও সৌন্দর্য-মুগ্ধতা আর কোন যুগে জাতীয় চিত্তকে অধিকার করে নাই। নায়ক-নায়িকার রূপ, পরস্পরের মিলনের প্রতি আগ্রহ, বিরহ-ব্যাকুলতা ও পরিণামে চিরবিচ্ছেদ-

স্বীকৃতি প্রচলিত কাব্যালঙ্কারপ্রয়োগ হইতে অন্তরের নিগূঢ়তম অনুভব-কেন্দ্রে অনুরণিত হইয়াছে—শিল্পীর সচেতন কারুকৃতি ভক্ত ও রূপাবিষ্ট মনের অনিবার্য সৌন্দর্যচেতনার দ্বার খুলিয়াছে। প্রথাবদ্ধ উপমা মনের অস্থির, অতৃপ্ত আবেগে, সাদৃশ্য-সন্ধানের উন্মত্ত ব্যাকুলতায় সূর্যালোক-প্রতিঘাতী, দ্রুত-আবর্তিত হীরক-খণ্ডের ন্যায় নানাবর্ণের দ্যুতি ছড়াইয়াছে। অলঙ্কারের অভাবিত ঐশ্বর্য, উক্তির পৌনঃপুনিকতা, ছন্দের প্রমত্ত উল্লাস, শব্দের সূক্ষ্ম, কোমল ব্যঞ্জনা, রূপসম্ভাবনার শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিংড়াইয়া-আনা মানস আগ্রহ—এ সমস্ত মিলিয়া এক সর্বগ্রাসী আবেশে আত্মহারা, এক সামগ্রিক দিব্যচেতনার ইন্দ্রজালমুগ্ধ কবিমনের পরিচয় বহন করে। এই প্রবল আবেগোৎক্ষেপে দূরের বস্তু একত্র মিলিয়াছে, জড় পদার্থ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, ধ্বনিতে, সুরে, কবিকল্পনায় এক অপরূপ সৌন্দর্যচক্র নির্মিত হইয়াছে। প্রকৃতির চিত্র মানব-চেতনার মধ্যে অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়াছে, নিসর্গের চলমান প্রাণপ্রবাহ নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনাকে জীবনলীলার গতিবেগ দিয়াছে, তাহাদের প্রণয়াবেশের বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে এক সূক্ষ্মতর সঙ্কেতদ্যোতনার চমৎকৃতি জাগাইয়াছে। এমন কি লৌকিক জীবনের আচার-সংস্কার ও সরল, অমার্জিত ভাষা পর্যন্ত লেখকগোষ্ঠীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার বলে এই দিব্যপ্রেমসাধনার অঙ্গীভূত হইয়াছে—ভক্তির স্পর্শে মৃত্তিকাস্তরও হিরণ্যদ্যুতিময়তা লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যাত্মভাব-বিভোর জাতির অপূর্ব কাব্যনির্মিতি—রূপদক্ষতা আসিয়াছে ভক্তের ঐকান্তিক ভাবকল্পনার টানে। যখন হইতে কল্পনায় ভাটা ধরিয়াছে, তখন হইতেই বৈষ্ণব কবিতা শিল্পস্বর্গচ্যুত হইয়া ভাবহীন প্রথানুবর্তনের ধূলিশায়ী হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদের সৌন্দর্য ও গৌরব

বৈষ্ণব পদাবলীর বেশি-কম তিন হাজার পদ একসঙ্গে পড়িতে গেলে সেই প্রয়াস আপেক্ষিক বৈচিত্র্যহীনতার জন্য ক্লান্তিকর হইয়া উঠে ও উহার কাব্যকৃতির দুর্বলতা বেশী করিয়া চোখে পড়ে। কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটি-দুর্বলতা হইতে প্রায় কোন প্রথম শ্রেণীর রচনাই সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নহে। ইহার শ্রেষ্ঠ পদগুলিতে—যথা 'সখি, কি কহব অনুভব মোয়,' 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু', 'বঁধুয়া, কি আর কহিব আমি', 'আলো মুঞি কেন গেলুঁ যমুনার জলে', 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে', 'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি', 'আক্ষল প্রেম' প্রভৃতি পদগুলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার পর্যায়ভুক্ত হইবার অধিকারী। ইহাদের মধ্যে প্রেমের রহস্য-

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা ও বৈষ্ণব পদ

মগ্নতা ও অসীম অতৃপ্তি, উঁহার ঐকান্তিক আত্মনিবেদন ও অন্তর্দাহ, মিলনের নিবিড় আনন্দ ও বিরহের অতলান্ত দুঃখবোধ অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে রক্ষণশীল, বিধিনিষেধবারিত জীবন অতিবাহিত করিয়া বৈষ্ণব কবিবৃন্দ প্রণয়ের এই অপরিসীম রহস্য ও আর্তির স্বরূপ কি করিয়া জানিলেন? অথবা, ভগবৎ-লীলায় সমর্পিতচিত্ত কবির নিকট জীবনের কোন রহস্যই অবগুণ্ঠিত থাকে না।

নবম অধ্যায়

শাক্ত পদাবলী

১

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি বাঙালীর মানস-চেতনায় বৈষ্ণব ভাবপ্লাবন অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিল ও তাহার ভক্তিরসধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা জাতীয় জীবনে উহার পূর্বপ্রভাব হারাইল ও উহার পরিবর্তে মাতৃদেবতার পূজা প্রাধান্য লাভ করিল। ভক্তিস্রোতের এই পরিবর্তনের কারণ সমাজচেতনা ও জীবনাদর্শের রূপান্তরের মধ্যেই নিহিত আছে। বৃন্দাবন-লীলার অখণ্ড মধুর রস ক্রমশঃ বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া অপার্থিব কল্পনাবিলাসের রূপ ধারণ করিল। ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, মোগল শাসনের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পর প্রায় পৌনে একশত বৎসর ধরিয়া বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-জীবনে মোটামুটি একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তির যুগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্ততঃ কোন গুরুতর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপর্যয়ের দ্বারা ইহার জীবনের ভারসাম্য বিচলিত হয় নাই। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে যে প্রজা-উৎপীড়নের চিত্র পাই, তাহা শাসন-ব্যবস্থা-পরিবর্তনের অনিবার্য সাময়িক ওলট-পালট বলিয়াই মনে হয়। টোডরমল-মানসিংহের সময় হইতে সুজা-সায়েস্তার সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে যে শক্তি, প্রাচুর্য ও আদর্শ-গত আত্মস্থতার যুগ ছিল সেই পরিবেশেই বৈষ্ণবীয় প্রেম-মাধুর্য পরিপূর্ণ রস-বিকাশের সুযোগ পাইয়াছিল ও জাতীয় জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

মোগল আমলের শান্তিময় পরিবেশ ও বৈষ্ণব সাহিত্য

কিন্তু এই সুখশান্তি বেশী দিন রহিল না—দিল্লীর রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া বাংলার তটভূমে আঘাত করিল ও উহার জীবনধারায় ঘূর্ণীবেগের সঞ্চার করিল। প্রেমের পরিবর্তে শক্তি, মধুর আত্মসমর্পণের পরিবর্তে দুর্দমনীয় জিগীষা ও আত্মরক্ষার অনিবার্য প্রেরণা সমাজ-পরিবেশে অনস্বীকার্য সত্যরূপে দেখা দিল। অবশ্য মঙ্গল-কাব্যে এই শক্তিপূজার প্রবণতা পূর্ব হইতেই ছিল, কিন্তু সেখানে অশান্তি আসিয়াছে কোন বহিঃশক্তির অভিভবে নয়, দেবতারই জোর করিয়া পূজা-আদায়-চেষ্টায়। কিন্তু দেশে যখন সত্য সত্যই দুর্দৈব ঘনাইয়া আসিল, যখন বাস্তব জীবনের

রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে শক্তি-সাধনার প্রবণতা

সহিত প্রেমসাধনার আদর্শের সামঞ্জস্য রহিল না, যখন বৈষয়িক অনিশ্চয়তার নূতন জটিল পরিস্থিতিতে বৈষ্ণবধর্মের রসমাধুর্য অপ্রযোজ্য হইল, তখন দেশের চিত্ত মোড় ঘুরিয়া মাতৃশক্তি-উপাসনাকেই আশ্রয় করিল। শাক্ত পদাবলীর কবিদের মধ্যে অনেকেই রাজা, জমিদার বা রাজবংশাশ্রিত সাধক ছিলেন —ইঁহারা যুগের বিপর্যয়, ধনদৌলতের অনিত্যতা, সংসারের ক্রূর বঞ্চনা প্রভৃতি ভাব তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে অনুভব করিয়া এই মায়ার ফাঁদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাতার নিকট কাতর আবেদন জানাইয়াছেন। বৈষ্ণব সাধকগোষ্ঠী সংসার-বিমুখ ছিলেন—শাক্ত সাধকেরা কিন্তু বৈষয়িক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন; তাঁহাদের এই অবস্থা-বৈষম্য হইতে তাঁহাদের সাধন-পদ্ধতি ও আত্মনিবেদনের সুরের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য উদ্ভূত হইয়াছে।

এই পরিবর্তনের মধ্যে কেবল বহির্জীবন নয়, অন্তর্জীবনেরও প্রভাব লক্ষণীয়। শাস্ত্রবিধিশাসিত, স্মৃতিব্যবস্থাপ্রভাবিত সমাজ ও পরিবারে পরকীয়া তত্ত্বের অসামাজিক হৃদয়বৃত্তি যে বিশেষ প্রশ্রয় পাইবে না ইহা স্বাভাবিক; রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার দৃষ্টান্তে সমাজের বুকে অবৈধ প্রণয়াভিনয় সমাজ-চেতনায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে বিধিবদ্ধ, কঠোরনীতিনিয়ন্ত্রিত সমাজে মাতার প্রভাব বাড়িতে লাগিল, ও ধীরে ধীরে মাতা প্রেয়সীকে স্থানচ্যুত করিয়া পরিবার-জীবনের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জননীর এই প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিবার ও সমাজ হইতে স্বভাবতই অধ্যাত্ম জীবনে সম্প্রসারিত হইল। "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর"—বৈষ্ণবধর্মের এই উন্নত অধ্যাত্ম তত্ত্ব বাংলার বাস্তব জীবনে এক অপরিচিত অনুভূতি-লোকের বার্তা বহন করিয়া আনিল ও প্রাকৃত গণচেতনার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক একটি ভাববিলাসরূপে প্রতিভাত হইল। পক্ষান্তরে, মাতা ও সন্তানের মধ্যে স্নেহ-ভক্তি-মমতা, পারস্পরিক আদর-আবদার, মান-অভিমান প্রাত্যহিক জীবনে এমন একটা উজ্জ্বল সত্য ও সার্বভৌম অভিজ্ঞতা যে অধ্যাত্ম জীবনে এই সুর স্বতঃই ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কাজেই বাংলা গীতিকবিতা মাতার জয়গানে, মাতার প্রতি একান্ত আত্মনিবেদনে, দুরন্ত শিশুর স্নেহানুযোগে, প্রতিদিনকার গার্হস্থ্য-জীবনের শত কল-কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিল।

অন্তর-জীবনে মাতৃতন্ত্রের প্রাধান্য

অনেকে মনে করেন যে কাব্যে এই মাতৃপ্রাধান্য অনার্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হইতে আর্যধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। এই অনুমান যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ঋগ্‌বেদে দেবী-সূক্তে বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

মার্কণ্ডের চণ্ডীতেও নারীদেবতার অমিত পরাক্রম, তাঁহার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-বিধায়িনী শক্তি বর্ণিত হইয়াছে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে মনসা ও চণ্ডীর মধ্যে অনার্য সংস্কৃতির কিছুটা ছায়া দেখা যায় ও ইহাদের উচ্চবর্ণের পূজামণ্ডপে প্রবেশের বিরুদ্ধে মৃদু বা দৃঢ় প্রতিবাদ শোনা যায়। কিন্তু তথাপি ইহারা মাতৃ-সত্তার প্রতীকরূপেই শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিরুদ্ধতা জয় করিয়া ভক্তের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। মনসাপূজায় ভক্তির সহিত প্রচুর ভীতি মিশিয়াছে; চণ্ডীপূজায় দেবী তাঁহার উগ্রচণ্ডা মূর্তি ত্যাগ করিয়া প্রায় অবিমিশ্র স্নেহময়ী, ভক্তবৎসলা জননীরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। মনে হয় মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করিয়া চৌতিশায় যে স্তব-স্তুতি ও আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহাই শাক্ত-পদাবলীতে আখ্যায়িকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও নিঃস্বার্থ ভক্তিবাদে উদ্বর্তিত হইয়া বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর দৃষ্টান্ত ও প্রভাবও সুরের এই বিশুদ্ধীকরণে সহায়তা করিয়াছে। মায়ের ভালবাসা যেমন সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত থাকিয়া নিজ অনাবিল, অকৃত্রিম ভাব-মাধুর্য বিকিরণ করে, তেমনি মাতৃনির্ভর অধ্যাত্ম সাধনাও সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ও কেবল মুক্তিকামনা করিয়া অপার্থিব ভক্তিরসকেই ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে।

শাক্ত-পদাবলীর উৎস

যে মাতৃশক্তি শাক্ত-পদাবলীতে বন্দিত হইয়াছে তাহা ভয়াবহ কালীমূর্তির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই কালীমূর্তি তন্ত্রসাধনার ফলেই ভক্ত-চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছে। তন্ত্রে যে দেবীর আরাধনা করা হইয়াছে তিনি শ্মশানচারিণী, নরকঙ্কাল-শোভিতা, নৃমুণ্ডমালিনী ও রক্তাপ্লুতদেহা। তন্ত্র-উপাসনা-পদ্ধতিও নানা জটিল ও দুরূহ ক্রিয়াকলাপে পূর্ণ। বাঙালী সমাজে তন্ত্রসাধনাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই কালীমূর্তি ভক্তসাধক ও কবির মনে অন্য সমস্ত দেব-দেবীর উপরে প্রাধান্য লাভ করিল। হয়ত এই বীভৎস-ভীষণ রূপের আরাধনার পিছনে সে যুগের বাস্তব সমাজচেতনা, দেশের দুর্বিষহ, বিপদসঙ্কুল অবস্থাও ক্রিয়াশীল ছিল। মুরশিদকুলি খাঁ বাংলাদেশে যে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন, তাহাতে রাজস্ব-আদায়ের কড়াকড়িতে ও করভারবৃদ্ধিতে জমিদারবর্গের অবস্থা শোচনীয় ও অত্যন্ত অনিশ্চিত হইয়া উঠিল। বাকী খাজনা আদায়ের জন্য তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ হইল ও তাহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইল। আজিকার রাজা

তন্ত্রের ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রভাব

কালিকার ভিক্ষুকে পরিণত হইলেন। এই যুগে স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নবাবের হাতে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ এই সময় বিষয়-সম্পদের অনিত্যতা, নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার বিপর্যয়, রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্মম নিষ্পেষণ ও ক্রুর চক্রান্ত সমস্ত জাতির চিত্তকে এক ভীতি-বিহ্বল সংশয়ে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল এবং ভক্ত কবির গানে ইহাই বিশ্বমাতার প্রতি ক্ষুব্ধ অনুযোগ, বিষয়-বৈরাগ্য ও সংসার-বিমুখতার সুরে রূপান্তরিত হইয়াছে।

২

বৈষ্ণব কবিতায় সংসার কেবল অধ্যাত্ম-সাধনার বাধারূপে কল্পিত হইয়াছে— "ঘরে পরিজন, ননদী দারুণ"—ইহারাই সমাজ-বিরুদ্ধতার একমাত্র নিদর্শন। এমন কি অত্যাচারী রাজা কংসও পদাবলী-সাহিত্যে উপেক্ষিত, রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজার ন্যায় এক অস্পষ্ট কল্পনার জালের অন্তরালে আত্ম-গোপনশীল। কিন্তু শাক্ত-পদাবলীতে সংসার উহার সমস্ত ক্রুরতা, বঞ্চনশীলতা ও অত্যাচার-উৎপীড়নের দারুণ বোঝা লইয়া অতি স্থূলরূপে প্রকট। পদের ফাঁকে ফাঁকে, উল্লেখ-ইঙ্গিতে-তুলনায়-রূপকল্পে সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্যা ছায়াপাত করিয়াছে। এখানে আমরা ডিক্রি-ডিস্‌মিস, তহবিল-তছরূপ, হিসাবের খাতা প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের অনুষঙ্গের কথা শুনি; ঘুড়ি-ওড়া, পাশা-খেলা প্রভৃতি আমোদপ্রকরণকে রূপকরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখি; বহু-বিবাহ-বিড়ম্বিত পরিবারে বিমাতার স্নেহহীনতা, বিমাতৃশাসিত পিতার ঔদাসীন্যের খবর পাই। বৈষ্ণব-পদাবলীতে এক প্রেমমধুর, সৌন্দর্যসার কল্পলোক বাস্তব জীবনকে আবৃত করিয়াছে; এমন কি অধ্যাত্ম সাধনার ইঙ্গিতও মানবিক প্রেমের রূপকান্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়াছে। শাক্ত-পদাবলীতে সংসারের সমস্ত গ্লানি-কুশ্রীতা, দারিদ্র্যরিক্ততা অনাবৃতভাবে প্রকট ও ইহার সাধনা-ক্রম অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত; উহার মধ্যে কোন নিগূঢ় ব্যঞ্জনা নাই, কোন রূপমুগ্ধতার আতিশয্য নাই। কালীর রূপবর্ণনা আছে, তবে উহা একেবারে শাস্ত্রবর্ণিত প্রতিমার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, উহাতে কবিকল্পনার বিশেষ অনুরঞ্জন লক্ষিত হয় না। রূপবর্ণনায় যে ভাবোচ্ছ্বাস আছে তাহা ভক্তিমূলক, সংযত ও প্রেমকল্পনার অতিরেক-বর্জিত। বৈষ্ণব-পদাবলীতে বাঙালীর মনের কথা যেন বেনামীতে ব্যক্ত হয়; শাক্ত-পদাবলীতে উহার একেবারে সরাসরি, প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সেইজন্য মনে হয় যে অষ্টাদশ শতকে

শাক্ত-পদাবলী ও বৈষ্ণব-পদাবলী

বাঙালীর সংসার ও ভাব-জীবনে যে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাই তাহার ভক্তিসাধনার নূতন রীতিতে ও কাব্যপ্রকাশের নূতন ভঙ্গীতে স্বতঃই প্রতিফলিত হইয়াছে।

শাক্তগীতির প্রথম রচয়িতা বোধ হয় রামপ্রসাদ সেন—কেননা ইঁহার পূর্বে এই ধরনের ভক্তিরসপূর্ণ শ্যামা-সঙ্গীতের কোন দৃষ্টান্ত মেলে না। তাঁহার এই গান এত জনপ্রিয় হয় যে ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাধকগোষ্ঠী ছাড়াইয়া অতি সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে ও রামপ্রসাদী সুরের সরল বৈরাগ্যময় ব্যঞ্জনার সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হয়। যাহারা বৈষ্ণব ধর্মের দুরূহ তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না, তাহারাও মাতা-পুত্রের এই সহজ সম্বন্ধটি অনুভব করিয়া এই মাতৃসাধনার পথেই ভগবানের নিকট তাহাদের কাতর প্রার্থনা পৌঁছাইয়া দিল। আজকালও সুদূর পল্লীতে শ্যামাসঙ্গীত যত অধিক সংখ্যায় গীত হয়, মানুষের কণ্ঠে যত আবেগ-মূর্ছনা ফুটাইয়া তোলে, এমন আর কোন জাতীয় ভক্তি-সঙ্গীত সম্বন্ধে বলা যায় না। রামপ্রসাদ আবার তাঁহার কালী-স্তুতির সহিত দুর্গার বাল্য ও বিবাহিত জীবনের কাহিনী সংযুক্ত করিয়া এবং আগমনী ও বিজয়াবিষয়ক গান প্রবর্তন করিয়া বাঙালীর মাতৃকল্পনাকে সম্পূর্ণতা দান করিলেন। কালীর দুর্বোধ্য, ভয়-দেখানো আচরণের সহিত উমার বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত, স্নেহের দুলালী কন্যামূর্তি এক হইয়া গিয়া বাঙালীর মনে মায়ের কঠোর ও কোমল রূপ যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গেল—শ্মশানের নিঃসঙ্গ ভয়াবহতা ও গৃহাঙ্গনের পরিচিত স্নেহ-আবেষ্টনের মধ্যে আর কোন ব্যবধান রহিল না। বিশ্ববিধানের দুর্জ্ঞেয়তা মমতা-পারাবারে ডুবিয়া গেল। মহামায়া দুহিতা-রূপে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া বাঁধিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, এই সুপ্রসিদ্ধ জনশ্রুতির মধ্যেই মাতৃশক্তির যুগ্মরূপের সমন্বয়ের কল্পনা নিহিত আছে।

রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদের রীতি-অনুসরণে যাঁহারা কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ, নন্দকুমার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্যামা-সঙ্গীতের ধারা কবিওয়ালা, পাঁচালিকার দাশরথি রায় প্রভৃতি রচয়িতার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি আধুনিক কবি ও নাট্যকারের কল্পনাকে প্রভাবিত করিয়া শেষ পর্যন্ত অতি-আধুনিক কবি নজরুল ইসলামে আসিয়া সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। শেষ প্রাচীনপন্থী কবি দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে শ্যাম ও শ্যামার

অন্যান্য শাক্ত কবি

সমন্বয়মূলক অনেকগুলি গানের দর্শন পাওয়া যায় ও ভক্তিরসপ্রবাহের দুইটি ধারা এক হইয়া মিশিবার নিদর্শন মিলে।

৩

শাক্ত-পদাবলীর কাব্যমূল্য বিচার করিতে গেলে প্রথমতঃ ইহার জীবননিষ্ঠা, সংসারযাত্রাসংশ্লিষ্ট বিচিত্র ভাবরাশির সার্থক উদ্বোধনের উল্লেখ করিতে হয়। ইহারা যেন ভক্তির প্রচুর জলসেচে লৌকিক জীবনের কণ্টকবৃক্ষে কাব্যের সুরভিত পুষ্পরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে জীবনের একটি মাত্র অভিজাত-বিকাশ ও এক সর্বব্যাপী রূপকানুভূতির নিশ্ছিদ্র আবরণকে আশ্রয় করিয়া এক অপ্রাকৃত কাব্যমাধুর্য বিকশিত হইয়াছে। সমস্ত জীবনকে এক সুকুমার প্রেমচর্চার ক্ষেত্ররূপে কল্পনা করিয়া এই মানুষী প্রেমের মধ্যে অলৌকিক প্রণয়-রহস্যের ব্যঞ্জনা আরোপ করিয়া বৈষ্ণব কবি জীবনবৃক্ষের উচ্চতম শাখায় এক দিব্য ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। ইহাতে জীবনের মধুরতম রসনির্যাস আছে, কিন্তু ইহার অনিবার্য বস্তু-প্রক্ষেপের কোন ভার নাই। শাক্ত কবি কিন্তু এইরূপ অতিসতর্ক সৌন্দর্যবিলাসী নহেন। তিনি বাস্তব জীবনের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি কাঁটাবিছানো বেদনাময় অভিজ্ঞতাকে ভক্তিপ্রসূত নিঃসংশয় বিশ্বাসের দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া উহাদেরই দিব্য রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। বাংলা সমাজ ও পরিবার-জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এই পদাবলীতে এক অপূর্ব ভাবপ্রেরণার উপকরণরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবির কল্পনায় যেমন রাধিকার প্রতিটি চরণ-ক্ষেপই এক-একটি রক্তপুষ্পের আবির্ভাবে চিহ্নিত হইয়াছে, তেমনি শাক্ত কবির অনুভবে জীবনযাত্রার প্রতিটি অভিজ্ঞতাই যেন মাতৃনির্ভরতার রাগ-স্ফুরণে ধন্য হইয়া উঠিয়াছে। ঐকান্তিক ধর্মবিশ্বাস যে পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছ বিষয়কে, জনজীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের অকিঞ্চিৎকর আয়োজনকে কাব্যরসস্ফুরণের উপায়রূপে প্রয়োগ করিতে পারে, শাক্ত-পদাবলী তাহারই বিরল দৃষ্টান্ত। ইহার ভাষাও সম্পূর্ণ কাব্যমার্জনাহীনভাবে সাধারণ জীবন হইতে যদৃচ্ছ সংগৃহীত হইয়াও কাব্যোচিত আবেগ-উদ্দীপনে ও সৌন্দর্যবোধের পরিতৃপ্তি-সাধনে পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে।

শাক্ত-পদাবলীতে জীবননিষ্ঠা

শাক্ত পদাবলীর স্তোত্র বা প্রার্থনা-পদগুলিতে যদিও অসহায় আর্তির অভাব নাই, তথাপি নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়, সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে

জয়লাভের দৃপ্ত আশা উহাদের মধ্যে বারবার ধ্বনিত হইয়াছে। মাতৃপ্রদত্ত অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত, শক্তিময়ীর আশ্বাসে দৃঢ়-আস্থাশীল কবি-সাধক সমস্ত পার্থিব বিপদকে, এমন কি মৃত্যুভীতিকেও তুচ্ছ করিয়া উদাত্তকণ্ঠে নিজ বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। তন্ত্রের বীরোচিত সাধনার উপযুক্ত কাব্যপ্রকাশ এই পদাবলীতে পাওয়া যায়।

প্রার্থনা-পদে আত্মপ্রত্যয়

শ্যামার রূপবর্ণনায় কবির স্বাধীন অনুভূতি অপেক্ষা তন্ত্রশাস্ত্রের আনুগত্যই বেশী ফুটিয়াছে। সময় সময় এগুলিকে সংস্কৃত মন্ত্রের আক্ষরিক অনুবাদই মনে হয়। তথাপি স্থানে স্থানে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় কবির স্বকীয় উপলব্ধির চকিত প্রকাশ বর্ণনার গতানুগতিকতার মধ্যে দীপ্ত হইয়া উঠে। তাছাড়া দেবীর ঐশ্বর্যরূপ ও মাধুর্যরূপের আপাত-বিসদৃশ সম্মিলন কবিমানসের এক অসংবরণীয় আবেগমত্ততার নিদর্শনরূপে আমাদিগকে চমৎকৃত করে। মনে হয় যেন কবিচিত্তের অব্যবহিত উত্তপ্ত স্পর্শে মাতার সংস্কৃতমন্ত্রবেষ্টনীতে বিধৃত, সুদূর অতীতের হিমানীশীতল নিশ্চল রূপটি বিগলিত নির্ঝর-প্রবাহের ন্যায় বেষ্টনী ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে। মোটামুটি রূপবর্ণনার পদগুলি সীমাসংযমহীন ও আতিশয্যদুষ্ট বলিয়াই মনে হয়।

রূপবর্ণনায় গতানুগতিকতা

৪

রূপকপ্রয়োগে ও সাধনসংকেতনির্দেশে শাক্ত-পদাবলীর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। শক্তিসাধনার যে জটিল ও দুরূহ প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, কতকগুলি পদে পারিভাষিক শব্দের সহায়তায় তাহার পূর্ণ তাত্ত্বিক প্রকাশ ঘটিয়াছে। এই সাধনতত্ত্ব অষ্টাদশ শতকের শাক্ত কবিগোষ্ঠীর নিকট জীবনাবেগে অভিসিঞ্চিত ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির স্পর্শে সজীব থাকার জন্য কাব্যপ্রবাহের সহিত বেশ সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে। পারিভাষিক শব্দগুলি উপলখণ্ডের ন্যায় কবিত্ব-স্রোতে কোন বিপরীত গতির সৃষ্টি করে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ (এমন কি, আধুনিক) যুগের পাঠকের নিকট এই শব্দগুলি অর্থহীন ধ্বনিসমাবেশের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া কাব্যের রসাস্বাদনে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এক যুগে যাহারা আবেগ ও অনুভূতির মর্মগত প্রেরণা ছিল, অন্য যুগে তাহারাই কৃত্রিম আরোপরূপে প্রতিভাত হইতেছে। সুতরাং এই জাতীয় পদগুলি সার্বভৌম রসস্বীকৃতি হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। পারিভাষিকশব্দ-প্রয়োগ বাদ দিলে শাক্ত পদাবলীর মধ্যে

সাধন-সংকেত ও রূপক-প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য

রূপকাবরণ খুব ক্ষীণ, নাই বলিলেই চলে। অর্থাৎ কোন স্থির ভাবান্তরের অবগুণ্ঠনে মূল বক্তব্যটি উপস্থাপিত হয় নাই। চর্যাপদে যেমন কতকগুলি আপাত-অসঙ্গত ভাবের ছদ্মবেশে গুহ্য সাধনতত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন মানব প্রেমের অন্তরালে দৈব প্রণয়লীলার স্বরূপটি অর্ধব্যক্ত ও অর্ধ-অন্তরায়িত হইয়াছে, শাক্ত-পদাবলীতে সেরূপ কোন স্থায়ী আবরণ পরিকল্পিত হয় নাই। দয়িত-দয়িতার সম্পর্কের মধ্যে যেরূপ অর্ধস্বচ্ছ যবনিকার প্রয়োজন, মাতা-পুত্রের খোলাখুলি সম্বন্ধের মধ্যে সেরূপ কোন গোপনতার অবকাশ নাই। প্রেমের রসের পরিপুষ্টি ব্যঞ্জনায়; বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের পরিপুষ্টি নিঃসঙ্কোচ, এমন কি রূঢ় প্রকাশ্যতায়। বিশ্বের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে প্রিয়রূপে কল্পনা একটা অসমসাহসিকতার নিদর্শন, কাজেই উহাকে ইঙ্গিতে আবছায়ায় আভাসিত করিতে হইবে। পক্ষান্তরে বিশ্বজননীকে নিজ মাতৃরূপে কল্পনা মানুষের ভক্তিপ্রবৃত্তির একটা স্বাভাবিক বিকাশ। সুতরাং রূপকের ছলনা এখানে অনাবশ্যক। কাজেই শাক্ত কবিগোষ্ঠী কখনও কখনও রূপকের আশ্রয় লইলেও এই রূপক এক ক্ষণিক, দ্রুত-অপসরণশীল আবরণ রচনা করিয়াছে। আর এই রূপক প্রধানতঃ জগতের বঞ্চনা ও মাতার দৈবমায়াদ্যোতনার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে, মূলগত সম্পর্কের কোন আদর্শগত প্রহেলিকা বুঝাই বার জন্য নয়। এখানে ভক্ত নিজ আকূতির তীব্রতা ও অভিলাষের আন্তরিকতার জন্যই ভগবানের সহিত মিলনের জন্য হাত প্রসারিত করিয়াছে; রূপকরচনার দ্বারা উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানকে সেতুবন্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। শাক্ত-পদাবলীতে বাসকসজ্জিতা ও অভিসারিকা নায়িকার কোন স্থান নাই—মাতা-সন্তানের মিলন অবাধ ও সর্বকালীন।

৫

গীতিকবিতার একটি লক্ষণ কবির আত্মভাবের আবেগময় ও চমৎকৃতি-স্পন্দিত প্রকাশ। যেখানে সম্প্রদায়গত গোষ্ঠীভাবের অতিপ্রাধান্য সেখানে কবির ব্যক্তিভাব এই গোষ্ঠীভাবের আশ্রয়েই প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবিরা গোষ্ঠীভাব-অনুবর্তনের মধ্যেও তাঁহাদের নিজস্ব অনুভূতি ও প্রকাশভঙ্গীর চমৎকারিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ বৈষ্ণব কবির রচনায় ধ্বনি অপেক্ষা প্রতিধ্বনিই বেশী। অবশ্য ইহারা শব্দের ঐশ্বর্য ও ছন্দঝঙ্কারের অনবদ্য শিল্পগুণে ইহাদের ভাবপ্রেরণার আপেক্ষিক ক্ষীণতা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তথাপি বৈষ্ণব দর্শন ও অলঙ্কারের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা তাঁহাদের ব্যক্তি-প্রেরণাকে যে অনেকটা শৃঙ্খলিত ও অভিভূত করিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। শাক্ত-পদাবলীতে স্থায়িত্বের স্বল্পকালীনতার জন্য এরূপ কোন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা বদ্ধমূল হইবার সুযোগ পায় নাই। পূর্বরাগ, দৌত্য, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, ভাবসম্মিলন, সর্বোপরি চৈতন্য-অনুভূতির নিবিড়তা ও চৈতন্যলীলার সর্বাতিশায়ী প্রভাব কবি-কল্পনাকে যেরূপ সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে বিন্যস্ত ও অলঙ্ঘনীয় নির্দেশের জালে আবদ্ধ করিয়াছিল, শাক্ত-পদাবলীতে তাহার অনুরূপ কিছু ছিল না। বৈষ্ণব-সাধনা জীবনের বিচিত্র বিস্তার হইতে সঙ্কুচিত একটিমাত্র নিবিড় প্রেমবিন্দুতে সংসক্ত; শাক্ত সাধনা সমস্ত বাস্তব জীবনের উপর স্বচ্ছন্দ-সঞ্চরণশীল। কাজেই শাক্ত-কবিরা অপেক্ষাকৃত মুক্ত মন ও স্বাধীন অনুভূতি লইয়া তাঁহাদের সাধনার আকূতি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যক্তিপুরুষ গোষ্ঠীরাহুগ্রাসে সম্পূর্ণ কবলিত হয় নাই। সংসারের শত জ্বালা, দুঃখ-উৎপীড়নের অনির্বাণ দাহ, প্রবহমান জীবনস্রোতের অসংখ্য অভিঘাত তাঁহাদের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ ও সজাগ রাখিয়াছিল। তাছাড়া এক রামপ্রসাদ ছাড়া আর কোন প্রথম শ্রেণীর কবি শক্তিকবিগোষ্ঠীর মধ্যে আবির্ভূত হন নাই। এই সমস্ত কারণে গীতিকবিতার বর্ণময় ও সুরময় উচ্ছ্বাস শাক্ত-পদাবলীতে অপেক্ষাকৃত কম হইলেও গীতিকবিতার আত্মভাবপ্রধান মৌলিক লক্ষণ ইহাদের মধ্যে অধিক মাত্রায় প্রকটিত। শাক্ত-পদাবলীতে জীবনধর্মিতা বেশী, বৈষ্ণব-পদাবলীতে আদর্শায়নেরই প্রাধান্য।

বৈষ্ণব কবিতায় সম্প্রদায়গত আবেগ শাক্ত কবিতায় ব্যক্তিগত আবেদন

৬

আগমনী ও বিজয়াবিষয়ক পদগুলি শাক্ত-পদাবলীর সংসারমুখী প্রবণতার চরম দৃষ্টান্ত। বিশ্বজননীকে শুধু মা রূপে কল্পনা করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়া, তাঁহার সহিত মান-অভিমানের পালা অভিনয় করিয়া, তাঁহার ভীষণা মূর্তিকে কল্যাণী-মূর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া কবিদের তৃপ্তি হইল না। তাঁহারা মা-কে মেয়েতে পরিণত করিয়া তাঁহাদের ভক্তিসাধনার পরিবর্তে স্নেহবুভুক্ষার তৃপ্তিসাধনের উপায় আবিষ্কার করিলেন। বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব এই রূপান্তরে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। Gulliver's Travels-এ Gulliver যেমন আপনাকে একবার অতিকায় দৈত্য ও আর একবার বামনরূপে অনুভব করিয়া

আত্মশ্রেষ্ঠতা ও হীনম্মন্যতা এই উভয়বিধ বিপরীত রসের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল, সেইরূপ শাক্ত সাধক একবার মায়ের কাছে ছোট ছেলে ও মেয়ের কাছে বয়স্ক অভিভাবকরূপে আপনাকে কল্পনা করিয়া দুই প্রকার ভাবাস্বাদনের উপলক্ষ রচনা করিয়াছে। বাঙালী পরিবার-জীবনের বিবর্তনে এই স্নেহের দুলালী মেয়ে একটি অতর্কিত প্রাধান্য লাভ করিয়া কাব্যাভিষেকের প্রতীক্ষায় ছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে মনসামঙ্গলে এক বেহুলা ও ময়মনসিংহগীতিকায় (যদিও পরবর্তী রচনা মনে হয়) কয়েকটি দুর্ভাগিনী কন্যা-কুমারী করুণরসে অভিষিক্ত হইয়া কাব্যের বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের দুর্ভাগ্যই ইহাদের কাব্য-প্রবেশের ছাড়পত্র ছিল। উমাও দরিদ্রগৃহিণী বলিয়া মাতা মেনকার বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু এই ছদ্মবেশী দারিদ্র্য স্বাভাবিক দুহিতৃস্নেহকে গাঢ়তর করিয়াছিল মাত্র। শাক্ত কবিরা সংসারের সমস্ত বিচিত্র সুখ দুঃখ দিয়া দেবীর অর্ঘ্য রচনা করিয়াছিলেন। এখন সংসার-উদ্যানে এই নব-প্রস্ফুটিত দুহিতা-পুষ্প নিবেদন করিয়া তাঁহাকে শেষবারের মত ব্যাকুল স্নেহালিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিল। বৈষ্ণবীয় প্রেমের মত শাক্তকবির এই স্নেহকল্পনা দীর্ঘস্থায়ী হইল না। স্নেহের আতিশয্য কিছুদিন বাঙালীর চিত্ত জয় করিয়া ও তাহার চোখে অশ্রুপ্লাবন বহাইয়া নিজ বাস্তব-বিড়ম্বিত সত্তাকে সংহরণ করিল। দেবীকে আর বেশীদিন মেয়ে রূপে ধরিয়া রাখা গেল না। সমুদ্র আর স্নিগ্ধ শিশির-বিন্দুতে আত্মসংকোচন করিল না। ভক্তিকল্পনার ঐকান্তিকতায় কাব্যরাজ্যে দুহিতার অনুপ্রবেশ শাক্তসাধকের শেষ দুঃসাধ্য সাধনরূপে স্বীকৃতি-লাভের যোগ্য।

আগমনী ও বিজয়ার চমৎকারিত্ব ও ক্ষণস্থায়িত্ব

দশম অধ্যায়

বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গীত

সমাজবহির্ভূত সাধনার ধারা বাংলাদেশে সুদূর অতীত হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল; চর্যাপদাবলীর মধ্যে সিদ্ধাচার্যগণের এই সাধনার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। তারপর আর্যীকরণের ক্রমপরিণতি ও পৌরাণিক চেতনার অগ্রগতির ফলে অধিকাংশ অনার্য ও বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি অ-হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদ হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া শাস্ত্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করিয়াছে। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ও মঙ্গলকাব্যে বিবৃত অনার্য দেব-দেবীর উপাসনা এইরূপে অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় লাভ করিয়া অকৃত্রিম হিন্দুধর্মের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই আর্যীকরণ-প্রক্রিয়া সত্ত্বেও কতকগুলি ধর্মমত হিন্দুধর্মের প্রধান শাখাগুলির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়ের সাধনা-সমূহও শাস্ত্রীয় সাধনার কোন কোন বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি হিন্দু-ধর্মের অন্তঃপুরে স্থান না পাইয়া ইহার সীমান্তে সংলগ্ন হইয়াছে।

লোকসঙ্গীতের উৎস ও পরিচয়

শাস্ত্রীয় ধর্মের অন্তরালে বাংলার লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের নিজস্ব সাধনা ও সঙ্গীতের ধারাও ফল্গুর মত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। বাউল, কর্তাভজা, মারফতী, গুরুসত্য প্রভৃতি গান এই ধরনের সাধন-সঙ্গীত। উহা ছাড়া কবি, পাঁচালি, তর্জা, বোলান, ভাটিয়ালি, জারি, সারি প্রভৃতি নানা লোকসঙ্গীত-ও মুখ্যতঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে উদ্ভূত হইয়া হিন্দুধর্মের প্রধান ধারাগুলির সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া, হিন্দুদর্শন ও অধ্যাত্ম তত্ত্বসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ও ইহাদের পাশাপাশি বহিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকের ধর্মপিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছে।

এইসব সাধন-সঙ্গীতের মধ্যে বাউল-সঙ্গীতই প্রধান। 'বাউল' কথাটি খুব সম্ভবতঃ 'বাতুল' শব্দ হইতে আসিয়াছে। সংসার-সমাজের বিধিসম্মত সকল নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া এই সম্প্রদায় হিন্দু-মুসমলমান ধর্মের কড়াকড়ি নিয়মের বন্ধনমুক্ত হইয়া বিশিষ্ট সাধনার পথে মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মের কান্ত-কান্তার মধুর সম্পর্কটি ইহাতে 'মনের মানুষ' নামে অভিহিত এক প্রেমের ঠাকুরের প্রতি আত্মসমর্পণে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বাউল গান

চর্যাপদের ও সহজিয়াবাদের মতই বাউল সঙ্গীতগুলি খানিকটা হেঁয়ালীপূর্ণ সন্ধ্যাভাষায় রচিত। ইহা প্রচলিত দেহতত্ত্বাশ্রয়ী হইলেও এবং ইহার মধ্যে দেহ-

সাধনার প্রাধান্য থাকিলেও বাউল গীতের গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও ভাবাবেগ ইহাকে আধুনিক চিত্তের উপযোগী করিয়াছে। বাউল গীতের মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের দিকে সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব সাধনার পরকীয়া তত্ত্ব ও সহজ সাধনার সহিত স্থফী ধর্মমতের অপূর্ব মিশ্রণে বাউল ধর্মের সমৃদ্ধি হইয়াছে। আউলচাঁদকে এই বাউল সম্প্রদায়ের আদি বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। বাউল সঙ্গীতকারদিগের মধ্যে লালন ফকিরের নাম বিখ্যাত। ইহা ছাড়া ফকির পাঞ্জ শাহ্, যাদবেন্দু, গঙ্গারাম বাউল, জগা কৈবর্ত, পদ্মলোচন, কুবীরচাঁদ, মদন প্রভৃতি অনেক বাউল সাধক ও সঙ্গীতকার আছেন। উনবিংশ শতকের শেষভাগে অনেক শিক্ষিত লোকও বাউল গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। দুইটি গানের নমুনা দিতেছি।

(১)

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম তাহার পায়॥
চিরদিন পুষলেম পাখী, বুঝলেম না তার ফাঁকিজুকি।
দুধ-কলা দিই, খায়রে পাখী তবু ভোলে না তায়॥

(২)

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
আমি হারায়ে সেই মানুষে
ঘুরে মরি দেশ-বিদেশে॥

মুর্শিদী-মারফতী গানের সহিত বাউল গানের মূলতঃ পার্থক্য কম। মুসলমানী সাধনার পরিবেশে এই গানগুলি রচিত হইয়াছে।

বাউল গানের পিছনে যে সাধনাতত্ত্ব ও ঐশী-মিলন-আকূতি তাহা নানা সম্প্রদায়ের মতবাদের মিশ্রণে গঠিত। বিশেষতঃ বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বপ্রভাবিত হইলেও, ইহার একটি নিজস্ব ভাবপ্রেরণা আছে। ইহা পৌরাণিক ভক্তিবাদ, রাধাকৃষ্ণ—প্রেমলীলা, শাক্ততান্ত্রিক ভজন-পদ্ধতি ও স্থফিধর্মের মরমিয়া অনুভূতির উপাদান-পুষ্ট ও প্রয়োজনমত এই বিচিত্র উপাদানসমূহের প্রয়োগ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহার মূল কথা হইল সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ ও ধর্মাচার-নির্দেশকে

অগ্রাহ্য করিয়া হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির ইঙ্গিতে অন্তর্মুখী সাধনায় আত্ম-নিমজ্জন। মনের মানুষকে অন্তরের মণিকোঠায় খুঁজিয়া বাহির করা ও তাঁহার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিলনরসে তন্ময় হইয়া যাওয়াই বাউল-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য। এই পরম সিদ্ধির অনুকূল পারিপার্শ্বিক প্রস্তুত করার জন্য ইহা মানবের ভগবত্তা-ঘোষণা, গুরুবাদ, কায়সাধনা ও বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান-বাহুল্যের বর্জন প্রভৃতি কতকগুলি তত্ত্বাশ্রয় রচনা করিয়াছে। ইহাদের ভাব ও ভাষার মধ্যে লোকজীবনের বিভিন্ন বৃত্তির ছাপটি প্রায় উদ্ধতভাবেই প্রকট। প্রকাশভঙ্গীর তির্যক ব্যঞ্জনা, পরোক্ষ ভাষণের মাধ্যমে গূঢ় মানস অভিপ্রায়ের অস্পষ্ট আভাস, গভীর অনুভূতির আশ্চর্য দ্যোতনা বাউল-সঙ্গীতের কাব্যোৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। বাউল গান প্রমাণ করে যে দেশব্যাপী ধর্মসাধনার ফলে ধর্মের নিগূঢ় অনুভূতি অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রায় সর্বব্যাপ্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল ও সাধনার একাগ্রতা এক নূতন ধরনের কাব্যরসসমৃদ্ধ ও লোকচেতনাপুষ্ট গীতিকবিতার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। প্রবল ধর্মাকূতি অশিক্ষার সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করিয়া নিজ অন্তর্নিহিত শক্তিতেই আপনার প্রকাশপথ রচনা করিয়াছে। কবির, দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধু-সন্তের শাস্ত্রনিরপেক্ষ স্বাধীন ধর্মবোধও বাংলা বাউল-গীতির মধ্যে আপন অনুভবের বিশিষ্ট সুরটি রাখিয়া গিয়াছে।

বাউল গানের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও কাব্যোৎকর্ষ

কবি-পাঁচালি-তর্জা প্রমুখ সঙ্গীতগুলি কোন সাধন-সঙ্গীত নহে—সাধারণভাবেই তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে। কবিগানকে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর লৌকিক সংস্করণ বলা যাইতে পারে। রাধাকৃষ্ণপ্রেমের উন্নত মধুর রসের সাধনা ও মাতৃ-শক্তির ঐকান্তিক, ভক্তিবিহ্বল অনুভূতি কবিগানে সাধারণ অশিক্ষিত লোকের স্থূলরুচি—অনুযায়ী পরিবর্তিত হইয়াছে ও ইহার গাঢ়তা অনেক পরিমাণে ফিকে ও অকৃত্রিমতা ইতর ভাবের সংস্পর্শে অনেকটা ঘোলা হইয়া পড়িয়াছে। কবিগান বোধ হয় অষ্টাদশ শতকে আরম্ভ হইয়াছিল এবং অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের মোহানায় উহা বাংলা দেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী, এনটনী ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিয়ালবৃন্দ সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকার লাভ করিয়াছেন। ভবানী-বিষয়ক, সখী-সংবাদ, বিরহ—এইভাবে শ্যামা, শ্যাম ও মানবীয় প্রেমের সঙ্গীত—এই তিনটি স্তরে কবি-সংগীত গীত হইত। ইহাদের প্রধান মৌলিক দান হইতেছে ধর্মসম্পর্কহীন প্রেমসঙ্গীতের সৃষ্টি। ইহাই পরবর্তী-

কবিগান

যুগে উন্নত ধরনের প্রণয়-গীতির প্রেরণা দিয়াছে। কবির টপ্পাগুলি সাধারণতঃ স্থূল ও অশ্লীল হইত। হরু ঠাকুরের সখী-সংবাদের একটি উদাহরণ দিতেছি।—

শ্যাম তিলেক দাঁড়াও।
হেরি চিকণ কালোবরণ তিলেক দাঁড়াও
এ অধীনীর মনের বাসনা পূরাও।
সাধ মম বহুদিনের আজ পেয়েছি অঙ্গনে
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাঁশীটি বাজাও॥
নির্জনে এমন পাব না দরশন
যায় নিশি যাক জানুক গুরুজন
তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ
ও বংশীর গুণ কত বিশেষ শুনাও॥

কবিগানে কোন মৌলিক সাধনার পরিচয় নাই। কিন্তু উচ্চবর্ণের ভক্তসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব ও শাক্তসাধনা কিরূপ অবলীলাক্রমে নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত কবিয়াল-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল ও তাহাদেব সুপ্ত কবিত্বশক্তির উন্মেষসাধন করিয়াছিল ইহাতে তাহার বিস্ময়কর নিদর্শন পাওয়া যায়।

পাঁচালি গান গাওয়া হইত পালার আকারে। খানিকটা আবৃত্তি, খানিক ছড়া, খানিক গান হইত। কৃষ্ণবিষয়ক, রামবিষয়ক, শিববিষয়ক পালা ছাড়াও লৌকিক পালা—বিরহ, বিধবাবিবাহ, কর্তাভজা ইত্যাদি বিষয় লইয়া পাঁচালি রচিত হইত। সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচালিকার হইতেছেন দাশরথি রায়।

পাঁচালি

দাশরথি রায়ের (১৮০৬-১৮৫৮) পাঁচালি একটা নূতন আদর্শের মিশ্র কাব্য-কৃতি। বাঙালী মনের ভক্তিরসোচ্ছলতার কাব্যাভিব্যক্তির শেষ নিদর্শন তাঁহার রচনাবলী। ইঁহার মধ্যে সনাতন উত্তরাধিকাররূপে প্রাপ্ত ভক্তিবিভোরতার সঙ্গে আশ্চর্য শিল্পকুশলতা ও কবিকল্পনার অজস্র উৎসারের অদ্ভুত সমন্বয় দৃষ্ট হয়। দাশরথি ভক্তিরসপ্রধান নানা-বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে নূতনভাবে বিন্যাস করিয়া, নূতন উপমা-অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া ও নবযুগোপযোগী তাৎপর্য আরোপ করিয়া উনবিংশ শতকের শ্রোতৃমণ্ডলীর ক্ষীয়মান ভক্তিপ্রবণতার মধ্যে নূতন স্রোতোবেগ ও ভাবানুকুল্য সঞ্চারিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতাতে যে রসাবেদন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, শাক্ত পদাবলীতে যে সরল ও নিরলঙ্কার

প্রকাশভঙ্গী পাঠকের মর্মমূলে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইত, দাশরথির পাঁচালিতে তাহাই সরস, চাতুর্যময় বাক্যপ্রয়োগে, চমকপ্রদ কল্পনালীলার তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, সমকালীন সমাজজীবন হইতে সুকৌশলে সংগৃহীত দৃষ্টান্তপরম্পরার সহায়তায় এক অতিরঞ্জিত কাব্যকলা ও মানস চেতনার উত্তেজিত বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়া পাঠকের ঔদাসীন্যকে সবলে জয় করিয়াছে। ভক্তির সহিত ব্যঙ্গের ফোড়ন দিয়া, ভাবতন্ময়তার সঙ্গে সমাজ-সচেতনতার সংমিশ্রণ ঘটাইয়া, আবেগময় বাগ্‌ভঙ্গীর মধ্যে অপ্রত্যাশিত বাক্‌চাতুর্যের আঘাত হানিয়া, তিনি প্রাচীন বিষয়ের একটি নূতন উপস্থাপনারীতি প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি যেন ভক্তিরসপ্রবাহের শান্তমধুর ধারাটি কাব্যকৌশলের পিচকারী-যন্ত্রে আকর্ষণ করিয়া পাঠকের নাকে-মুখে তাহা বৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহাকে পুলকিত করার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বিপর্যস্তও করিয়াছেন। মধুর রস যেন উদ্দাম হইয়া খানিকটা বীভৎস রসের ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই আতিশয্যপ্রবণতার জন্য তাঁহার আন্তরিক ভক্তিপ্রাণতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার কতকগুলি গানে বিদ্যাপতি ও নরোত্তম দাসের মত একান্ত আত্মনিবেদনের সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। বাঙালীর মনে এই ভক্তি এমন একটি অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল যে সে ইহাকে লইয়া নানা রকমের খেলা খেলিয়াছে, নানা রসের উৎসরূপে ইহাকে ব্যবহার করিয়াছে ও বিচিত্র কাব্যপ্রকাশের প্রেরণা ইহা হইতে পাইয়াছে। বৈষ্ণব কবি ইহার মধুর রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছেন; শাক্ত-কবি ইহাকে বাস্তব জীবনের দুঃখকষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়া ইহা হইতে মাতার রহস্যময় আচরণের মধ্যে নিগূঢ় স্নেহলীলার পরিচয় পাইয়াছেন; বাউল-কবি ইহাকে কোন নির্দিষ্ট ভাবসাধনার গণ্ডীতে আবদ্ধ না রাখিয়া অন্তরের গভীরে ইহার দিক্‌চিহ্নহীন অস্তিত্বকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। আর পাঁচালিকার দাশরথি রায় ক্রীড়ারসবিভোর করিশাবকের ন্যায় এই প্রবহমান ভক্তিস্রোতে বপ্রক্রীড়ার আনন্দমত্ততা অনুভব করিয়াছেন।

দাশরথির বৈশিষ্ট্য

রসিক রায়, ব্রজ রায়, নন্দ রায় প্রভৃতি পাঁচালিকারের পাঁচালিও মুদ্রিত হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া সারি, ভাটিয়ালী, জারি, তর্জা ও নানা পল্লী-সঙ্গীত এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। এই গানগুলির বৈচিত্র্য বাঙালী কবিচিত্তের সরসতা ও সৌন্দর্যমুগ্ধতার নিদর্শন বহন করে।

একাদশ অধ্যায়

নাথ-সাহিত্য

১

নাথ-সাহিত্য ভাবের দিক্ দিয়া চর্যাপদের সহিত সম্পর্কিত; উভয় ধারাতেই সিদ্ধদিগের কয়েকটি সাধারণ নাম পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে উভয়ে বর্ণিত সাধনাক্রম একই উৎস হইতে উদ্ভূত। চর্যাপদে যে অধ্যাত্মতত্ত্বের বর্ণনা আছে তাহা উন্নত ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, অনেকটা উপনিষদ ও প্রাচীন পুরাণে উল্লিখিত যোগসাধনার বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রতিরূপ। ইহার প্রধান কথা হইল চিত্তবৃত্তির উন্মূলনের দ্বারা সমস্ত জাগতিক পার্থক্যের লোপ ও মনের শূন্যতা-বিধান—পরম সত্যচেতনার মধ্যে উহার বিলয়। নাথ-সাহিত্যে এই তত্ত্বকে প্রাকৃত উদ্ভট কল্পনার সহিত মিশাইয়া, অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের আদিম বিস্ময়বোধ ও অন্ধ আজগুবিপ্রীতির স্তরে নামানো হইয়াছে। আর ইহার সাধনার রহস্যকে প্রধানতঃ কায়সাধনার দ্বারা ঐহিক অমরতা ও অসাধ্য-সাধন-শক্তি-লাভের উপায়স্বরূপ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাস-গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই কৃচ্ছ্রসাধন ও বৈরাগ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য মৃত্যুজয়ের দ্বারা ভোগের পথকে নিষ্কণ্টক করা। সুতরাং ইহার আধ্যাত্মিক আদর্শ যে খুব উচ্চ ছিল তাহা বলা যায় না। প্রাকৃত মন যে অবাধ ভোগসুখের জন্য লালায়িত যোগ-বিভূতির দ্বারা তাহারই পরিতৃপ্তিকে অনায়াসলভ্য করাই ইহার আসল কাম্য। নাথ-সাহিত্য সম্বন্ধে আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার একটি মৌখিক রূপ উনবিংশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত অ-লিখিত অবস্থায় ছিল। রংপুর-কুচবিহার অঞ্চলের আদিবাসীদের মুখে মুখে ইহার আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে ইহার কাহিনীর দুইটি রূপ পাশাপাশি প্রচলিত ছিল—এক, বিভিন্ন কবি-রচিত সাহিত্যিক রূপ, দুই, লোকমুখে গীত, সাহিত্য-পরিমার্জনাহীন, লৌকিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত রূপ।

নাথ-সাহিত্যের উৎস ও স্বরূপ

এই কাহিনীর দুইটি প্রধান শাখা—মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতী বা গোবিন্দচন্দ্রের গান। প্রথমটির বিষয় সিদ্ধাচার্য মীননাথের কদলীপত্তনের নারীদের মোহে পড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান-বিস্মৃতি ও শেষ পর্যন্ত শিষ্য গোরক্ষনাথের চেষ্টায় তাঁহার উদ্ধার-সাধন। দ্বিতীয় কাহিনীটিতে গোরক্ষনাথ-শিষ্যা ও তত্ত্বজ্ঞা ময়নামতীর

নির্দেশে তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সংসারত্যাগ ও দীক্ষাগ্রহণ। দ্বিতীয় আখ্যানটিতে তরুণী রাজমহিষীদ্বয় অদুনা-পদুনার স্বামিবিচ্ছেদবেদনার মর্মান্তিক খেদের বর্ণনা থাকার জন্য ইহা জনসাধারণের মনের গভীরে গাঁথা হইয়া গিয়াছে। প্রথমটিতে কেবল দুরূহ সাধনতত্ত্বের রূপক-ব্যাখ্যা আছে বলিয়া ইহা সাধারণের দুর্বোধ্য। ইহার কবি বা রচয়িতার মধ্যে শ্যামাদাস সেন, ভীমসেন রায়, শেখ ফয়জুল্লা ও কবীন্দ্র দাসের নাম করা যায়; কিন্তু বিভিন্ন গাথাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশী যে মনে হয় যে ইহার রচয়িতারা একই আখ্যান-আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন ও মাঝে মধ্যে, রচনার অভিন্নতার মধ্যে বর্ণনার এক-আধটুকু পরিবর্তন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কে যে আদি কবি আর কে যে নকলকারক শুধু ভণিতার মধ্যে নিজ নাম রাখিয়া গিয়াছেন তাহার যথার্থ অবধারণ অসম্ভব। দ্বিতীয় আখ্যানটির লেখকদের মধ্যে দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস ও আবদুল স্কুর মহম্মদের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

নাথসাহিত্যের-কাহিনীদ্বয়

ইহাদের মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে কিছু যোগ রাখিবার চেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীর যে চিত্র এখানে পাই, তাহা লৌকিক কল্পনার দ্বারা বিকৃত ও সময় সময় হাস্যাস্পদ। দুর্গা সিদ্ধাদের চরিত্রবল-পরীক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অশোভন ও তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ মহিমাবিরোধী। যমের সঙ্গে গোরক্ষনাথ ও ময়নামতীর যে শক্তিপরীক্ষার বোঝাপড়া তাহাতে প্রাকৃতরুচিসম্মত উদ্ভট ঘটনার সন্নিবেশ, পরস্পরকে ঠকাইবার জন্য নানারূপ আজগুবি কৌশল-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইহাদের পারলৌকিক পরিকল্পনার মধ্যেও ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদাবোধের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। সিদ্ধাদের মধ্যে অনেককেই হীনবৃত্তিধারী ও স্বীয় অলৌকিক শক্তিপ্রকটনে অতিব্যগ্র রূপে দেখানো হইয়াছে। এমন কি ময়নামতী, গোবিন্দচন্দ্র ও রানী অদুনা-পদুনার মধ্যেও অভিজাতসুলভ আচার-আচরণের বিশেষ নিদর্শন নাই—সকলেই যেন ছেলেমানুষের মত অস্থির, খামখেয়ালী ও নিরঙ্কুশ কল্পনার মূর্ত বিকাশ। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণে রানীদের খেদ মর্মস্পর্শী করুণ রসে অভিষিক্ত হইলেও উচ্চবর্ণের হিন্দু-নারীর অধ্যাত্ম-আদর্শের স্পর্শহীন। এ যেন ছোটমেয়ের পুতুল-ভাঙার জন্য শোকোচ্ছ্বাসের একটু উন্নততর সংস্করণ। এই সমস্ত হইতে এই ধারণাই জন্মে যে সমস্ত আখ্যানটি আদিম দেবকল্পনার একটা

হিন্দুধর্মাদর্শ ও নাথ-সাহিত্য

অর্ধবিকশিত রূপ এবং আর্য-সংস্কৃতির সহিত ইহার যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। কবিদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতাও এই ধর্মসংস্কারের প্রাগ্-আর্য প্রাচীনত্বের আরও একটি প্রমাণ—ভবিষ্যতে ভিন্নধর্মাবলম্বী আদিম জাতিগুলি যখন ধর্মগত বিভেদের দ্বারা চিহ্নিত হয় নাই, সেই সুদূর অতীতের স্মৃতিবাহী।

২

মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয় পুঁথিতে দেখি গুরু মীননাথ কদলীপত্তনে গিয়া সেখানকার নারীদের সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া সাধনামার্গ হইতে বিচ্যুত হইলেন ও সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়সুখপ্রধান জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুর অধঃপতনের কাহিনী জানিতে পারিয়া নর্তকীর ছদ্মবেশে কদলী-নগরে প্রবেশ করিলেন এবং বাদ্য ও নৃত্যের সঙ্কেতে গুরুকে তাঁহার বিস্মৃত মহাজ্ঞানের তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দিলেন। শিষ্য গুরুকে তত্ত্বকথা শোনাইতে শোনাইতে গুরুর চৈতন্যোদয় হইল ও তিনি হীন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জীবন ত্যাগ করিয়া সাধনা-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। নানারূপ হেঁয়ালি ছড়া ও রূপক-প্রয়োগের সাহায্যে পরমতত্ত্ব-প্রতিপাদনই আখ্যানের প্রধান উপজীব্য। এই আপাত-অসম্ভব উক্তি-সমাবেশ ও রূপকের মাধ্যমে তত্ত্বের আভাসদান—চর্যাপদের সঙ্গে নাথ-গীতিকার মিলের নিদর্শন। এই গভীরার্থক হেঁয়ালি-রচনার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন

পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে। (ডুবে)
বাসাঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে॥
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চাল।
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল॥
ঝিম যাউক বরিষা শীতলে যাউক মীন।
ঝাঁপিয়া তরীতে পাড়ি সমুদ্র গহীন॥

এইরূপ হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় বাংলা দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ধর্মসম্প্রদায়ের তত্ত্বরহস্য একই সঙ্গে আবৃত ও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সহজিয়া, বাউল ও তন্ত্রসাধনাতেও এই বিপরীত ভাবের রহস্যময় সমাবেশ একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

'গোরক্ষবিজয়'-এর আদি রচয়িতা খুব সম্ভবতঃ শেখ ফয়জুল্লা। ইহার কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'নাথ-সাহিত্য' প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত 'সাহিত্যপ্রকাশিকা', প্রথম খণ্ড) ডাঃ এনামুল হক কর্তৃক আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথির বিক্ষিপ্ত পাতায় প্রাপ্ত 'সেখ ফয়জুল্লা'র 'সত্যপীরের পাঁচালি'—রচনার কালনির্দেশক সঙ্কেতের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা শেষার্ধে স্থাপন করিয়াছেন। এই বিক্ষিপ্ত পত্রে শুধু 'সত্যপীরের পাঁচালি'র রচনাকালই সঙ্কেতিত হয় নাই। কবির পূর্বরচিত দুইখানি কাব্যও—গোর্খবিজয় ও গাজীবিজয়—উল্লিখিত হইয়া তাঁহার পরিচয়ও নিঃসংশয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে মনে হয়। ইহার পর আবার সত্যপীরের সম্পূর্ণ পুঁথিখানিও আবিষ্কৃত হইয়া ডাঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য সমগ্র পুঁথিটির মধ্যে গ্রন্থারম্ভের কালনির্দেশক ও বিভিন্ন রচনার পৌর্বাপর্ব-নির্ধারক উক্তিগুলি পাওয়া গিয়াছে কি না তাহা অনিশ্চিত। কোন প্রাচীন গ্রন্থকার সম্বন্ধে এরূপ একটি নিশ্ছিদ্র প্রমাণপঞ্জীর লুপ্তরত্নোদ্ধার খুব বিরল ও আশাতীত দৈবপ্রসাদ বলিয়াই ঠেকে। কোন পূর্ব হইতে সুপরিকল্পিত আয়োজনও এত নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তি দ্বারা পুরস্কৃত হইত কি না সন্দেহ। পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি-রচিত 'গোরক্ষবিজয়'-এর একখানি খণ্ডিত পুঁথির আবিষ্কার এই কাহিনীর প্রাচীনত্বের নিদর্শন। নাটকটি সংস্কৃতে লেখা ও ইহার গানগুলি মৈথিলী ভাষায় রচিত।

গোরক্ষবিজয়ের আদি কবি ও রচনাকাল

'গোরক্ষবিজয়'-এর কেন্দ্রস্থ অভিপ্রায় হইল নাথধর্মের কায়াসাধনের তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখবিভ্রান্ত মীননাথের চৈতন্য-সম্পাদন ও সাধনা-সংকল্প-উদ্দীপন। কাজেই তত্ত্বপ্রতিষ্ঠাই কাব্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এই তত্ত্বপ্রতিপাদনে লেখক কেবল নীরস, দুরূহ দর্শনভাবনাপরম্পরাই গ্রথিত করেন নাই, লোকজীবন হইতে সংগৃহীত নানা তথ্য ও অভিজ্ঞতার সরস প্রয়োগে ইহাকে কাব্যরসোত্তীর্ণ করিয়াছেন। সময় সময় গুহ্য-রহস্য-সঙ্কেত দিবার জন্য তিনি দুর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগে আমাদিগকে ধাঁধায় ফেলিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর তিনি সার্থক উপমা ও অলঙ্কার-সাহায্যে আমাদের মনে অনুকূল রসবোধই উদ্রিক্ত করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে তত্ত্বালোচনার মধ্যে যে সংহত অর্থগূঢ়তা, অচ্ছেদ্য যুক্তিশৃঙ্খলা ও দৃষ্টান্ত-সহযোগে জীবনরসের

গোরক্ষবিজয়ে তত্ত্বোপদেশ-প্রাধান্য

প্রয়োগদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উচ্চাঙ্গের মনন ও কাব্যকৌশলের নিদর্শন।

কিন্তু 'গোরক্ষবিজয়'-এ তত্ত্বপ্রাধান্য মানবিক আবেদনকে একেবারে অভিভূত করে নাই। আদর্শভ্রষ্ট গুরুর চৈতন্য-সম্পাদনের সুদীর্ঘ প্রয়াসের মধ্যে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই চরিত্র, পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত ও মনোভাবের দ্রুতগামী উত্থান-পতনের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা কাব্যখানিকে শুষ্ক ধর্মচর্চার উর্ধ্বে একটি নাটকীয় প্রাণময়তায় উন্নীত করিয়াছে। এই দীর্ঘ-প্রলম্বিত বাগ্-বিতণ্ডার মধ্যে—একদিকে যেমন গোরক্ষনাথের অসীম ধৈর্য, অটল অধ্যবসায় ও অবস্থানুযায়ী বিভিন্নরূপ উপায়-দক্ষতা দেখা যায়, সেইরূপ মীননাথেরও উৎসাহ-অবসাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, মুহুর্মুহু সংকল্প-শিথিলতা ও আত্ম-অবিশ্বাসের ওঠা-নামা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা গোরক্ষনাথ ও মীননাথকে কেবল দুই বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতীকরূপে দেখি না; তাহারা তাহাদের জীবনের সবটুকু শক্তি-দুর্বলতা, নিষ্ঠা-নীতিশৈথিল্য, অধ্যাত্ম-সংগ্রামরত দুই মানবাত্মার সমস্ত উত্তেজনা ও অবসাদ লইয়া আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছে। গোরক্ষনাথের গুরুর প্রতি মাতৃস্নেহকোমল ও মাতার ন্যায় দুর্জয় সংকল্পে কঠিন মনোভাবটি একটি আশ্চর্য সুন্দর পংক্তিতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে :—

গোরক্ষবিজায় মানবিকতা

বনপক্ষিগণ যেন না ছাড়ে বাছায়।

বৈরাগ্যব্রতনিষ্ঠ বাঙালীর মায়ামমতাভরা গৃহের প্রতি মধুর আকর্ষণ কোন দিনই নিঃশেষিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণপ্রেম সংসারত্যাগের কৃচ্ছ্রসাধনকে অলৌকিক পিরীতির নিবিড় মাধুর্য দিয়া আচ্ছাদন করিয়াছে—গৃহ ছাড়িয়া মিলনকুঞ্জে নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়াছে। রামপ্রসাদ ও শাক্ত কবিগোষ্ঠী শ্মশানের নরকঙ্কালাকীর্ণ সাধনক্ষেত্রে মাতৃস্নেহের ছায়ানিবিড় আশ্রয়ে নিঃশঙ্ক হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরাও প্রতিকূল দৈবের নির্যাতনকে দেবপ্রসাদলাভের সাধনারূপে কল্পনা করিয়া গৃহসুখের আশায় জীবনযন্ত্রণাকে সহ্য করিয়াছে। সেইরূপ নাথ-সাহিত্যেও আমরা ভোগাসক্ত পদস্খলিত প্রৌঢ় ইন্দ্রিয়াকর্ষণের বিদায়বেদনাটুকু উত্তুঙ্গ সাধনমহিমার দুর্গপ্রাকারের ফাঁক দিয়া উপলব্ধি করি। এই ধর্মধিকৃত প্রেমও কবির সহানুভূতি হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। তাই কদলীরানী মঙ্গলা ও গোরক্ষনাথের রূপমুগ্ধা কদলীবাসিনী নারী তাহাদের ব্যর্থ আকৃতি ও উচ্ছিন্ন

বাঙালীর প্রকৃতিজাত গৃহপ্রীতি

জীবনের করুণা দিয়া আমাদিগকে কাব্যের আদর্শবিরোধী সহানুভূতিতে ক্ষণিক বিচলিত করে।

৩

নাথধর্মের দ্বিতীয় গ্রন্থ—ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস—প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই কাহিনী বাংলা দেশকে অতিক্রম করিয়া সর্বভারতীয় প্রসার লাভ করিয়াছে। একখানি নেপালে প্রাপ্ত নাট্যপালার—'গোপীচন্দ্র নাটক'—(সপ্তদশ শতক)—বিষয় ডাঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং মনে হয় যে গোপীচন্দ্রবিষয়ক রচনা, বাংলা দেশের বাহিরেই আরম্ভ হয় এবং উহার প্রাচীনতর নিদর্শনগুলি বহির্বঙ্গ ভূভাগের সহিতই সংশ্লিষ্ট। বাংলা দেশের কবিগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই তাঁহাদের নিজের ঘরের কথার কাব্যসম্ভাবনা আবিষ্কার করিয়াছেন।

ময়নামতীর গানের সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা

'গোপীচন্দ্র'—আখ্যানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার একটি অমার্জিত লৌকিক রূপ বিভিন্ন-কবি-রচিত কাব্যশিল্পাত্মক রূপের সঙ্গে আধুনিক কাল পর্যন্ত সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ ছড়াটি অশিক্ষিত নাথ-যোগীদের মধ্যে মৌখিক আবৃত্তির সাহায্যে স্মৃতিবিধৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহা খাঁটি লোকসাহিত্যের ন্যায় যৌথ রচনার শিথিল বাগ্‌ভঙ্গী, পুনঃপুনঃ-আবৃত্ত ধুয়া, অতিপল্লবিত বর্ণনা-বাহুল্য ও ঘটনাবিস্তার প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত। প্রাকৃত জনসাধারণের উদ্ভট দেবকল্পনা ও পারলৌকিক সংস্কার ইহার মধ্যে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অনুশীলিত, শিল্পবোধসম্পন্ন কবিমন ও অনিয়ন্ত্রিতকল্পনাপ্রবণ, সূক্ষ্মরুচিহীন গণকবির রসস্পৃহা একই বিষয় হইতে কিরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির কাব্যপ্রেরণা গ্রহণ করে, এই দুই জাতীয় কাব্যে তাহার কৌতূহলোদ্দীপক নিদর্শন মিলে।

গোপীচন্দ্র পালার লৌকিক রূপ

গোপীচাঁদ-বিষয়-অবলম্বনে তিনজন কবির রচনা পাওয়া গিয়াছে। দুর্লভ মল্লিক-রচিত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', ভবানী দাস-রচিত ও কবি কর্তৃক অভিহিত 'অপূর্ব কথন' ও সুকুর মহম্মদ-রচিত 'যোগান্তপুঁথি' বা 'যোগীর পুঁথি'—নিতান্ত আধুনিক যুগে বিভিন্ন পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মূল বিষয় অভিন্ন হইলেও আখ্যান-বিবৃতি ও ঘটনা-সমাপ্তির মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

প্রভেদ লক্ষিত হয়। এই প্রভেদ হয়ত কবির সচেতন পরিবর্তনমূলক নহে; বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তীর রূপভেদভিত্তিক বলিয়াই মনে হয়। দুর্লভ মল্লিকের কাব্যে গোপীচন্দ্রের অকালমৃত্যুভয়ই যে তাঁহাকে সন্ন্যাস-গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল এরূপ ঘটনাবিন্যাস নাই। ময়নামতী যোগমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞা বলিয়াই পুত্রকে যোগে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছেন। ভবানী দাসের রচনা অনেকটা বৈষ্ণবপদাবলীপ্রভাবিত ও মাঝে মধ্যে কৌতুকরসোদ্দীপক। সুকুর মহম্মদের কাব্যে ময়নামতীকে কিছুটা স্বামিদ্বেষিনী করিয়া দেখান হইয়াছে ও মানিকচন্দ্র প্রখরা স্ত্রীর ভয়ে একমাত্র পুত্রের বিবাহ গোপনে অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই বিবৃতির দ্বারা ময়নামতীর প্রবল ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। গোরক্ষনাথ-চরিত্রেও তিনি খানিকটা হীনতা আরোপ করিয়াছেন ও হাড়িপাকেও কোপনস্বভাব ও নেশাসক্তরূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহার হাতে নাথ-সাহিত্য কিছুটা তত্ত্বশাসনাতিগ মনোভঙ্গী ও প্রথাবদ্ধ গঠনপদ্ধতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। কাব্যোৎকর্ষে, বর্ণনাকুশলতায় ও তত্ত্বপ্রতিপাদনের সরসতায় কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। ধর্মসাধনার নিগূঢ় প্রক্রিয়া ও সিদ্ধাদের অলৌকিক কার্যকলাপের সহিত এক প্রকার শিশুসুলভ কল্পনা-সংস্কার মিশ্রিত হইয়া কাব্যগুলিকে রূপকথাধর্মী করিয়াছে। আদিম যুগের কল্পনা-ভাবনার অসংস্কৃত আতিশয্য ও স্বেচ্ছাচারিতা পরিণত প্রজ্ঞার সংস্পর্শে বিলীন হইতে হইতে নাথগাথাগুলিতে উহার শেষ চিহ্নটি কালজয়ী সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে।

গোপীচন্দ্রের গানের কবিগোষ্ঠী ও কাব্যমূল্য

ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানে তত্ত্ব অপেক্ষা মানবিক আবেগেরই প্রাধান্য। ময়নামতী তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার জন্য ছেলেকে কায়সাধনার রহস্য শোনাইয়াছেন ও হাড়ির ছদ্মবেশে অবস্থিত সিদ্ধযোগী হাড়িপা বা জালন্ধরিপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। পুত্র নিতান্ত অনিচ্ছা-সহকারে এই হীনবর্ণের গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণে সম্মত হইল, কিন্তু গুরুর প্রতি তাহার প্রকৃত ভক্তি বোধ হয় কোন দিনই জন্মে নাই। গুরুও শিষ্যকে নানা অবাঞ্ছিত ও অমর্যাদাকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলিয়া তাহার ধর্মবোধের দৃঢ়তার পরীক্ষা লইয়াছে। এই সমস্ত পরিস্থিতির মাধ্যমে যে সমাজ-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা রুচিবোধ, সংস্কৃতির মান ও ধর্মচেতনার বিচারে কোন সমুন্নত উৎকর্ষের দাবি করিতে পারে না। পুত্র মাতার পরীক্ষার জন্য যে

আদিম জীবনবোধের বিস্ময়কর কাব্যরূপ

সমস্ত নৃশংস ও রূঢ় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাতে হয়ত ময়নামতীর যোগৈশ্বর্য বিস্ময়করভাবে ফুটিয়াছে, কিন্তু মাতা পুত্রের মধ্যে স্বাভাবিক স্নেহমমতাময় সম্পর্কটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। গুরুকে মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখার মধ্যে গুরু-শিষ্যের সহজ সম্বন্ধটি উহার সমস্ত মাধুর্য হারাইয়াছে। গোবিন্দ-চন্দ্রের যোগসাধনা যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, সে যে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হইয়াছে, তাহার সংসার-জীবনে ব্যগ্র প্রত্যাবর্তনে ও রানীদের তরলপ্রমোদপূর্ণ সঙ্গলিপ্সায় তাহার কোন প্রমাণ মিলে না। শেষ পর্যন্ত শিষ্য চিরসন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া গুরুর অনুগমন করিয়াছে—এই ঘটনা-নির্দেশের মধ্যেই আখ্যানের পরিসমাপ্তি। যে সমাজের পটভূমিকায় কাহিনীটি বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা হিংস্র, ক্রুর, বর্বরোচিত প্রবৃত্তির অমার্জিত উচ্ছ্বাসে, অসংবৃত ভোগলালসায়, শৈশব-সুলভ উদ্ভট কল্পনার আতিশয্যে এবং সমাজ ও পরিবার-জীবনের রূঢ়, সুষমাহীন ছন্দে এক অর্ধ-সভ্য, অপরিণত সংস্কৃতি ও জীবনবোধেরই পরিচয় বহন করে। এই অশিক্ষিত, আদিমসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ হইতেও যে এরূপ উন্নত, যথাযথ-ভাবপ্রকাশক্ষম, সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিস্ফুট করিতে নিপুণ, কাব্যগুণসমৃদ্ধ রচনার প্রেরণা আসিয়াছে ইহাই বাঙালী-জীবনের এক চিরন্তন বিস্ময়।

দ্বাদশ অধ্যায়

আরাকানের মুসলমান কবিগোষ্ঠী

১

বাংলার মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণ হিন্দুমুসলমানের পৌনঃপুনিক বিরোধে উত্তপ্ত ও বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল ইতিহাস আমাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করিয়াছে। কিন্তু বাংলার জীবনযাত্রা ও সাহিত্যচর্চার নিরুদ্বিগ্ন প্রবাহ এই ধারণার সম্পূর্ণ পোষকতা করে না। মাঝে মধ্যে ধর্মান্ধতার উগ্র অসহিষ্ণুতা জীবনের শান্তিকে নিশ্চয়ই বিঘ্নিত করিয়াছে ও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজ প্রীতি ও মিলনকামনাকে ক্ষুন্ন করিয়া উহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও অবিশ্বাসের প্রাচীর তুলিয়াছে। কিন্তু এই রেষারেষি ভাব সাময়িকভাবে উদ্দীপ্ত হইলেও মধ্যযুগের জীবনযাত্রার সাধারণ নিয়ম ছিল না। বোঝাপড়া ও মিলনের প্রবল আগ্রহ সমস্ত ধর্মমত ও সমাজপ্রথার পার্থক্য সত্ত্বেও এই প্রতিবেশী সম্প্রদায় দুইটিকে পরস্পরের নিকটে আকর্ষণ করিত। শাসনব্যবস্থার সুপরিকল্পিত নীতি নহে, পদস্থ ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচারপ্রবণতা ও আকস্মিক ঘটনাপ্রসূত বিক্ষোভই ইহাদের প্রীতিসম্পর্কটি বিচলিত করিত বলিয়াই মনে হয়। তবে বাঙলা দেশে এই সামাজিক সহৃদয়তা বিশেষ সাহিত্যিক প্রকাশ পায় নাই। কেননা মধ্যযুগীয় হিন্দু সাহিত্যের প্রধান প্রেরণা ছিল ধর্মপ্রচার ও ধর্মভাব-উদ্দীপন। সেখানে অপর সম্প্রদায়ের কথা বলিবার বিশেষ অবকাশ ছিল না। মুসলমান সুলতান, সেনাপতি ও উজীর হিন্দু কবিকে কাব্যরচনায় উৎসাহিত করিয়াছেন, পুরাণ—অনুবাদের প্রেরণা যোগাইয়াছেন ও তাঁহাদের রাজসভায় আগ্রহ সহকারে হিন্দুধর্মমতের আলোচনা শুনিয়াছেন। হোসেন শাহ্, নসরত শাহ্, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতি মুসলমান অভিজাতবর্গ নবোদ্ভিন্ন বাংলাকাব্যতরুর মূলে অনুরাগের রসসিঞ্চন করিয়া উহার বর্ধনে সহায়তা করিয়াছেন—শুধু এইটুকু উৎসাহদান ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্তই তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সম্মানজনক স্থানের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের উদার অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যপ্রীতি আরও প্রশংসনীয় এইজন্য যে তাঁহারা তাঁহাদের অনুগৃহীত হিন্দু কবিদের কাছে কাব্যে মুসলমান ধর্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রের আখ্যান প্রভৃতির অন্তর্ভুক্তির

মুসলমান পৃষ্ঠপোষণায় হিন্দুকবিদের কাব্যরচনার স্বাধীনতা

কোন শর্ত আরোপ করেন নাই। কাজেই হিন্দু কবিরা রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা গাহিতে গাহিতে বা মহাভারত-রামায়ণের অনুবাদ করিতে করিতে কৃতজ্ঞতার ঋণশোধের চিন্তায় বিব্রত হন নাই; তাঁহাদের দেব-দেবীর প্রশস্তি-রচনায় তাঁহারা হৃদয়ের অবিভক্ত ভক্তি অর্পণ করিবার স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন। কেবল মাঝে মধ্যে ভণিতায় তাঁহাদের হিতৈষী রাজন্যবর্গের স্তুতি করিয়াই তাঁহারা আপনাদের ঋণমুক্ত করিতেন। মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে হিন্দু বা মুসলমান কোন কবিই এই যুগে আমাদের কৌতূহল মিটাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই।

অকস্মাৎ বঙ্গদেশের বাহিরে ব্রহ্মদেশের সীমান্তস্থিত আরাকান রাজ্যের মগ রাজাদের রাজসভায় মুসলমান কবির প্রাদুর্ভাব হইল ও তাঁহাদের কাব্যে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন যে কত গভীর হইয়াছে তাহার অপ্রত্যাশিত নিদর্শন পাইয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়া এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে বাংলা কাব্যের এরূপ অভাবনীয় সমৃদ্ধ বিকাশ কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহার নিগূঢ় কারণটি আমাদের অপরিজ্ঞাত। আরাকানের বৌদ্ধ রাজাদের সহিত বাংলা সাহিত্য ও চিন্তাধারার কতখানি অন্তরঙ্গ সংযোগ ছিল তাহা নির্ধারণ করা দুরূহ। বাংলা দেশের সঙ্গে আরাকান রাজবংশের প্রত্যক্ষ যোগ ঘটে ১৪০৪ খ্রীঃ অঃ—সেই বৎসর রাজা নরমেইখলা (১৪০৪ খ্রীঃ-১৪৩৪ খ্রীঃ) ব্রহ্মরাজ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া বাংলার পাঠান সুলতানের সাহায্যপ্রার্থীরূপে গৌড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও ১৪৩০ খ্রীঃ অঃ গৌড়াধিপতির সহায়তায় তাঁহার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। বাংলা দেশে দীর্ঘপ্রবাসের ফলে হয়ত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত তাঁহার কিছুটা পরিচয় ঘটে। এই সাংস্কৃতিক সংযোগ চট্টগ্রাম-বিজয়ের ফলে নিশ্চয়ই নিবিড়তর হয়। দৌলত কাজি ও আলাওলের সময় পর্যন্ত চট্টগ্রামের কিছুটা আরাকান-রাজের অধিকারভুক্ত ছিল। সুতরাং মনে হয় পঞ্চদশ শতকে আকস্মিক দুর্দৈবে যে সম্পর্কের সূত্রপাত হয় তাহা সপ্তদশ শতক পর্যন্ত প্রধানতঃ চট্টগ্রাম-প্রচলিত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে একটা স্থায়ী মানস সংস্কারে পরিণতি লাভ করে। ইহারই সুদূরপ্রসারী ও বহুশতাব্দীব্যাপ্ত প্রভাবে শ্রীসুধর্ম (১৬২২-১৬৩৮ খ্রীঃ অঃ) ও তাঁহার পরবর্তী শ্রীচন্দ্র সুধর্মের (১৬৫২ খ্রীঃ-১৬৮৪ খ্রীঃ অঃ) আমলে আরাকান রাজসভায় দুইজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবির—কাজি দৌলত ও আলাওলের—আবির্ভাব হয়।

আরাকানে বাংলা-চর্চার পটভূমি

উপরি-উল্লিখিত কার্যকারণসম্পর্ক ও প্রতিবেশ-প্রভাবও, যাহা ঘটিয়াছিল তাহার ব্যাখ্যারূপে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মনে হয় না। এই দুই কবির গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, রাজা নহে, দুই রাজার দুই প্রধান অমাত্য—আশরফ খাঁ লস্কর ও মাগন ঠাকুর। ইঁহাদের বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ রাজসভাবপ্রভাবলব্ধ না হইয়া জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। ইঁহারা আরবী, পারসী, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি বাংলার প্রতিবেশী ভাষা ও সাহিত্য হইতে সংগৃহীত ভাবরস-আস্বাদনে উন্মুখ, জটিল-উপাদান-গঠিত বৃহত্তর ভাবপরিমণ্ডলে বিচরণশীল, অভিজাত-বংশীয় বাঙালী ছিলেন। ইঁহারা কবিদের যে ফরমায়েস করিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহাদের মানস রুচি স্বয়ং-প্রকাশিত। আশরফ খাঁ দৌলত কাজিকে লোর-চন্দ্রানীর আখ্যান হিন্দী হইতে বাংলায় বর্ণনা করিবার নির্দেশ দেন ও মাগন ঠাকুরও আলাওলকে হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জয়সীর পদ্মাবৎ কাব্যকে বাংলা রূপ দিবার জন্য ফরমায়েস করেন। এই আখ্যান দুইটি যে ঠিক মুসলমান ভাবধারা-প্রভাবিত তাহা নহে। 'লোর চন্দ্রানী' সম্পূর্ণরূপেই হিন্দুভাবাদর্শানুসারী; 'পদ্মাবতী'তেও কাহিনীভাগের মধ্যে ইসলামী জীবনযাত্রার কিছু সংমিশ্রণ থাকিলেও ইহার আলোচনা-রীতি প্রধানতঃ হিন্দুজীবনদর্শনাশ্রয়ী। সুতরাং ইহাদের আকর্ষণ, আখ্যানের অভিনবত্ব, বাংলাকাব্যপ্রচলিত, বহুধা-পুনরাবৃত্ত পৌরাণিক পরিমণ্ডলের সীমাতিক্রম। ইহাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ধর্মপ্রভাবোত্তীর্ণ মানবিক প্রেমের কাব্যরূপায়ণ। এই কাহিনীগুলিতে বিষয়ের অভিনবত্বের সঙ্গে আস্বাদন-বৈচিত্র্য যুক্ত হইয়া ইহাদের মধ্যে এক নূতন রসসঞ্চার হইয়াছে। আলাওলের অন্যান্য কাব্যগুলি—'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল' (১৬৫৯), 'সপ্তপয়কর' (১৬৬০), 'তোহফা' (১৬৬৪), 'সেকেন্দরনামা' (১৬৭৬)—উর্দু ও পারস্যভাষায় রচিত গ্রন্থের স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ ও ইহাদের মধ্যে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও সমাজবিধি এবং সে যুগের মুসলমান বিদগ্ধজনের রুচিবৈশিষ্ট্য ও জীবনায়নের একটি বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

পৃষ্ঠপোষকদ্বয়ের রুচি ও কাব্যবৈশিষ্ট্য

কিন্তু এই কাব্যরচনায় সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রভাব হইল রাজামাত্যবৃন্দ ও কবিদ্বয়ের ব্যক্তি-পরিচয়। লস্কর উজীর আশরফ খাঁ ও কাজি দৌলত উভয়েই চট্টগ্রামবাসী ছিলেন—চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ ছড়ান আছে। আলাওলের পিতৃভূমির যে পরিচয় তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে পুনরাবৃত্ত, তাহার

পৃষ্ঠপোষকদ্বয় ও কবি-যুগলের ব্যক্তি-পরিচয়

অনিশ্চয়তায় নানা জল্পনা কল্পনা-অনুমানের এক দুর্ভেদ্য অরণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। তবে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর যে পুরুষানুক্রমে রোসাঙ্গে বাস করিতেন ও উহাই কার্যতঃ তাঁহার স্বদেশ ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবসর নাই। আশরফ খাঁ লস্কর ও মাগন ঠাকুর উভয়েই বাঙালী ছিলেন বলিয়া বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি সহজাত। কিন্তু তাঁহারা যে অনুকূল দৈববশে মধ্যযুগের দুইজন শ্রেষ্ঠপ্রতিভাসম্পন্ন কবিকে তাঁহাদের সভাসদরূপে লাভ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের মনে কাব্যপ্রেরণা উদ্দীপিত করিয়াছিলেন ইহা বাংলা সাহিত্যের একটা আশাতীত সৌভাগ্য। রাজসভায় সাধারণতঃ যে সব হীনশক্তি কবিযশঃ-প্রার্থী লেখক আতিশয্যস্ফীত চাটুবাক্যের দ্বারা মুনিবের মনোরঞ্জন করেন, এই দুই কবি তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। খাঁচায় পোষা কর্কশভাষী ময়নার পরিবর্তে আমরা অকস্মাৎ সুধারসস্রাবী, গগনবিহারী পাপিয়াদ্বয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম।

কাব্যানুরাগ ও কবির প্রতি আনুকূল্য রোসাঙ্গ রাজসভাসদবর্গের অনেকেরই স্বভাবজাত ছিল। আলাওলের প্রতি অনুগ্রহশীল হিতৈষীর অনেকেরই নাম কবির বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে এবং কবি সকলের প্রতি প্রায় একই ভাষায় নিজ অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠপোষককেই তিনি নানা গুণের অধিকারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ও সকলের প্রতিই তাঁহার বিনীত আনুগত্য ও উচ্ছ্বসিত ঋণস্বীকার আমাদের মনে তাহাদের সত্যিকার গুণবত্তা সম্বন্ধে কিঞ্চৎ খটকা জাগায়। লোর-চন্দ্রানী ও সয়ফুলমুলুক বদি-উজ্জমালের—প্রথমাংশে রাজার অর্থভাণ্ডারী শ্রীসোলেমান ও দ্বিতীয়াংশে সৈয়দ মুছা, 'সেকেন্দরনামা'-তে শ্রীমন্ত মজলিস, 'সপ্তপয়কর'-এ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়দ মহাম্মদ ও 'তোফায়' শ্রীমন্ত সোলেমান কবির কাব্যচর্চায় সহায়তা করিয়া ও তাঁহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার কবিখ্যাতির অংশভাক্ হইয়াছেন। বাংলার প্রত্যন্ত-প্রদেশ-সন্নিহিত এক বৌদ্ধ রাজবংশের সভাসদমণ্ডলীতে এত অধিকসংখ্যক বাংলা কাব্যানুরাগী ও কবির প্রতি সহানুভূতিশীল বিদগ্ধরুচি ব্যক্তি ছিলেন ইহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এই কাব্যপ্রীতি কতকটা প্রথানুসৃতিমূলক ও প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক হইলেও উহার ব্যাপকতা ও আন্তরিকতা যে একটি দুর্লভ মানসপ্রবণতা তাহা স্বীকার করিতেই হয়। রোসাঙ্গ রাজসভার আকাশে-বাতাসে এমন কোন কুহকমন্ত্র ছিল যাহাতে বাংলা কাব্যের শুষ্ক তরু নূতন

রোসাঙ্গ রাজসভায় প্রভূত বঙ্গসাহিত্য-প্রীতি

রসাকর্ষণ করিয়া ফুলে-ফুলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে ও অভিজাতবংশীয়দের অভ্যস্ত বিলাসব্যসন নিজ স্থূল রুচি ভুলিয়া সৎপ্রসঙ্গ ও সৌন্দর্যসৃষ্টির রসাস্বাদনে তন্ময় হইয়াছে। এই রাজসভায় কিন্তু হিন্দু ভাবসাধনা অপেক্ষা ইসলাম আদর্শের চর্চাই বেশী প্রচলিত ছিল ও বিভিন্ন রাজা বিকল্প মুসলমানী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হইতেছে আলাওলের ভাগ্যচক্রঘূর্ণিত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ও সর্বতোমুখী ব্যুৎপত্তি। বোধ হয় বাংলার কোন কবিরই জীবনে এরূপ রোমাঞ্চকর ভাগ্যবিপর্যয় ও সর্বস্তরবিন্যস্ত মানস সম্পদ সঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার আত্মকাহিনী হইতেই জানা যায় যে কবি এক রাজ-অমাত্যের পুত্র ছিলেন। যৌবনে তাঁহার পিতার সঙ্গে নৌকাযাত্রার সময় তিনি হার্মাদ জলদস্যুদের হাতে পড়েন। এই যুদ্ধে পিতা প্রাণত্যাগ করিয়া সহীদ হন, পুত্র ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় রোসাঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও আরোগ্য-লাভের পর রাজার অশ্বারোহী সৈন্যদলে যোগ দেন। এই সময় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তির জন্য মাগন, সোলেমান প্রভৃতি রাজামাত্যবর্গের সহিত তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ও তিনি ইঁহাদের নিকট প্রভূত সম্মান ও সমাদর লাভ করেন। এই সময় ভাগ্যচক্রের আবর্তনে আবার তিনি ঘোর বিপদে পতিত হন। সাজাহান-পুত্র শাহ্ সুজা আরাকান-রাজ্যে আশ্রয় লইয়া আরাকান-রাজের বিরাগভাজন হন ও ইতিহাস-বিখ্যাত এক নির্মম চক্রান্তে তাঁহাকে সপরিবারে প্রাণ বলিদান দিতে হয়। কবি আলাওল শাহ্ সুজার পক্ষাবলম্বী বলিয়া মিথ্যা অভিযোগে জড়িত হন ও এগার বৎসর রাজরোষের পাত্ররূপে কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর জরাজীর্ণ দেহ ও দারিদ্র্যপিষ্ট জীবন লইয়া তিনি অনেক দুঃখে সময় কাটান—এমন কি দারিদ্র্যের যে সর্বনিম্ন ধাপ ভিক্ষুকত্ব, তাহাতেও তাঁহাকে অবতরণ করিতে হইয়াছিল সে কথারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ নানা উত্থান-পতন-বন্ধুর, দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছিত জীবনযাত্রার মধ্যে তিনি যে কখন তাঁহার বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার আহরণের সময় পাইয়াছিলেন তাহা আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু এই সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্য ও রুচিপ্রকর্ষের নিদর্শন তাঁহার প্রতি গ্রন্থের পাতায় পুঞ্জীভূত। বহুমুখী জ্ঞানের দিক দিয়া তিনি বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। বিদ্যাপতির জ্ঞান সংস্কৃত শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা ও কয়েকটি লৌকিক আঞ্চলিক ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আলাওল

আলাওলের বিচিত্র জীবন ও সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্য

হিন্দু ও ইসলাম এই উভয়বিধ জ্ঞান বিষয়ে সমান পারদর্শী; এবং জ্ঞানের যে সমস্ত বিভাগ সাধারণ পণ্ডিতের অনধিগম্য সেই যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ-অধিগত বিষয়েও তাঁহার অবাধ ও স্বচ্ছন্দ অধিকার। কাজী-দৌলতের জীবনকাহিনী অজ্ঞাত, কিন্তু হিন্দুধর্ম ও যোগসাধনার নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে তিনি আলাওলের প্রায় সমকক্ষ।

২

কাজী-দৌলতের 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী' ১৬২২ হইতে ১৬৩৫ খৃঃ অঃ-র মধ্যে শ্রীসুধর্মের রাজত্বকালে (১৬২২—১৬৩৮) রচিত হয়। গ্রন্থারম্ভে কবি আল্লা ও মহম্মদের বন্দনা করিয়া তাঁহার মুসলমান ধর্মে গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। ঈশ্বর-বন্দনার মধ্যে তিনি ইসলাম-আদর্শ-অনুযায়ী ভগবৎ-মাহাত্ম্য ও তাঁহার নিকট একান্ত আত্মসমর্পণের যে কথা বলিয়াছেন তাহার প্রকাশভঙ্গী হিন্দু ভক্তিবাদ হইতে কিছুটা স্বতন্ত্র হইলেও ইহার উদার ও সার্বভৌম ভাবটি ধর্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে সর্বজনগ্রাহ্য। মহম্মদ-প্রশস্তিতে তাঁহার অপার-শক্তি-দ্যোতক উপমা-প্রয়োগও ভাষায় ও ভাবে কিছুটা অভিনব।

লোর-চন্দ্রানীর প্রারম্ভিক প্রশস্তি

অঙ্গুল-ইঙ্গিত-শরে শশী দুই খণ্ড করে
প্রলয়-সমান তান দাপ ॥
মুসলমানী মূল বাতি যার তেজে জ্বলে নিতি
না নিবায়ে বায়ু-বৃষ্টি-জলে।

তাহার পর রোসাঙ্গরাজের প্রশস্তি-উপলক্ষ্যে তাঁহার দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসনের চিত্র হিন্দু পুরাণের উল্লেখসংবলিত নূতন দৃষ্টান্তপরম্পরার সাহায্যে অঙ্কিত হইয়াছে।

মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি।
রাজভয়ে মাতঙ্গে না যায় তারে ঠেলি ॥
বিধবা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্নভার।
ভীমসম বলীও না করে বলাৎকার ॥
সীতা সম সুন্দরী যদি রহে সে বনে।
রাজ-ভয়ে না নিরক্ষে সহস্রলোচনে ॥

রাজার নৌকাবিহার ও বনপার্শ্বে শিবির-সন্নিবেশ-বর্ণনায় ঐশ্বর্যদীপ্তিপ্রকাশের

পিছনে একদিকে সুবিন্যস্ত বর্ণবৈভব, অন্যদিকে নূতন বস্তুরসচেতনা পরিস্ফুট। নায়িকা ময়নামতীর রূপবর্ণনা সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতকাব্যপ্রথানুগামী। তাহার স্বামী লোর তাহাকে ফেলিয়া বনবিহারে গেলে তাহার বিরহদুঃখাভিব্যক্তিও প্রাচীনছন্দশাসিত। তাহার পর চন্দ্রানীর সহিত তাহার স্বামী খর্বাকার বামনের দাম্পত্যসম্ভোগহীন অদ্ভুত সম্পর্ক ও চন্দ্রানীর স্বামী-মিলন-প্রত্যাশার বারবার ব্যর্থতায় তাহার অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত খণ্ডিতা নায়িকার মনোবেদনার অনুভব বর্ণিত হইয়াছে। এই স্ত্রীসম্ভাষণবিমুখতার জন্য ধাত্রীকর্তৃক বামনের গঞ্জনা চমৎকারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :—

চন্দ্রানীর ব্যর্থ দাম্পত্য জীবন

কাপুরুষ না শোভয় রমণী সম্পাশ।
লবণ উদকে নহে কুমুদ-বিকাশ॥
... ...
এতেক তোমার যোগ্য না হবে কুমারী।
মণ্ডুকের ভোগ কোথা অমৃত—মাধুরী॥
... ...
যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা।
তস্করেত ধর্মকথা বেশ্যাকে ভৎর্সনা॥

বামনের সঙ্কোচশ্লথ অন্তঃপুরযাত্রা অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের অনিচ্ছাকৃত মন্থর অন্তর্ধানের চমৎকার উপমাটি কবিকে স্মরণ করাইয়াছে। রাজকন্যা অতঃপর স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সখীজনপরিবৃত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে ও পর্বসময়ে দেবমন্দিরে পূজা দিবার সময় মন্দিরযাত্রী কাহারও কাহারও চোখে পড়ে। এক যোগী এই সংবাদ রাজপুত্র লোরের নিকট আনিল।

অতঃপর লোর চন্দ্রানীকে দেখিতে গোহারি-রাজপুরে অতিথি হইয়াছে। কবি লোরের এই প্রিয়াসন্দর্শনের জন্য যাত্রাকে বিদ্যার জন্য সুন্দরের প্রণয়াভিসারের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার আখ্যায়িকাকে একটি সুপ্রসিদ্ধপ্রথানুগত কাহিনীপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাহার পর উভয়ের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার, দূতীপ্রেরণের দ্বারা মিলনের উপায়-নির্ণয়, দড়ির সিঁড়ি-সহযোগে প্রণয়ীর প্রণয়িনার কক্ষে প্রবেশ ও পরস্পরের রূপমুগ্ধ প্রেমিকযুগলের আবেশময় মিলন একদিকে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর প্রথা, অপরদিকে রোমিও-জুলিয়েটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে। এই

লোর ও চন্দ্রানীর মিলন

উভয় রীতির সংমিশ্রণে প্রেমকাহিনীটি যেন একটি নূতন আস্বাদ পাইয়াছে। কয়েকদিন মিলনের পর চন্দ্রানী নিজ স্বামী বামনের প্রতিহিংসা ও নিজের কলঙ্কভয়ের কথা উল্লেখ করিয়া লোরকে তাহাকে সঙ্গে করিয়া দেশত্যাগ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সীতার সহিত তুলনা আমাদের মনে কিঞ্চিৎ কৌতুকরসের উদ্রেক করে।

জীবনে কি ফল যদি কলঙ্ক রহিল।
কলঙ্কের ভয়ে সীতা পাতালে নামিল॥

ইহার পর প্রেমিকযুগলের বনাভিমুখে পলায়ন, বামনের পশ্চাদ্ধাবন, বামন ও লোরের দ্বৈরথ যুদ্ধ ও জয়-পরাজয়ের নানা পরিবর্তনস্তরের মধ্যে শেষ পর্যন্ত লোরের জয় ও বামনের মৃত্যু আমাদিগকে ঘটনাপরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। দ্বৈরথ যুদ্ধের বর্ণনায় পৌরাণিক স্মৃতি খুব সুস্পষ্ট হইলেও ইহা কেবল রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনায় অনুকৃতিমাত্র নহে। ইহার মধ্যে কিছুটা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও যোদ্ধাদ্বয়ের মানস প্রতিক্রিয়ার নিদর্শন অনুভবগম্য।

বামনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও মৃত্যু

এই পর্যন্ত প্রেমকাহিনীবিবৃতির পর লেখক অকস্মাৎ অতিপ্রাকৃতের মোহগ্রস্ত হইয়াছেন। মধ্যযুগের কবির বাস্তব চেতনার সঙ্গে দৈবসংঘটন, পরলোকচিন্তা ও অলৌকিক রহস্যের স্ফুরণ প্রায় অব্যবহিতভাবে সংলগ্ন থাকিত। বিশেষতঃ রোমান্স-কাহিনীর মধ্যে অপ্রাকৃতের বীজ গোড়া হইতেই উপ্ত ছিল —প্রেমাঞ্জনলিপ্ত চক্ষুর সম্মুখে পরলোকের রহস্যদ্বার সর্বদাই উন্মোচিত হইতে প্রস্তুত থাকিত। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে কালিকার অনুগ্রহ প্রেমানুভূতির সঙ্গে অলৌকিক শক্তির সহাবস্থাননীতিরই রূপক প্রকাশ। ভাবতন্ময় প্রেমিক ভাবতন্ময় সাধকের একটা পূর্বাবস্থার সূচক, বস্তুবাধা-উল্লঙ্ঘনের একটা পূর্ববর্তী সোপান। এখানে বোধ হয় মনসামঙ্গলের প্রভাবেই চন্দ্রানীর সর্পদংশনে মৃত্যু ও পৌরাণিক দৃষ্টান্ত-উদ্ধারের আশ্রয়ে এক ঋষির যোগবিভূতিপ্রকাশে তাহার পুনর্জীবনপ্রাপ্তির বর্ণনায় লেখক অতি সহজেই অলৌকিক রাজ্যে পদক্ষেপ করিয়াছেন। মৃত্যু কবিকে জীবনের নশ্বরতাবিষয়ক অধ্যাত্ম চিন্তার অবসর দিয়াছে।

চন্দ্রানীর মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভ

যত শক্তি করে যেই যতেক বিক্রম।
আসিতে বীরের মত যাইতে অন্ধসম॥

মহাজন-মৃত্যু যেন স্থানান্তরে যায়।
মহাসেতু লজ্ঘিয়া কাঞ্চনপুরী পায়॥

ভারতের শাশ্বত অধ্যাত্মতত্ত্ব কত সহজে, কিরূপ অস্থিমজ্জাগত সংস্কারের ন্যায় মুসলমান কবির মুখে ধ্বনিত হইয়াছে!

ইহার পর দ্বিতীয় খণ্ডে পতি-পরিত্যক্তা অভাগিনী ময়নামতীর কথা দীর্ঘকাল ব্যবধানে কবির মনে পড়িয়াছে। এক প্রতিবেশী রাজপুত্র ছাতনকুমার ময়নার রূপমুগ্ধ হইয়া রতনা মালিনীকে কুট্টনীরূপে ময়নার নিকট দৌত্যকার্যে প্রেরণ করিয়াছে। রতনা মালিনী নিজেকে ময়নার শিশুকালের ধাত্রী বলিয়া মিথ্যা পরিচয়ে তাহার পরিবারে স্থান লাভ করিয়াছে ও রতিশাস্ত্র-নির্দিষ্ট উপায়ে তাহার মনে কামপ্রবৃত্তি উদ্রেক করিতে চাহিয়াছে। এই মালিনী ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীর পূর্বসূচনা। তাহার বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাহার কার্যক্রম বহু-প্রসারিত ও বিবিধ-উপায়-প্রয়োগ-চিহ্নিত।

ময়নাবতী ও রতনা

মধুরসস্থল তুণ্ড হৃদয় গরলকুণ্ড
কপট মন্ত্রণা দমনক।

ময়নার নিকট দূতী সুযোগসন্ধানীরূপে প্রতীক্ষা করিতেছে;

যেন শুক-বধ-আশে মার্জার খোপেতে বৈসে,
শিবা যেন মৃগের বিনাশ।

কিন্তু

বিধি রক্ষা করে যারে বক্ষ নহে কেশ-অগ্রে,
তার ছায়া না লজ্ঘে সংসারে।
বিপরীত বায়ুবলে সত্যঘট নাহি টলে
সতীত্বকে টলাইতে নারে॥

কবি কাব্যপ্রসিদ্ধ বারোমাস্যা-প্রথাকে এক নূতন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রতি মাসে নায়িকার বিরহক্লেশ দূতীর সহানুভূতি উদ্রেক করিয়া দূতীকর্তৃক নায়িকাকে পরপুরুষমিলনের প্রতি প্ররোচনা দিবার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রতি ঋতুতেই সুমতি-কুমতির একটা খণ্ডযুদ্ধপালা অভিনীত হইয়াছে। নায়িকা দূতীর প্রলোভনকে জয় করিয়া সতীত্বের মহিমা ঘোষণা করিয়াছে। নায়িকা ও দূতীর এই উত্তর-প্রত্যুত্তর সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণবকাব্যপ্রভাবিত। প্রকৃতিবর্ণনায়, সংস্কৃতমিশ্র ব্রজবুলি ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগে, ছন্দোবিন্যাসে ও ধ্বনিপ্রবাহে, বিরহিনী নায়িকার অন্তর-চিত্র-

বৈষ্ণব প্রভাব

উদ্‌ঘাটনে, নীতিতত্ত্বপ্রতিপাদনে—সর্বত্রই পদাবলী-সাহিত্যের, বিশেষতঃ বিদ্যাপতির প্রভাব এত সুপরিস্ফুট যে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে একজন মুসলমান কবি নিজ বিশিষ্ট ধর্মমত ও সমাজনীতিসত্ত্বেও এমন অকুণ্ঠভাবে পদাবলীভাবরসে কেমন করিয়া আত্মনিমজ্জন করিতে পারিয়াছেন। নূতনত্বের মধ্যে শ্রাবণ-প্রকৃতি বর্ণনায় বৃন্দাবনের শ্যামলতমালকুঞ্জের সহিত বাংলার শ্যাম শস্যক্ষেত্রের বাস্তব সৌন্দর্য মিলিত হইয়াছে।

শ্যামল অম্বর শ্যামল খেত-খেতি।
শ্যাম লখি দশ দিশ দিবসক যুতি (জ্যোতি)॥

এমন কি দিনের জ্যোতি পর্যন্ত শ্যামরসস্নিগ্ধ। এখানে কবি প্রথাশাসনমুক্ত নিজ স্বাধীন পর্যবেক্ষণশক্তির সদ্‌ব্যবহার করিয়াছেন।

মনন-স্বাতন্ত্র্য

বৈশাখ মাসে মালিনীর প্ররোচনার মধ্যে কিছুটা মনন-স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। যৌন আকাঙ্ক্ষা সমস্ত সুকোমল হৃদয়বৃত্তির প্রসূতি—যেখানে ইহার অভাব সেখানে মানুষ পশুস্বভাবাপন্ন ও কঠিনহৃদয়।

যাহার হৃদয়ে নাহি প্রেমের সন্ধান।
রূপে নরাকৃতি সেই হৃদয় পাষাণ॥
প্রেম প্রীতি দয়া মায়া কাম-নৃপ-সখা।
সে সকল মিত্র সঙ্গে কারো নাহি দেখা॥

কামের অনুকূলে এই যুক্তি প্রায় আধুনিক যুগের চিন্তা-স্বাধীনতার সমপর্যায়ভুক্ত।

এইখানে দৌলত কাজী-রচিত কাব্যটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হইয়াছে। কবির মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে তৎকালীন রোসাঙ্গরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মের মহাপাত্র সোলেমান এই অসম্পূর্ণ কাব্য সম্পূর্ণ করিবার ভার আলাওলের উপর ন্যস্ত করেন। আলাওল তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করিয়া অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে এই গুরুদায়িত্ব স্বীকার করেন। এক কবির পরিত্যক্ত কাজ আর এক কবির পক্ষে সম্পূর্ণ করা হয়ত তাঁহার পক্ষে স্বভাবানুমোদিত ও রুচিকর না হইতে পারে।

লোর-চন্দ্রানীর শেষ অধ্যায় ও আলাওল

বিশেষতঃ আলাওলের কবিকল্পনা এই বিষয়ের মানবিক রস ও আবেদন-গভীরতার ক্রমবিবর্তনের প্রতি নিবিষ্ট না থাকিয়াই একেবারে ইহার পরিসমাপ্তি-অংশে মনোযোগী হইতে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই এখানে চর্বণস্বাদুতার সঙ্গে অন্তিম পরিপাক-প্রক্রিয়ার, জারকরসনিঃসৃতির মাধ্যমে, স্বাভাবিক যোগসাধন হয় নাই।

আলাওল সম্পূর্ণ অনৈসর্গিক কাহিনীর অবতারণা করিয়া ঘটনার শেষ অংশটুকু জুড়িয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ মালিনী রতনার নির্বন্ধাতিশয্যে ময়নাবতীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে এবং নায়িকা যুক্তিখণ্ডনের সরল পথ ছাড়িয়া প্রহারের রুক্ষ পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইহাতে নায়িকার যে মর্যাদাহানি ও জাতিচ্যুতি হইয়াছে তাহা বোধ হয় কবি উপলব্ধি করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ একটি বাস্তবসম্পর্কহীন রূপকথার কাহিনীর দৃষ্টান্তে তিনি নায়িকার বিধ্বস্ত ধৈর্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন ও এক সারীপক্ষী ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চতুর দৌত্যের উপর দীর্ঘ-বিচ্ছিন্ন পতি-পত্নীর মিলনসাধনের ভার অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপে খুব দ্রুত ও কৃত্রিম উপায়ে ও জীবনগভীরতার সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কভাবে এই গ্রন্থের উপসংহার হইয়াছে। এই গ্রন্থে কবিত্বশক্তিতে আলাওলের আপেক্ষিক অপকর্ষ প্রমাণিত হইলেও ইহা তাঁহার কাব্যোৎকর্ষের চূড়ান্ত মানদণ্ডরূপে গ্রহণীয় নয়।

দৌলত-কাজীর এই কাব্যটির প্রারম্ভিক দুই তিন সর্গ বাদ দিলে ইহাতে তাঁহার মুসলমান মানসিকতা ও সংস্কৃতির বিশেষ কোন পরিচয় নাই। সুফী ধর্ম ও বৈষ্ণব প্রেমসাধনাতত্ত্বের মধ্যে একটি সহজ ঐক্য থাকায় কাজী-দৌলতের অধ্যাত্ম ভাবপ্রতিবেশ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। তাঁহার ভাষাপ্রয়োগ ও বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে উন্নত কবিকল্পনা ও প্রকাশশক্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। তাঁহার উপমা ও দৃষ্টান্তগুলি প্রায় সমস্তই হিন্দুপুরাণ হইতে আহৃত। তাঁহার বারোমাস্যা অংশ সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণবকল্পনাপ্রভাবিত। তবে বর্ণনা ও আখ্যানবিবৃতির মধ্যে সময় সময় যে মৌলিক মনন ও অনুভূতির স্পর্শ মিলে তাহা তাঁহার মুসলমান ভাবপ্রতিবেশের পরোক্ষ ফল বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার ও আলাওলের ক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কৃতির পরিবেশনে একটা সংযত উচ্ছ্বাস ও ধীর মননের সুচিন্তিত প্রয়োগ দেখা যায়—ইহা অনভ্যস্ত ক্ষেত্র-বিচরণের সতর্ক-পদক্ষেপ-প্রসূত। একজন হিন্দু কবি চিরাভ্যস্ত সংস্কারের ফলে যে ভাবপ্রবাহে নিজেকে আবেগ-উচ্ছলতায় ভাসাইয়া দিতেন, মুসলমান কবি সেখানে যুক্তির রজ্জু ধরিয়া চিন্তাশীলতার লগিতে গভীরতার মাপ করিতে করিতে সতর্ক পদে অগ্রসর হইয়াছেন। স্রোত-বিথার জলে দাঁড়াইয়া কূলের কুকুরের কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। বিশেষতঃ কবি আখ্যানের নির্বাচনে ও উহার বিস্তারিত রূপায়ণে নূতন স্বাধীনচিত্ততা ও কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। লোরের সহিত বিবাহিতা চন্দ্রানীর সমাজবিগর্হিত প্রণয়সম্পর্ক একজন হিন্দুসংস্কারপুষ্ট লেখকের মনে যে বিরুদ্ধতা জাগাইত,

দৌলত-কাজীর কবি-কল্পনা-বৈশিষ্ট্য

অথবা স্নেহপ্রশ্রয়ের কৈফিয়ত যোগাইত তাহা মুসলমান কবির মনে সেরূপ কোন নীতিগত সংশয়ের প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই। এইখানেই একটি রুচিবিষয়ক পার্থক্য দেখা যায়। তাহা ছাড়া, কাজি-দৌলতের রচনায় যে স্মরণীয় সুভাষিতাবলীর প্রাচুর্য লক্ষিত হয় তাহা একদিকে তাঁহার সমাজ-অভিজ্ঞতা ও মননের উৎকর্ষ, অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের সহিত তাঁহার কবিপ্রতিভার সাম্যের পরিচয় বহন করে।

৩

আলাওলের জীবনে চমকপ্রদ ঘটনাবৈচিত্র্য ও অভাবনীয় অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানের পরিধি একদিকে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনীতির কুটিল চক্রান্তজাল হইতে অপরদিকে নিঃসঙ্গ যোগসাধনা, গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতি ও হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মে অসাধারণ শাস্ত্রব্যুৎপত্তি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাঁহার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনাকৃতি চরম সিদ্ধিরূপ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পদ্মাবতী কাব্য (১৬৫১) মালিক মহম্মদ জয়সীর "পদুমাবৎ" কাব্যের ভাবানুবাদ। কবির অনুবাদে সিদ্ধহস্ততা সংস্কৃত ও আরবী উভয় ভাষার বাংলাতে রূপান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভাবপ্রবাহ ও প্রকাশদক্ষতা মৌলিক রচনারই অনুরূপ। জয়সীর পদুমাবৎ কাব্য প্রেমকাহিনীর রূপকে অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাস।

আলাওলের অসাম্প্রদায়িক মিলনাকৃতি

আলাওল এই অধ্যাত্ম রূপকটিকে তাঁহার কাব্যে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। রতন সেনের পদ্মিনীর জন্য অভিযান বাহ্যতঃ রোমান্টিক প্রণয়গাথা হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ অধ্যাত্মসাধনাবিষয়ক। কবি প্রেম ও বিরহের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা দৃশ্যতঃ লৌকিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মরসব্যঞ্জক। তিনি দৈহিক রূপবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে আত্মার জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়াছেন; ইহা মরমীয়া সাধনতত্ত্বের সুরভিত-ইঙ্গিতবহ। পদ্মিনীর রূপবর্ণনাতেও অরূপ, বিদেহী সৌন্দর্য উঁকি মারিতেছে। ইহাতে সংস্কৃত-অলঙ্কারশাস্ত্রানুগামী প্রতি অঙ্গের লাবণ্য সুপরিচিত উপমাসহযোগে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের পিছনে এক অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। কবির অন্তর প্রেমরসপূর্ণ ও এক অনির্দেশ্য অতীন্দ্রিয় আকৃতির উদ্দীপক। তাঁহার প্রেমপ্রশস্তি মধ্যযুগের পাশ্চাত্ত্য মরমিয়া ও আমাদের বৈষ্ণব কবিদের রচনার সহিত একসুরে বাঁধা।

আলাওলে অধ্যাত্মরস

যে জনে পড়িল প্রেম-সাগর গম্ভীরে।
খাল জোল সম দেখে এই সমুদ্রেরে॥
জল হেরি বিরহের কিবা ভয় কম্প।
অগ্নির সমুদ্র দেখি তাতে দেয় ঝম্প॥

এই প্রেম কেবল নর-নারীর মিলনসাধন করে না, ইহা সার্বভৌম সত্যরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরে পরিব্যাপ্ত।

প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ॥
যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর॥
... ...
প্রেমমূল ত্রিভুবন যত চরাচর।
প্রেম তুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর॥
দুঃখের অন্তরে রাখিয়াছে প্রেমনিধি।
প্রেম-দুঃখ সহে যেবা সুপ্রসন্ন বিধি॥
প্রেমপথে চলি যদি অন্ত নাহি পায়।
সেই পন্থে ভাবকের মরণ জুয়ায়॥

বিরহ সম্বন্ধে কবির একইরূপ উঁচু সুরে বাঁধা অধ্যাত্ম ভাবনা।

যার ঘটে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল।
সুখ-মোক্ষ-প্রাপ্তি তার আপদ তরিল॥
বিরহ-অনলে যার দহিলা পরাণ।
পিতল আঙ্গুটি করে হেম দশবান॥
আন বেশ বাহিরে বিরহ অভ্যন্তর।
গোপন মাণিক্য যেন ধূলির ভিতর॥

এই প্রেম ও বিরহতত্ত্ব বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবাদর্শের প্রত্যয়দৃঢ়, মননশীল প্রকাশ।

আত্মবিলোপের সাধনা

এই দার্শনিক অনুভূতি কাব্যের ভাবকেন্দ্রিক হৃৎপিণ্ড। কবি আলাউদ্দীনের পদ্মিনীর প্রতি আকর্ষণের প্রতি যতটা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহার অপেক্ষা রতন সেনের দ্বারা পদ্মিনীর চিত্তজয়-প্রয়াস আরও নিগূঢ় তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই প্রেমকে উপলক্ষ্য করিয়া

কবি যোগের গূঢ় তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ভগবৎ-লাভের প্রধান উপায় আত্মবিলোপের সাধনা, ভেদবুদ্ধির বিলোপ, জীয়ন্তে মৃত্যুবরণ।

জীবন থাকিতে যদি মরে একবারে।
পুনি কোথা মরণ, কে মরে কেবা মারে॥
আপনা গুরু যোগী আপনাই চেলা।
আপনে সকল মাত্র, আপনে একেলা॥
... ...
আপনি করিয়া নাশ আপে সর্বময়।
আপনি যাহাকে ভাবে সেই আপ হয়॥

সংসারের অনিত্যতা, সংসারখেলায় ফলের বিভিন্নতা, আত্মার নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে কবির কি আন্তরিক অনুভূতি!

সাথীগণে ডুব দিয়া বিচারিয়া চায়।
কার হাতে মুকুতা শামুক কেহ পায়॥
সুখ দুঃখ ভোগ চঞ্চল সংযোগ
সম্পদ অন্তে বিপদে।
চান্দনি ষোড়শ তাতে অমা নিবস
পূর্ণে গ্রাসে বিধুন্তুদে॥

অন্যত্র—

জগতে দণ্ডনা দণ্ডে পড়ে দণ্ডে দণ্ডে।
কি সুখে নিশ্চিন্ত আছ মৃত্তিকার ভাণ্ডে॥
পল দণ্ডে পহরেক দিন চলি যায়।
পথিক নিশ্চিন্ত কেন চলিতে জুয়ায়॥

এই দর্শনতত্ত্বের সঙ্গে কবি হিন্দু অলঙ্কার, পিঙ্গলাচার্যের অষ্টমহাগণতত্ত্ব, আয়ুর্বেদ চিকিৎসাতত্ত্ব, জ্যোতিষবিদ্যা, স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি বিষয়েও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বহির্বিষয়ক বর্ণনাতেও কবির অনায়াস-নৈপুণ্যের পরিচয় পরিস্ফুট। যুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, শিকার, রাজসভার ঐশ্বর্য, ঘোড়া ও হাতীর বিবিধ খেলা প্রভৃতি বিষয়কে কবি স্বীয় কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কাব্যপরিধি প্রসারিত করিয়াছেন। কবির সুভাষিতাবলী ও প্রবাদবাক্যরচনাও তাঁহার বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতার উৎস হইতে সহজ ভাবেই উৎসারিত হইয়াছে।

কবির ভূয়োদর্শন

তীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিয়া জলের কিবা ভয়।
ছেদিলে শতেক বার দুইখণ্ড নয়॥

অথবা

পরশী হইলে শত্রু গৃহে সুখ নাই।
নৃপতি হইলে ক্রোধ দেশে নাই ঠাঁই॥

অথবা

প্রথমে নিশ্চিন্তে রইলে কর্ম অকুশল।
গ্রীবাবদ্ধ হইলে রোদনে কিবা ফল॥

আলাওলের অন্যান্য রচনাবলী মুখ্যতঃ ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক। এগুলিতে অনেক আরবী-পারসী শব্দ থাকিলেও মোটামুটি সংস্কৃতপ্রভাবিত সাধু বাংলারই প্রাধান্য। বড়ই দুঃখের বিষয় এই সমস্ত গ্রন্থের বিরল প্রচার বাঙালী পাঠককে মুসলমান সংস্কৃতির পরিচয় হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের যে অন্তরঙ্গ সাংস্কৃতিক মিলনের অভাবে উহাদের রাজনৈতিক মিলন মুহুর্মুহু খণ্ডিত হইতেছে, তাহাকাজি-দৌলত ও আলাওলের কাব্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া ঐ মিলন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই ধারা অক্ষুন্ন থাকিলে বাংলা সাহিত্য এক নূতন ভাবসমন্বয়ে সংহত হইয়া এক মিলিত সংস্কৃতির বাহন হইত ও ইতিহাসের অনেক কালিমালিপ্ত অধ্যায়ের কলঙ্ক অপনোদন করিত।

অন্যান্য রচনার প্রচার-গুরুত্ব

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ময়মনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা

১

এই দুইখানি গাথাকাব্যসংগ্রহ ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগুলি প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত অথবা সচেতন ব্যক্তিশিল্পপ্রয়াসের ফল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন এই কাহিনীর প্রাচীন নৈর্ব্যক্তিক রচনার মধ্যে আধুনিক ব্যক্তিহস্তের সযত্ন মার্জনার চিহ্ন আবিষ্কার করা যায়। ইহা হয়ত সত্য হইতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন কাহিনীগুলিতে যে কবিমন ও রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার ভাবরসনিমগ্ন ও প্রাচীন পল্লীসমাজের ভাষাছন্দবিন্যস্ত। যদি আধুনিক যুগের কোন কবি এগুলির রচয়িতা হন, তবে তিনি যে সম্পূর্ণভাবে বর্তমান—কালোচিত সমস্ত মানস জটিলতা ও স্ববিরোধ পরিহার করিয়া তৎকালিক জীবনরসতন্ময় হইয়া গিয়াছেন ও রূপকথাসুলভ ভাষাভঙ্গী ও চিত্রকল্পের অব্যভিচারী অবলম্বনে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনস্বীকার্য। সমস্ত গাথাগুলি রূপকথারই নিকটআত্মীয় ও বিভিন্ন সমাজপরিস্থিতিতে উহারই সম্প্রসারিত সংস্করণ। রূপকথার উদ্ভব যে পরিবেশে, ইহাদেরও উদ্ভব সেই একই পরিবেশে ও কিছুটা পরবর্তীকালে।

গীতিকাগুলি লোক-সাহিত্য না আধুনিক রচনা

আমাদের বাংলা রূপকথাগুলি যে ঠিক জাতির শৈশবকালজাত তাহা উহাদের জীবনদৃষ্টি ও পরিণত শিল্পরূপ হইতে মনে হয় না। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সমাজের অলৌকিকসংস্কারপুষ্ট ও বিশিষ্ট জীবনদর্শন-লালিত বয়স্ক ব্যক্তির মনে যে শিশুকল্পনা সুপ্ত থাকে রূপকথা তাহারই বর্ণোজ্জ্বল, সমৃদ্ধ প্রকাশ। বাংলা রূপকথা আদিম সমাজের মনের কথা নহে; যে সমাজে জীবনাভিজ্ঞতা আদিম বিস্ময়বোধকে উন্মুলিত না করিয়া বরং উহাকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন করিয়াছে, নানা কুটিল পথের কাঁটা অতিক্রম করিয়া দৈবপ্রসাদের আনুকূল্যে এক শুভ পরিণতিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই সমাজেরই পরীক্ষিত জীবনবোধ ইহার মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দৈবনির্ভর সমাজে জীবন-বিপর্যয়ের বহু অভিজ্ঞতার পরেও

জীবন সম্বন্ধে এই সাধারণ ধারণা অবিচলিত থাকে। বিপদ নিজ কৃতকর্মের ফল নহে, রুষ্ট দৈবের অভিশাপ; সুতরাং মৃত্যুও আত্মদায়িত্বের অভাবে মনে খুব গভীর বিষাদরেখা অঙ্কিত করে না। আমাদের সমস্ত বিশ্বাস ও প্রত্যাশা আনন্দময় পরিণতির জন্য উন্মুখ বলিয়া দুঃখের অন্তে মিলন এত স্বাভাবিক, এমন কি অনিবার্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই রূপকথাধর্মী, পল্লীজীবনের দুঃখমথিত-রসনির্যাসগঠিত গাথাগুলি বাঙালীর গভীরতম জীবনপ্রত্যাশারই সংকেতবহ। এই গীতিকাগুলিকে জাতির স্বপ্নাতুর শৈশবকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে উহাদের কাব্যমূল্য ও জীবনসত্যের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। জাতির বাস্তব জীবনের সঙ্গে, রূপকথার এই আকস্মিকতার গ্রন্থিবদ্ধ, অভাবনীয়ের চকিত-আলোকদীপ্ত জীবনলীলার সম্বন্ধ গভীর ও অবিচ্ছেদ্য।

রূপকথা-ধর্মী সাহিত্যের গুরুত্ব

এই গাথাগুলিতে যে জীবনচিত্র ও সমাজরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের বস্তু-অবলম্বন হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এখানে জীবন অনেকটা ধর্মবন্ধনমুক্ত ও স্বাধীন আবেগের দুর্দমশক্তিচালিত। এখানে সমাজের যে ক্রূর, হিংস্র অত্যাচারী রূপটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিভিন্ন সাহিত্যে অঙ্কিত ও আমাদের সার্বিক অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত সমাজচিত্র হইতে অভিন্ন। কিন্তু এখানে সমাজ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের প্রতিনিধি নহে, মানুষের গড়পড়তা নিম্নগামী চিত্তবৃত্তির সমষ্টিগত রূপ। দুষ্ট কাজী, চিকণ গোয়ালিনী, নেতাই কুটনী, ভাটুক ঠাকুর ও দুর্বলচিত্ত চান্দবিনোদ সমাজের দুঃশীল ও দুর্বল চরিত্রের উদাহরণ। এখানে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিচিত্তের যে সংঘর্ষ তাহাতে প্রথার যান্ত্রিক মূঢ়তাই প্রধান উপাদান, কোন ধর্মান্ধতার বিস্ফোরক শক্তি ইহার সহিত যুক্ত হয় নাই। একদিকে আদিম হিংস্র প্রবৃত্তি ও নিষ্করুণ দৈব, অন্যদিকে অদম্য জীবনোল্লাস ও দুর্দম প্রেমচেতনা পরস্পরের সহিত এক নির্মম সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে।

গীতিকায় ধর্মনিরপেক্ষ জীবন ও সমাজচিত্র

সমাজচিত্র সাধারণ ও পরিচিত কিন্তু প্রেমের বিচিত্র আবেগ নানা পরিস্থিতিতে নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ও বিভিন্ন পরিণতিতে উহার প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছে। আমরা এতদিন কাব্যসাহিত্যে প্রেমের যে পার্বত্য নির্ঝরিণী-বেগের কথা শুনিয়া আসিয়াছি তাহা এই গীতিকাগুলির নায়ক-নায়িকার বাক্যে ও আচরণে প্রমূর্ত হইয়াছে। এ প্রেম সমাজবিধির ধার ধারে না,

শাস্ত্রের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে, প্রতিকূল দৈবের ভ্রূকুটিতেও ভীত হয় না, একমাত্র প্রণয়াকূতির অমোঘ আকর্ষণে অজানা ঘটনাস্রোতে নিজ জীবনতরীকে ভাসাইয়া দেয় ও মনোবল না হারাইয়া চরম মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করে। বাংলার ক্ষীণ, সমাজশাসিত, আদর্শনিয়ন্ত্রিত, অদৃষ্টনির্ভর জীবনধারায় যে এত স্রোতোবেগ কোন্ উৎস হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। মনে হয় কেন্দ্রশাসন হইতে বহুদূরে স্থিত, পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা, শাস্ত্রবিধি ও পৌরাণিক চেতনার দ্বারা অস্পৃষ্টপ্রায় এই প্রত্যন্ত-প্রদেশ আর্যধর্মের ভৌগোলিক সীমার বহির্ভূত ছিল। ইহার অধিবাসীরা হিন্দুমুসলমান-আদিমজাতি-নির্বিশেষে শাস্ত্রাতিরিক্ত এক সার্বভৌম হৃদয়নীতির অনুবর্তী ছিল। ইহাদের নারীর সতীত্ব পৌরাণিক দৃষ্টান্তনির্ভর না হইয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাশ্রয়ী হইয়াছে। এই সতীত্বমাহাত্ম্যঘোষণায় আমরা যত না সতী-সাবিত্রীর নাম শুনি, তাহার চেয়ে বেশী শুনি নারীর অবিচল প্রণয়ানুগত্যের কথা। অবশ্য কোন কোন কাহিনীতে পুরাণচেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; মনে হয় যে পুরাণের দূরাগত ভাবনির্যাস তথ্যভারমুক্ত হইয়া এই দুর্গম প্রদেশের আকাশ-বাতাসে ক্ষীণ সুরভির ন্যায় পরিব্যাপ্ত ছিল। মুসলমান ও হিন্দুর প্রেম-কাহিনীগুলিও মূলতঃ অভিন্ন; বিবাহিত প্রেম ও বিবাহবন্ধনমুক্ত প্রেম একই সুরে কথা বলে ও একই আদর্শের ছাপ অঙ্গে বহন করে। করুণ বিরহার্তি ও স্পর্ধিত দুঃসাহস উভয় জাতীয় কাহিনীতেই এক অভিন্ন ভাবপরিমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। ভালবাসার যে কোন জাতি নাই—এই সার্বভৌম সত্য গাথাসমূহের সাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রভাবক্ষীণতায় ও একই অন্তরছন্দের অনুবর্তনে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সামান্য ঝিনুকের মধ্যে অসামান্য মুক্তার ন্যায় এই তুচ্ছ সমাজজীবনই যে গাথাগুলির রূপকথাজাতীয় অন্তর-ঐশ্বর্য ও রূপদীপ্তির মূল উৎস তাহাও ইহাদের মধ্যে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দাম প্রণয়াবেগের চিত্র

২

কাহিনীগুলির রূপবর্ণনায়, ঘটনার ইঙ্গিতময় বিবৃতিতে ও প্রেমের গভীর ও বিচিত্র মানস ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশে পল্লীপ্রকৃতির সর্বতোমুখী দ্যোতনা-শক্তি আশ্চর্য সুসঙ্গতির সহিত মানবমনের ইতিহাসের সহিত নিগূঢ়সম্বদ্ধ হইয়াছে। পল্লীজীবন হইতে আহৃত রূপশ্রী প্রেমের সমস্ত আকৃতিকে অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ও অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। প্রকৃতি ও মানবহৃদয় যেন এক

আশ্চর্য স্বরসঙ্গতিতে একাত্ম হইয়া পরস্পরের পরিপূরকরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এ শুধু প্রকৃতির রাজ্য হইতে উপমাচয়ন নহে, উভয়ের প্রাণরহস্যের ও জীবনলীলার পারস্পরিক অনুপ্রবেশ। উপমান-উপমেয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেন এই অন্তরঙ্গ সাদৃশ্যরসে বিগলিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে বিলীন হইয়াছে।

প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের একাত্মতা

ঘটনা বা ভাবে যাহা কিছু কর্কশ, অসুন্দর, গ্লানিকর ও ভয়াবহ তাহার উপরেও প্রকৃতি-সৌন্দর্যের এই উদার আস্তরণ বিস্তৃত হইয়া উহাদিগকে একটি সাঙ্কেতিক স্বপ্নময়তায় আবিষ্ট করিয়াছে। মলুয়ার মৃত্যু একটি করুণ যবনিকার অন্তরালে আবৃত হইয়াছে, এক নিরুদ্দেশযাত্রার অনির্দেশ্যতায় উহার বস্তুগত নির্মমতা হারাইয়াছে; মেঘের গর্জনে মানবহৃদয়ের হাহাকার চাপা পড়িয়াছে।

পূবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মনপবনের নাও॥
... ...
ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সুনালী চান্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কায করিল।
বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল॥ (মহুয়া)

এখানেও শেষরাত্রির অস্ফুট আলোক, মেঘাবৃত আকাশের আবছায়াসঙ্কেত কন্যার নিষ্ঠুর সংকল্পের মধ্যে মানস অনিশ্চয়তা প্রতিফলিত করিয়াছে ও রক্তাপ্লুত হত্যার ভীষণতাকে একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাববিপর্যয়ের রহস্যদ্যোতনায় আবৃত করিয়াছে। বিষবাণপ্রয়োগে নায়কের সাংঘাতিক আঘাতও অতর্কিত রূপক-প্রয়োগে—ঘরের বাতি নিবানো ও নগর-কানা কালা মেঘের উদয়ের দ্বারা—বস্তু-কাঠিন্য হইতে ভাবসুষমার রাজ্যে উন্নীত হইয়াছে।

তারা হইল ঝিকিমিকি রাত্র নিশাকালে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা সেই না নদীর জলে॥

—একই উপায়ে মৃত্যুকে রমণীয় করিয়াছে।

রূপবর্ণনায় এই প্রকৃতিপ্রাণতা বিশেষ করিয়া পরিস্ফুট। নারীরূপের রং ও রেখার সহিত প্রকৃতিরূপের রং ও রেখা গভীরভাবে মিশিয়া উভয়ে মিলিয়া এক যৌগিক সত্তা রচনা করিয়াছে। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের প্রকৃতির প্রাণলীলা মানবীর রূপে আরোপিত হইয়া উহাকে এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় রহস্যময় করিয়াছে। প্রকৃতির

রূপ-বর্ণনায় প্রকৃতি-প্রাণতা

সহযোগিতা মানবের অন্তররহস্তের নিগূঢ়তাকে একেবারে অনাবৃত করিয়া দেখাইয়াছে।

ভাদ্র মাসের চান্নি যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা।
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা॥ (কঙ্ক ও লীলা)

অথবা

বৈকালীন রাঙা ধনু মেঘেতে লুকায়।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু শয্যাতে শুকায়॥

এখানে আসন্ন মৃত্যুর উপর রামধনুর ক্ষণস্থায়ী বর্ণচ্ছটা আরোপিত হইয়া উহার বিলয়ের মধ্যে এক করুণ মাধুরী সঞ্চার করিয়াছে। এমন কি যে সমস্ত স্থলে প্রথাসিদ্ধ উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানেও প্রকৃতি-সৌন্দর্যের সর্বব্যাপিত্ব পুরাতন উপমাসমূহকেও এক নূতন ভাবদ্যোতনায় প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। বাচনভঙ্গীর অভিনবত্ব ও আবেগের গাঢ়তা পরিচিত উপমানগুলিকেও প্রথাজীর্ণতা হইতে রক্ষা করিয়া উহাদিগকে জীবনরসের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

৩

প্রেমের আরম্ভ রূপবর্ণনায়; কিন্তু উহার পরিণতির পথে আমরা প্রেমিক হৃদয়ে উচ্ছ্বাসের মর্মস্পর্শী প্রকাশকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করি। রূপমুগ্ধতা, বিস্ময়, অন্তরের প্রবল আলোড়ন, মিলনের একান্ত আকূতি, বিরহের তীব্র অস্বস্তি ও বিদায়ের অসহনীয় জ্বালা—এই ভাবপরম্পরা যখন প্রণয়ীদের উক্তিতে বা লেখকের নিবিড় উপলব্ধিতে যথাযোগ্য অভিব্যক্তি লাভ করে তখনই প্রেমকবিতার কাব্য-সার্থকতা। ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকাদ্বয়ে এই সার্থক আবেগপ্রকাশের অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিলে। এখানেও প্রাকৃতিক দৃশ্য পটভূমিকারচনায় ও সাদৃশ্যব্যঞ্জনায় নর-নারীর হৃদয়াবেগকে একদিকে ব্যাপ্তি ও বিস্তার, অপরদিকে আবেদন-গভীরতা দিয়াছে। প্রেমিক হৃদয়ের আর্তি প্রকৃতির নিপুণ সহযোগিতায় আপনার আকুলতাকে সুকুমারসৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া নিখিলচিত্তজয়ের সুদূর অভিযানে প্রেরণ করিয়াছে।

প্রেমাকৃতির সার্থক প্রয়োগ

আমি ত অবলা নারীরে বন্ধু হইলাম অন্তর-পূড়া।
কূল ভাঙ্গিলে নদীর যেমন মধ্যে পড়ে চড়া॥

(মইশাল বন্ধু)

প্রেমের ক্ষোভ ও অতৃপ্তি বর্ষাস্ফীত নদীর একটি খেয়ালী আচরণের উপমায় অপূর্বভাবে ফাটিয়া পড়িয়াছে। আত্মপ্রসারণের মধ্যে আত্মক্ষয়ের সম্ভাবনা সাধারণ নদীর মত প্রণয়-স্রোতস্বিনীরও একটি অনিবার্য বিপদ। প্রণয়মূঢ়া নারীর ব্যাকুল আলিঙ্গনপ্রয়াস সময় সময় শূন্যতাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।

সময়-সময় বৈষ্ণব পদাবলীর অধীর, সম্ভব-অসম্ভবের সীমালঙ্ঘী প্রণয়াকূতি প্রায় একইরূপ ভাষায় অথচ পল্লীনারীর সংকীর্ণ জীবনাভিজ্ঞতার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই গাথা-কাব্যে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

আজি হৈতে তোমায় বন্ধু ছাইড়্যা নাই সে দিব।
নয়ানের কাজল কৈরা নয়ানেতে থুইব ॥
বসন কইর্‌য়া অঙ্গে পরব মালা কইর্‌য়া গলে।
সিন্দুরে মিশাইয়া তোমায় মাখিব কপালে ॥

... ...

দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব।
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব ॥
আমার নয়ানে বন্ধু দেখিবা সংসার।
এমন হইলে ঘুচবো তোমার দুই আঁখির আঁধার ॥

(আন্ধা বন্ধু)

বৈষ্ণব পদের সমধর্মী

এই উদ্ধৃতিটিতে অনন্তরূপের ধ্যানবিভোর, অধ্যাত্মসাধনার উচ্চভাবলোক-বিহারী বৈষ্ণব কবি আর অন্ধ বন্ধুর প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী এক সামান্য কৃষক-রমণী একই উপমার প্রয়োগে নিজ অন্তরের আকূতিকে ব্যক্ত করিয়াছে। প্রেম উহাদের মধ্যে সমস্ত ব্যবধান দূর করিয়া উহাদের ভাবরাজ্যের একই স্তরে পৌছাইয়া দিয়াছে। হয়ত এইখানে পল্লীগীতির মধ্যে কিছুটা সাহিত্যশিল্পের পরিমার্জনা সন্দেহ করা যায়। বিপরীত দিকে, অন্ধ নারী নিজ ভুবনজোড়া আঁধারের মধ্যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রেমিককে আহ্বান জানাইতেছে :—

না জ্বালিলাম ঘরের বাতি রে বন্ধু অন্ধ আমার আঁখি।
হাত বুলাইয়া বন্ধু তোমার মুখখানি দেখি ॥

(শ্যামরায়ের পালা)

কখনও কখনও প্রেমবিষয়ে সংলাপকুশলতা প্রেমের অশিক্ষিতপটুত্ব ও নাটকীয় চমৎকৃতির উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করা যায়। প্রণয়ানুভূতি যে সকল মানুষকেই একটা স্বভাব-আভিজাত্যের পদবীতে উন্নীত করে ইহা তাহারও প্রমাণ।

প্রেমের বিচিত্র চিত্র

"মহুয়া" গল্পে ব্রাহ্মণকুমার নদেরচাঁদ বেদের মেয়ে মহুয়ার প্রণয়ভিখারী। মহুয়া কপট ক্রোধে এই প্রণয়-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছে।

লজ্জা নাই—নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর॥

সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকের সপ্রতিভ উত্তর আমাদিগকে বিস্মিত করে।

কোথা পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥

অপাত্র-ন্যস্ত অশুভান্ত প্রেমের বিড়ম্বনা এক অপূর্ব প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের মধ্য-বর্তিতায় আশ্চর্য ব্যঞ্জনাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই কত কাল রয়।
ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেক উদয়॥
কুলোকের সঙ্গে পিরীত শেষে জ্বালা বটে।
যেমন জিহ্বার সঙ্গে দাঁতের পিরীত আর ছলেতে কাটে॥

(ধোপার পাট)

আবার এই বিসদৃশ অভিজ্ঞতার উপর মন্তব্য অপূর্বভাবে প্রেমের স্বরূপরহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছে।

এক প্রেমেতে মারে কন্যা আর প্রেমে জিয়ায়।
যে প্রেমে কলঙ্ক ঘটে সে প্রেম কেবা চায়॥
চক্ষের কাজল কন্যা ঠাঁইগুণেতে কালি।
শিরেতে বান্ধিয়া লইলে কলঙ্কের ডালি॥

এই উক্তিটিকেও ঠিক অশিক্ষিত পল্লীকবির রচনা বলিয়া মনে হয় না।

প্রেমসম্পর্কবিরহিত বিশুদ্ধ প্রকৃতিবর্ণনাতেও এই গীতিকাব্যের অনুভূতি-স্বাতন্ত্র্য ও রূপকথাধর্মী প্রকাশ-উচ্ছলতা লক্ষিত হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যকে কবিরা যে মুগ্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহাই অবিকৃতভাবে তাঁহাদের ভাবোচ্ছ্বাসময়, কারুকার্যহীন বাচনভঙ্গীর মধ্যে বিধৃত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ প্রকৃতি-চিত্র

আগ-রাঙ্গিয়া সাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়া (মহুয়া)

কাঙ্খে কলসী মেঘের রাণী ফিরুন পাড়া পাড়া।
আসমানে খাড়াইয়া জমীনে ঢালে ধারা॥ (আয়না বিবি)

গৃহস্থবধূর কল্পনায় বর্ষার এই নূতন মূর্তি আমাদিগকে দেবেন্দ্রনাথ সেনের অনুরূপ বর্ষাকল্পনার কথা মনে পড়াইয়া দেয়।

সূর্যোদয়ের চিত্র:

দুধের বরণ ঘোড়াগোটা আগুনবরণ পাখা।
(আরে) বাতাসের আগে ছুটে ঘোড়া নাই সে যায় দেখা॥
আবের বাড়ী আবের ঘর করে ঝিলিমিলি॥ (কমলারাণীর গান)

বৈদিক সপ্তাশ্ব-বাহিত, অরুণ-সারথি সূর্যরথেরই একটি গ্রাম্য সংস্করণ। এখানে সূর্য রথারূঢ় দেবতা নন, শ্বেত-অশ্ব, তাহার অগ্নিবর্ণ পাখা। সূর্যমণ্ডল শ্বেতবর্ণ, কিন্তু এই মণ্ডলবিচ্ছুরিত রশ্মিজাল আগুনের মত রাঙা। গ্রাম্য কবি নিজ প্রত্যক্ষতার মানদণ্ডে বৈদিক ঋষির কল্পনাকে এইরূপে সংশোধন করিয়া লইয়াছে।

৪

রূপকথাসুলভ শব্দ ও বাক্যাংশসম্ভার প্রকৃতিবর্ণনার মৌলিকতা ও কবিদের রূপমুগ্ধতাকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। মনে হয় প্রকৃতিরূপের প্রথম বিস্ময়বোধ, রূপকথারাজ্যের অপার্থিব সৌন্দর্যের মত, ছেলেভুলান ছড়ার মত, অভিধানে অপ্রাপ্য ও কাব্যরীতিতে অপ্রচলিত নূতন চিত্রকল্প শব্দ আবিষ্কারের দাবি জানায়। এই জাতীয় কাব্যে **আজল কাজল মেঘ, দাগলদীঘল কেশ, আগল ডাগল আঁখি, তেল-কুরাণ্যা বাতি, লীলারি বাতাস, আবের চাক্কামাখা পরভাত** প্রভৃতি দ্বৈতশব্দ ও বাক্যাংশগুলি যেমন সজীব কল্পনার নিদর্শন, তেমনি রূপচাঞ্চল্যের ঝিলিক-মারা। পল্লীকবির সৌন্দর্যোত্তেজিত মনোভাব এইরূপ অসাধারণ শব্দপ্রণালী বাহিয়াই আত্মপ্রকাশ করে।

মৌলিক শব্দসম্ভার

এই কাব্যের প্রণয়লীলার যে পরিবেশ তাহা আগাগোড়া নিসর্গসৌন্দর্যমণ্ডিত। কিন্তু এছাড়াও জীবনের সাধারণ, অসুন্দর অংশের প্রতিও কবিদের পর্যবেক্ষণশক্তি কম তীক্ষ্ণ নহে। কেনারাম ডাকাতের চেহারা, যৌবনরিক্তা নারীর রূপহীন কুশ্রীতা, কবিরাজের ছোট চোখ ও থপথপে চলনভঙ্গী, সাঁওতাল হাঙ্গামায় উদ্বাস্তু নর-নারীর পলায়নত্রস্ততা

অকপট জীবনবোধের কাব্যচিত্র

প্রভৃতি তুচ্ছ সাংসারিকতার কথাও এ কাব্যে যথাযথ স্থান পাইয়াছে। দুই একটি গ্রামজীবনসম্ভব উপমার সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রমাণ করে যে কবির দৃষ্টি শুধু সৌন্দর্য-সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, সমগ্র জীবনক্ষেত্রেই প্রসারিত ছিল।

মনের মাঝে নানান কথা নানান ভাবে উঠে।
হরা (সরা) চাপা দিলে রে ভাত যেমন করি ফুটে ॥

(মুরন্নেহা ও কবরের কথা)

অথবা

সতি-পুতেরার (সতীন-পুতের) লাগ্যা রহিল বসিয়া।
বগা যেমন চউথ বুজ্জ্যা পগারের ধারে।
সাধু হইয়া বস্যা থাক্যা পুডী মাছ ধরে ॥

(দেওয়ান মদিনা)

কোন মার্জিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কবির মনে এই জাতীয় উপমা উদিত হইত না। রূপকথা ও পল্লীগীতির ধূয়া ও বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গী এই কাব্যগুলির মধ্যে সুষ্ঠু ভাবব্যঞ্জনার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে।

গাছের শোভা পাতা রে ভাই,
পাতার শোভা ফুল।
মাথার শোভা সিঁথার সিন্দুর
কানের শোভা দুল ॥

(মুরন্নেহা ও কবরের কথা)

অন্ধকাইরা রাত্রির নদী সাঁ সাঁ করে পানি।
তার উপরে ভাসে ভাইরে পবন ডিঙ্গাখানি ॥

(ভেলুয়া)

প্রভৃতি বাক্যযোজনারীতি লোকসাহিত্যবৈশিষ্ট্যের উদাহরণ।

ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকা বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে একটি অসাধারণ সংযোজনা। বাংলা সাহিত্যে লোকগাথার অনেক নিদর্শন আছে, কিন্তু সেগুলি বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক সাধনাতত্ত্বনির্ভর। জনসাধারণের চিরাচরিত ধর্মসাধনা নাথ-সাহিত্য ও বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি সঙ্গীতের বিশিষ্ট ভাব ও ভাষা অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সীমিত গোষ্ঠির গুহ্য ভজনতত্ত্ব অর্ধদুর্বোধ্য, রহস্যময় ভাষাকে অনেকটা অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু এই দুইখানি কাব্যসংগ্রহে কোন নিগূঢ় সাধন-প্রণালী নহে, সর্বমানবিক হৃদয়াকুতিই অসাধারণ রূপচেতনা

ও প্রকৃতিসৌন্দর্যের ভাবপ্রকাশিকা শক্তির সহযোগিতায় এক সজীব ব্যঞ্জনাময় কবিত্ব-স্বর্গ রচনা করিয়াছে। এই স্বর্গের চাবি যে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান কবিগোষ্ঠীর হাতে নাই, আছে জনসাধারণের অতিসন্নিহিত পল্লী-কবির হাতে ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। যখন উপলব্ধি করা যায় যে এই চাবি হয়ত চিরকালের মত হারাইয়াছে তখন কবিত্বের একটা সর্বসাধারণের আয়ত্ত উৎস রুদ্ধ হওয়ার আক্ষেপ আমাদের সমস্ত আধুনিক প্রগতির মধ্যেও মনকে ক্ষুণ্ণ করে।

গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্য ও মূল্য

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতচন্দ্র

১

পুরাণে চণ্ডী, কালিকা, অন্নপূর্ণা, অন্নদা একই মহাদেবীর নামান্তর হইলেও মঙ্গলকাব্যে তাঁহাদের রূপ ও মহিমা স্বতন্ত্র। কাজেই একই চণ্ডীমঙ্গলধারার পরিণতি হইলেও অন্নদামঙ্গলের সহিত চণ্ডীমঙ্গলের পার্থক্য উৎসমুখ হইতে সদ্যো-উৎসারিতা, তীব্রস্রোতা, ক্ষীণকায়া, উপল-প্রতিহতা নির্ঝরিণীর সহিত সমতলে প্রবহমানা, বিপুলাকায়া, শ্লথস্রোতা, সমুদ্রসন্নিহিতা স্রোতস্বিনীর স্বাতন্ত্র্যের মত গভীর ও ব্যাপক। দেবী-কল্পনায়, কাহিনীর সংগঠনে, কাব্যের মেজাজে ও উদ্দেশ্যে সব দিক দিয়াই চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলের মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান। পূজা আদায় করিবার জন্য সেই হিংস্রতা, ভয়ংকরত্ব ত্যাগ করিয়া চণ্ডীমঙ্গলের কোপনা চণ্ডী অন্নদামঙ্গলে অভয়া, অন্নপূর্ণা বরদা হইয়াছেন। কালিকার বাম করের নরমুণ্ড, খড়্গাই যেন ছিল চণ্ডীর আসল রূপ, চণ্ডীমঙ্গলে তিনি বামা; কিন্তু অন্নদামঙ্গলে দেবীর দাক্ষিণ্য-বরাভয়ের মধ্যে মাতার স্নেহ গলিয়া পড়িয়াছে। তিন শত বৎসরের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী হিন্দুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, জগন্মাতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যযুগের প্রান্তসীমায় ভারতচন্দ্র এই মাতৃমূর্তির বন্দনা গাহিয়াছেন। কাহিনীরচনা কোন দৈবাদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশকেই শিরোধার্য করিয়াছে। দেবীর সন্তুষ্টিবিধান বা মঙ্গলকামনা অপেক্ষা এইখানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সন্তুষ্টি ও রাজপ্রসাদের আকাজ্ক্ষা তীব্রতর হইয়াছে। বস্তুত একটি রাজবংশের গৌরবময় ইতিহাসরচনার উদ্দেশ্যে সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত দৈবী মহিমার কাহিনী মিশাইয়া, নাগরসংস্কৃতিসুলভ একটি আদিরসপ্রধান প্রণয়োপাখ্যান যুক্ত করিয়া—বিদগ্ধ ভাষা-ছন্দের অভূতপূর্ব ঝংকারে যে মিশ্রকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাই অন্নদামঙ্গল, অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য।

চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদা-মঙ্গলের পার্থক্য

অন্নদামঙ্গল কাব্যে তিনটি খণ্ডে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড—শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল; দ্বিতীয় খণ্ড—বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল; তৃতীয় খণ্ড—মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল।

প্রথম উপাখ্যানের মূল কাহিনী পৌরাণিক। সতীর দেহত্যাগ, পার্বতী-পরিণয়, শিবের সংসার ও কাশীতে দেবীর অন্নপূর্ণামূর্তিগ্রহণের বর্ণনা আছে। ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে হরিহোড়ের লৌকিক কাহিনী। দেবী হরিহোড়কে ছাড়িয়া অন্নপূর্ণার ঝাঁপি লইয়া কি ভাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের পিতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন —সে কাহিনী। দ্বিতীয় অংশটি বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান। ভবানন্দের জবানী উপাখ্যানটি মানসিংহ শুনিয়াছেন। কালিকার উপাসনা করিয়া কিভাবে সুন্দর বিদ্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেবীর অনুগ্রহে মশান হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন—ইহাই উহার মূল কথা। তৃতীয় অংশটি অনেকখানি ঐতিহাসিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিংহ আসিয়া কিভাবে ভবানন্দের সাহায্য পান এবং প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং কিভাবে ভবানন্দ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে 'রাজা-ই ফরমান' লাভ করেন, তাহাই এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

কাহিনী

অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছেন অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি **রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র** [১৭০৫ (১৭১২ ?)-১৭৬০]। ভারতচন্দ্রের জীবন অতি বিচিত্র। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বর্তমানে হাওড়া জিলার সীমান্তে ভূরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে। ভারতচন্দ্রের পিতা জমিদার ছিলেন কিন্তু পরে অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থায় পতিত হন। নানা দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া ভারতচন্দ্র অবশেষে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসেন এবং মাসিক ৪০ টাকা বেতনে সভাকবি-পদে নিযুক্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করেন এবং রায়গুণাকর খেতাব লাভ করেন। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পর (১৭৬০ খ্রীঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়। ভারতচন্দ্র ছিলেন শব্দকুশলী কবি, সংস্কৃত ও ফার্সী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বহু সংস্কৃত ছন্দ সার্থকভাবে বাংলায় প্রয়োগ করিয়া ও তদানীন্তন যাবনী-মিশাল নাগরিক বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের দেবচরিত্রের মহিমা অপেক্ষা মনুষ্যচরিত্রের জীবন্ত রূপায়ণ অধিকতর স্পষ্ট। রচনাভঙ্গি শাণিত, কিন্তু সর্বত্র মার্জিত রুচির পরিচয় নাই।

অন্নদামঙ্গলের কবি

২

ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যধারার শেষ কবি এই ধারণাই তাঁহার সম্বন্ধে বলবৎ আছে। কিন্তু প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের সহিত তাঁহার যোগ যৎসামান্য। তিনি কাব্যে যে যুগের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর মত সম্পূর্ণরূপে দেবভাবনির্ভর বা দৃঢ়নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাসের যুগ নহে। কাজেই যদিও তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল'-এ তিনি প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের বহিরবয়ব কতকাংশে গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি উহার অন্তরাত্মা মধ্যযুগীয় ভক্তি ও বিশ্বাসের অন্ধ আতিশয্য হইতে স্বতন্ত্রগুণবিশিষ্ট। অষ্টাদশ শতকে বাংলার ধর্মসংশ্লেষক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত অনার্য দেব-দেবী হিন্দু দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা লোকের মনে সহজ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। নূতন দেবতার অনুপ্রবেশে সমাজমনে যে উত্তেজনা ও তীব্র বিরোধের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা কালক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। নবাগত দেবতারা প্রাচীন দেবমণ্ডলীর সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন ও আর কোন নূতন পূজার দাবি সমাজ-শান্তিকে বিচলিত করে নাই। নূতন দেবতার পূজাবিধিপ্রবর্তনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজের দৃঢ় অসম্মতি ও প্রতিরোধ যদি মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ-লক্ষণ হয়, তবে ভারতচন্দ্রের কাব্য মোটেই মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে পড়ে না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী ভারতচন্দ্রে আসিয়া অতিপরিচিতা, কল্যাণময়ী সমাজাধিষ্ঠাত্রী মাতৃদেবীর সহিত অভিন্না অন্নপূর্ণা বা অন্নদামূর্তিতে বিবর্তিত হইয়াছেন। যিনি এককালে অন্ত্যজ জীবনের সুড়ঙ্গপথে বা অন্তঃপুরিকাদের নিভৃত ব্রত-অর্চনার মাধ্যমে আমাদের ভক্তিরাজ্যসীমায় প্রবেশের কুণ্ঠিত আবেদন জানাইয়াছিলেন তিনিই প্রায় দুই শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে সাড়ম্বর পূজাবিধির প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া আমাদের ধর্মবোধের কেন্দ্রাধিষ্ঠিতা দেবীতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। যিনি বিপরীত স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ও জনচিত্তের সংশয়ভীরু অভ্যর্থনার বাধা কাটাইয়া কোন মতে অনিচ্ছুক স্বীকৃতির আঘাটায় নৌকা বাঁধিয়াছিলেন তিনি এখন পূজাবেদীর ঠিক মাঝখানটিতে নিজ অভ্যস্ত আসনটি সর্বসম্মতিক্রমে অধিকার করিয়াছেন। চণ্ডী দেবীর দ্বিধা-বিভক্ত সত্তার চণ্ডী-অংশ কালীর আপাত-নিষ্করুণ, রহস্যময় আচরণে ও উহার স্নিগ্ধ-অংশ জননী-রূপিনী দুর্গার বরাভয়দানকারী, অজস্র বাৎসল্য-প্রশ্রয়ে হিন্দু ধর্মচেতনার অকুণ্ঠ অনুমোদন লাভ করিয়াছে ও ধর্মানুমোদিত ভক্তিসাধনার অঙ্গীভূত হইয়াছে। কাজেই

চণ্ডীদেবীর অন্নদা—মূর্তিতে বিবর্তন

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে যে দেবীর প্রশস্তি রচনা হইয়াছে তিনি ইতিমধ্যে সর্বসংশয়মুক্তরূপে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের কুলদেবতায় পরিণত হইয়াছেন। আগন্তুক দেবতার প্রাথমিক প্রচারকার্যের তাঁহার আর কোন প্রয়োজন নাই।

তথাপি ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণার পূজাপ্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপুল আয়োজন করিয়াছেন তাহা কোন নবাগত দেবসম্মানপ্রত্যাশীর পক্ষেও যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে। দেবখণ্ডে তিনি প্রথানুযায়ী গণেশবন্দনার পর যে সমস্ত দেবদেবীর —যথা শিব, সূর্য, বিষ্ণু, কৌষিকী বা কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির—বন্দনা করিয়াছেন তাহারা সকলেই হিন্দুর ঘরোয়া, পুরাণশাস্ত্রসম্মত দেবতা ও কোন নূতন দেবী-পরিচিতির ভূমিকারূপে তাহাদের অংশ ঠিক সুস্পষ্ট নহে। সর্বোপরি তিনি গ্রন্থারম্ভে অন্নপূর্ণার সুদীর্ঘ ও ভক্তিগদ্গদ বর্ণনার দ্বারা কার্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে ইঁহার নূতন পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই, ইনি ইতি-পূর্বেই স্বপ্রতিষ্ঠ। তাহার পর সতীর দক্ষালয়যাত্রা ও দেহত্যাগ, শিবানুচর কর্তৃক দক্ষযজ্ঞভঙ্গ, শিবের ধ্যানভঙ্গ-চেষ্টায় কামের ভস্মসাৎ হওয়া ও রতির বিলাপ, হিমালয়-কন্যা উমার সহিত শিবের পুনর্বিবাহ, শিবের সাংসারিক অভাব ও তজ্জন্য শিবদুর্গার কোন্দল প্রভৃতি বর্ণনায় ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ ঘটনাবিন্যাসের অনুসরণ করিয়াছেন। গৌরী যখন শিবের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃগৃহগমনের উদ্যোগ করিতেছেন তখনই জয়ার পরামর্শে তাঁহার অন্নপূর্ণা-মূর্তিতে নব আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কবির অন্নপূর্ণা-পরিকল্পনার নূতনত্ব এইখান হইতেই পরিস্ফুট। অন্নপূর্ণা ত্রিভুবনের অন্ন হরণ করিয়া শিবের ভিক্ষা-সংগ্রহকে ব্যর্থ করিয়াছেন ও শিবকে শেষ পর্যন্ত তাঁহারই শরণাগত হইয়া নিজ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছে। ভূরিভোজনের পর অকিঞ্চন শিব অন্নপূর্ণার নিকট উল্লাস-নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন।

কাহিনী-বিন্যাসে পূর্বানুস্মৃতি ও স্বকীয়তা

ইহার পর কাশীখণ্ডের অনুসরণে ভারতচন্দ্র কাশীতে শিবের অধিষ্ঠান ও বিশ্বকর্মা কর্তৃক অন্নপূর্ণার মন্দিরনির্মাণ বর্ণনা করিয়াছেন। স্বয়ং শিব অন্নদাপূজার প্রথম সাধক ও অন্নদা-মহিমার প্রথম উদ্গাতা। শিবের দৃষ্টান্ত-অনুসরণে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও অন্যান্য সমস্ত দেবদেবী অন্নপূর্ণার প্রসাদভিক্ষায় তপশ্চর্যায় রত হইয়াছেন। অন্নপূর্ণার সর্বাতিশায়ী মহিমা ও তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠতা সমস্ত দেবসমাজ কর্তৃক অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা বরদানের পূর্বে সমস্ত দেবতাকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত

কাশীখণ্ডের অনুসরণ ও অন্নপূর্ণা-মূর্তি

করিয়াছেন ও দেবতারা এই সুখাদ্যসম্ভারে অভিভূত হইয়া বরপ্রার্থনার কথা ভুলিয়াছেন। বামহস্তে রত্নময় পানপাত্র ও দক্ষিণহস্তে সঘৃত পলান্নপূর্ণ রত্নহাতা এই নবকল্পিত অন্নপূর্ণামূর্তিব প্রতীকরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। অন্নপূর্ণাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভোজনবিলাসমাহাত্ম্যই উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যে যে ধর্মবিরোধের একটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় স্থান আছে, তাহা অন্নদামঙ্গলে ব্যাসদেবের আচরণে পূর্ণ হইয়াছে। ব্যাসের মুহুর্মুহু উপাস্য দেবতার পরিবর্তন, হরি ও হরে ভেদবুদ্ধি ও অভিমানান্ধ হইয়া উভয়েরই প্রতি আনুগত্যত্যাগ, শিবের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দ্বিতীয় কাশীপ্রতিষ্ঠাসংকল্পের হাস্যকর ব্যর্থতা, ক্ষুৎপীড়িত ব্যাসকে অন্নপূর্ণার ভোজ্যদান, গঙ্গার সহিত ব্যাসের বাদানুবাদ ও শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধাবেশিনী অন্নপূর্ণা কর্তৃক ব্যাসের ছলনা—এই আখ্যানাংশটি সাধারণ মঙ্গলকাব্যের ধর্ম-সংঘর্ষমূলক যে প্রত্যাশা তাহা পূর্ণ করে। প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যে যে ঘটনাবলী জনসমাজে প্রচলিত লোককল্পনা হইতে গৃহীত হয়, এখন তাহা অর্বাচীন পুরাণ হইতে আহৃত হইয়াছে।

ব্যাস-চরিত্রে ধর্ম-বিরোধের আভাস

কিন্তু সর্বজনবন্দিতা, জগতের মূল শক্তি এই মহাদেবী নিতান্ত অনভিজাত দেবতার ন্যায় অশোভন ও অনাবশ্যক পূজালোলুপতা দেখাইয়াছেন। তিনিও পূজাপ্রচারকল্পে সেই মঙ্গলকাব্য-প্রসিদ্ধ, নর-নারীরূপে অবতীর্ণ, শাপভ্রষ্ট দেবতার সহায়তাই বারে বারে গ্রহণ করিয়াছেন। হরিহোড় ও ভবানন্দের মত সামান্য মানুষকেও তিনি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। কাল্পনিক কালকেতু, ফুল্লরা, শ্রীমন্ত, লখীন্দর, বেহুলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে অভিশাপজনিত স্বর্গচ্যুতির দৈব-কল্পনা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য তাহা হরিহোড় ও ভবানন্দের মত সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তির পক্ষে একেবারে বে-মানান। অলৌকিক শক্তিপ্রকাশের যে সহজ পটভূমিকা পূর্বতন মঙ্গল-কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়, পরবর্তী যুগের ইতিহাস ও সমাজের বাস্তব পরিবেশে তাহা একেবারেই অনুপস্থিত। দেবমহিমাঘোষণার কাব্যহিসাবে অন্নদামঙ্গলের এইখানেই কেন্দ্রীয় দুর্বলতা। ভারতচন্দ্রের পরিবার-চিত্রাঙ্কনের নিরেট বস্তুনিষ্ঠতা দেবতার আবির্ভাবের স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কালকেতু ও হরিহোড় উভয়েই দরিদ্রসন্তান; কিন্তু কালকেতুর বন-বাদাড়ে ঘোরা শিকারী জীবন ও শিকারলব্ধ পশুমাংস-

ভারতচন্দ্রে অলৌকিক দৈব-মহিমা-ঘোষণার অসুবিধা ও অবিশ্বাস-যোগ্যতা

বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকার্জন, তাহার বন্য সরলতা ও বিশ্বাসপ্রবণতা সাধারণ সমাজজীবন হইতে অনেকটা বিবিক্ত বলিয়া সেখানে চণ্ডীর আবির্ভাব অসম্ভব ঠেকে না। পক্ষান্তরে হরিহোড় সমাজজীবনের সমস্ত জটিলসূত্রবিধৃত বলিয়া তাহার প্রতি অন্নদার অহেতুক কৃপা ঠিক তাহার জীবনযাত্রার সহিত সঙ্গতি লাভ করে নাই। যে ভবানন্দ দুই স্ত্রীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত, তাহার এই ঘোরতর সাংসারিকতার নিরেট বুননির কোন্ ফাঁক দিয়া দেবীর অনুগ্রহ তাহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। মানসিংহ-প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও অন্নপূর্ণার অনুগ্রহে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে মানসিংহ-বাহিনীর রক্ষা দেবমহিমাপ্রচারের অনুকূল ক্ষেত্র বলিয়া আমাদের মনে হয় না। মনসার সর্পবাহিনী কর্তৃক উদ্ব্যস্ত অজ্ঞাত-পরিচয় কাজীর দুরবস্থা আমাদের সঙ্গতিবোধকে পীড়িত করে না। কিন্তু স্বয়ং বাদশাহ জাহাঙ্গীর যে দিল্লীর রাজপ্রাসাদে অন্নদার ভূতপ্রেতগোষ্ঠীর দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া অন্নদার পূজা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ইহা আমাদের বিশ্বাসের সীমা ছাড়াইয়া যায়। সমাজের প্রান্তিক ও অনেকটা অসংসক্ত জীবনে দৈব রহস্যের স্ফুরণ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইতিহাস ও সমাজের অতিবাস্তব প্রতিবেশের কঠিন মৃত্তিকায় দেবলীলা অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ পায় না। মধ্য-যুগের বাস্তব জীবন কল্পনাকুহেলিজড়িত ও অতিপ্রাকৃতের প্রতি সহজ বিশ্বাস-পুষ্ট। ভারতচন্দ্রের জীবনবোধ এত প্রখর-সুস্পষ্ট ও যুক্তিনিষ্ঠ যে সেখানে ভক্তির প্রকাশই অনেকটা শিল্পচাতুরীবিকৃত; সুতরাং এই অতি-প্রত্যক্ষ বাতাবরণে দেবীর পৌনঃপুনিক আবির্ভাব ও সুদীর্ঘ লীলারহস্য-উদঘাটন খানিকটা সামঞ্জস্য-হীন মনে হয়। এক ঈশ্বরী পাটনীর নিকট দেবীর আচরণ, ঈশ্বরীর বরপ্রার্থনা ও ঈশ্বরীর বরদান দেবমানবের সহজ সম্পর্কের দ্যোতকরূপে প্রতিভাত হয়। ভারতচন্দ্রের মনীষা এখানে যেন সরল ভক্তি ও অকৃত্রিম স্নেহের সান্নিধ্যে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী স্বতন্ত্র পর্যায় হইতে আহৃত হইয়া গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই অবৈধ ও অশালীন প্রাকৃত প্রেমের আখ্যানটি শতাব্দীর কক্ষপথে আবর্তন করিতে করিতে হঠাৎ দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যের অঙ্গ-সংসক্তি লাভ করিয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এই ভক্তবৎসলা দেবী অন্নদা নহেন, তিনি অন্নদার চণ্ড প্রতিরূপ কালিকা। যদিও অন্নপূর্ণা মূলতঃ ভোগপ্রাচুর্যদাত্রী দেবী, তথাপি বৈরিনির্যাতনে তিনি কালিকার ন্যায়ই

চণ্ডনীতির পক্ষপাতিনী ও ভৌতিক সেনাবাহিনীর নেত্রী। বিদ্যাসুন্দরে আদিরসের নিকট ভক্তিরস গৌণ—দেবী নায়ক-নায়িকাকে কামকলাপ্রলবিস্তারের অকুণ্ঠিত অবসর দিয়া স্বয়ং অন্তরালবর্তিনী হইয়াছেন। তিনি কেবল নায়কের চরম বিপদে তাহার স্তব-স্তুতিতে বিগলিত হইয়া তাহার রক্ষার্থ অলৌকিক শক্তির প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর মঙ্গলকাব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে, উহার বিষয়-পরিধির অতিবিলম্বিত সম্প্রসারণ। ভক্তিবাদের অতি-বিস্তৃতির যুগে ইহা যে কামকেলির রুচিবিগর্হিত বর্ণনাকেও নিজকুক্ষিগত করিয়াছিল ইহা তাহারই নিদর্শন। ঐশী প্রশ্রয় যে ভক্তের গর্হিত, নীতিহীন আচরণ পর্যন্ত প্রসারিত, কালিকা-সাধকের যে কোন কৃচ্ছ্রসাধন বা অনিন্দিত আচরণের প্রয়োজন হয় না অন্নদামঙ্গলের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর অন্তর্ভুক্তি তাহাই প্রমাণ করে।

বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর অন্তর্ভুক্তি অপ্রাসঙ্গিক

৩

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নপূর্ণা দেবীর এই রূপান্তর-সাধনের পিছনে কোন তীব্রভাবে অনুভূত যুগ-প্রয়োজনের প্রেরণা ছিল কি না তাহাই এখন বিচার্য। কাশীতে অন্নপূর্ণামন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও এই ভোগপ্রাচুর্যবিধায়িনী দেবীর প্রশস্তি-রচনার কি কোন বিশেষ যুগঘটনাসম্ভব উপলক্ষ্য ছিল? ঈশ্বরী পাটনীর যে অতি সরল, ন্যূনতম বর-যাচ্ঞা—আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে—তাহার পিছনে কি কোন নবজাত আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত অনুভব করা যায়? ইহা কি বর্ধমান ভোগলিপ্সার নিদর্শন, না স্বল্পতম জীবনপ্রয়োজন মিটাইবার আকূতি? বাঙলার জনসাধারণ কি হঠাৎ অন্নের কাঙাল হইয়া উঠিয়াছিল, না রাজসিক ভোগাড়ম্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল? অচিরকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত বর্গীর হাঙ্গামা বাংলার অর্থনৈতিক জীবনকে এমন গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত করিয়াছিল যে জনপ্রবাদ ছড়ার মাধ্যমে এই বিপর্যয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা নয়, টিয়াপাখীতে ধান খাওয়ার তুচ্ছ অজুহাত খাজনা দিবার অক্ষমতার কারণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। মনে হয় যেন টিয়াপাখী বা বুলবুলি অনুল্লেখ্য বর্গী-দস্যুর রূপক-অভিধারূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তথাপি ঈশ্বরী পাটনী যে শাক-ভাতের পরিবর্তে দুধ-ভাতের প্রার্থনা জানাইয়াছে ইহাতে মনে হয় যে জনসাধারণের জীবনমান একেবারে নিম্নতমপর্যায়ভুক্ত ছিল না। আর অন্নপূর্ণা দেবী শিব হইতে আরম্ভ করিয়া

অন্নপূর্ণারূপকল্পনায় যুগপ্রয়োজনপ্রেরণা

ভবানন্দ মজুমদার পর্যন্ত তাঁহার সমস্ত শ্রেণীর ভক্তবৃন্দকে যেরূপ অকৃপণ হস্তে নানা জাতীয় সুখাদ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা উপবাসক্লিষ্ট নরনারীর চিত্র তুলিয়া ধরে না। অথবা মনস্তত্ত্বের বিপরীত রীতি অনুসারে ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখার মত অনাহারজীর্ণ মানুষের কল্পনাই বিপুল ও বিচিত্র খাদ্যসম্ভারের তালিকা রচনা করিয়া বাস্তব অভাবজ্বালার কৃত্রিম উপশম-প্রয়াসে আত্মবিস্মৃতি খোঁজে। ভোজনরসিকতা বাঙালীর চিরন্তন প্রাণধর্ম। শুধু মঙ্গলকাব্যে নয়, রামায়ণ-মহাভারতেও ইহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিপূর্বে অন্নের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকল্পনা বা তাঁহার নিকট অন্নপ্রার্থনা কোন কবিমন বা কাব্যরীতির বিষয়ীভূত হয় নাই। ইহাতে হয়ত দেবমহিমা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিন্তু একটি সার্বভৌম পার্থিব প্রয়োজনের অতি-নৈকট্য এই দেবতাকে আমাদের বিশেষ প্রিয় ও আমাদিগকে তাঁহার উপর বিশেষ নির্ভরশীল করিয়াছে। একদিকে ঐশ্বর্য-ও-প্রতিষ্ঠাকামী মানসিংহ-ভবানন্দ, অন্যদিকে ক্ষুধার্ত দেব শিব, ঋষি ব্যাস ও জনসাধারণের প্রতিনিধি ঈশ্বরী-পাটনী ও হরিহোড়—সকলেই অন্নপূর্ণার পূজাবিধি-অনুষ্ঠানে মিলিত হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ রীতি সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের মনোভাবে স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। প্রথমতঃ তাঁহার কৌতুকরস, বাস্তবচেতনা ও সুমার্জিত শিল্পবোধ প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের সরল, নির্বিচার ভক্তিপ্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। মঙ্গলকাব্যরচয়িতাদের শিথিল-এলায়িত রচনাভঙ্গী, ভক্তিবৃত্তিচরিতার্থতার মননহীন আবেগ, গ্রাম্যসংস্কারপ্রবণতা ভারতচন্দ্রে দেখা যায় না। তিনি দেবতার স্তব-স্তুতিতে আত্মহারা হন নাই, বৈদগ্ধ্যপ্রধান মননক্রিয়া তাঁর ভক্তি-আবেগকে দৃঢ় অর্থবন্ধনে ও সুনির্বাচিত শব্দশৃঙ্খলে সংযত করিয়াছে। প্রাচীন মঙ্গলকবিদের মধ্যে একমাত্র অসাধারণ ব্যতিক্রম মুকুন্দরাম সুপ্রযুক্ত শিল্পবোধের সঙ্গে পল্লীকবির মানস স্নিগ্ধতার সমন্বয় করিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহার শিল্পকৃতি কখনই উগ্র হইয়া দেখা দেয় নাই। তাঁহার সমগ্র রচনা ও মনোভঙ্গীর সহিত ইহা একাত্ম হইয়াছিল, অতিপ্রসাধনে পাঠকের চমকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ভারতচন্দ্রের অতিরিক্ত কারুকার্য ও ধ্বনি ও—শব্দসংযোজনা-কৌশল এক হিসাবে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যবিরোধী। মঙ্গলকবি প্রথমে ভক্ত, পরে কবি; তাঁহার কবিত্ব ভক্তিকে অতিক্রম করিয়া উগ্রভাবে প্রকট হইলে সাধারণের সহিত তাঁহার সহজ সংযোগ ছিন্ন হইবে। যে তীর্থযাত্রী মন্দির-

ভারতচন্দ্রের রীতিমঙ্গল কাব্যের ঐতিহ্যবিরোধী

অঙ্গনে সকলের সহিত ধূলায় গড়াগড়ি দিবে তাহার মহামূল্য রাজবেশ যেমন অশোভন, তেমনি যে কবি জনপ্রিয় দেবতার কথা সর্বসাধারণকে শোনাইবেন তাঁহার কাব্যাড়ম্বর তাঁহার সহজভূমিকাবিরোধী। ভারতচন্দ্র রাজসভায় বসিয়া রাজদরবারের অলঙ্কৃত রীতিতে নূতন মঙ্গলদেবতার গান গাহিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভক্তিমাত্রসম্বল, নিরক্ষর জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিল কি না সে বিষয়ে তিনি উদাসীন।

তথাপি মঙ্গলকাব্যের জন্মপরিবেশ ও আত্মার সহিত সংযোগ হারাইয়াও তিনি ইহার বাহ্যরীতি যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি সাড়ম্বরে অন্নপূর্ণার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন; পুনঃ পুনঃ স্বপ্নাদেশের উল্লেখ করিয়াছেন; যাঁহার মর্তে নামার কোন প্রয়োজন ছিল না তাঁহাকে বিনা কারণে মর্তের ধূলিতে অবতরণ করাইয়াছেন; এমন কি ইতিহাসবিশ্রুত মানসিংহ ও জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌কেও তাঁহার মহিমার নিকট নতশির করিয়াছেন। সর্বোপরি দেবীর স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে যৌবনরূপোন্মত্ততার অনভ্যস্ত কক্ষপথে ভ্রমণ করাইয়াছেন। প্রতিভাশালী শিল্পী-কবির হাতে কাব্যকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু দেবপরিকল্পনা ম্লান হইয়া গিয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার সমস্ত শক্তি ও দুর্বলতা লইয়া মঙ্গলকাব্যের অন্তিম প্রহর ঘোষণা করিয়াছেন। পাঁচশতাব্দীব্যাপী জীবনযাত্রার পর মঙ্গলকাব্য ভারতচন্দ্রের শিল্পকুশল রচনায় মর্মর-সমাধি লাভ করিয়াছে।

বাহ্যরীতির অনুকরণ ও দেবচরিত্রের দুর্গতি

৪

এইবার ভারতচন্দ্রের কাব্যকুশলতা ও শিল্পকৃতির কিছু পরিচয় লওয়া যাইতে পারে। তিনি নানা অভিনব প্রবর্তনার সাহায্যে মঙ্গলকাব্যের সংকীর্ণ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার কৌতুকরস ও পরিহাসকুশলতা নানাভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি দেবতাকে লইয়া যত খুশী রঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার দেবসমাজ একটি বিরাট হাস্যরঙ্গভূমি। তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তবসচেতন মন ভক্তির আবেশে ঘুমাইয়া পড়ে নাই, সব সময়ই সক্রিয়তা বজায় রাখিয়াছে। আবার ইহার সঙ্গে কখনও কখনও তিনি এরূপ গভীর দার্শনিক তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিয়াছেন, যাহা অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মঙ্গলকবির দুরধিগম্য। তাঁহার যে সমস্ত শাণিত মন্তব্য গ্রন্থের পৃষ্ঠায় বিকীর্ণ তাহাদের উৎস অবিমিশ্র ভক্তিসাধনা নহে, সর্বতোমুখী জীবনাভিজ্ঞতা।

কৌতুক ও হাস্যরস

তিনি অভিজাত জীবনের সমস্ত অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছেন ও মঙ্গলকাব্যের বিসদৃশ পরিবেশে তথা বিদ্যাসুন্দরের কামক্রীড়ার অনুকূল আবেষ্টনে ইহাদিগকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গরসিকতার সহিত ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার কামকেলি—বর্ণনা অক্ষম আক্ষরিকতার স্থূল অবলম্বন স্বীকার করে নাই; ইহা কটাক্ষ-কৌতুকে, তির্যক ব্যঞ্জনায়, অব্যবহিত অর্থের অন্তরালশায়ী বিদগ্ধজনবোধ্য চটুল ইঙ্গিতে পাঠকের মনকে সূক্ষ্মভাবে নাড়া দিয়াছে ও ইন্দ্রিয়লালসা ও বুদ্ধি-বৃত্তির যুগপৎ তৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছে। ইহার কুরুচি অনস্বীকার্য; কিন্তু কুরুচিকে আবৃত করার আশ্চর্য কৌশল, স্থূল তথ্যের অন্তর্নিহিত ভাবের দ্যোতনা-নৈপুণ্য লেখকের অসাধারণ প্রকাশশক্তিরও পরিচয় বহন করে। জৈব সম্ভোগের এমন কাব্য-রূপান্তরের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে আর নাই, বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশী নাই।

স্থূল কুরুচিরও অনন্য-সাধারণ শিল্পকৃতি

ভারতচন্দ্র যেখানে প্রথা অনুবর্তন করিয়াছেন, সেখানেও তাঁহার মৌলিকতা দুর্লক্ষ্য নয়। রূপবর্ণনাতে তিনি প্রথাজীর্ণ উপমা-অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়োগকৌশলে এই অভ্যাস-ম্লান অলঙ্কৃতি এক নূতন বিস্ময়-চমকে ক্ষণদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সুপ্রাচীন উপমার উপকরণসমূহ—চাঁদ, পদ্ম, সিংহ, হস্তী, মৃগ, মুক্তা, বিম্বফল প্রভৃতি—তাঁহার কল্পনার সজীবতায় ও উল্লেখের সাংকেতিকতায় আমাদের কাছে নূতন অর্থে প্রতিভাত হয়। এই অতি-পরিচিত উপমানশব্দগুলি নির্জীব নয়, উহারা যেন এক আকস্মিক প্রাণচেতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়া উপমেয় রূপকে গতানুগতিকতার জড়তামুক্ত রসোচ্ছলতায় তরঙ্গিত করিয়াছে। ইহা অবশ্য প্রথম শ্রেণীর কবির নিদর্শন নহে; কিন্তু যে কবি জড়প্রায় পদার্থের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব সঞ্চার করিতে পারেন তাঁহার কবিত্বশক্তি উপেক্ষণীয় নহে।

প্রথাজীর্ণ উপমান-প্রয়োগে মৌলিকতা

ভারতচন্দ্রের ছন্দোনৈপুণ্য অসাধারণ। তিনি নানা নূতন ছন্দের প্রবর্তন করিয়া বাংলা কাব্যের উপর বিচিত্র গতিশীলতা অর্পণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর পর যে গীতিকবিতার সুর ও ছন্দোবৈচিত্র্য বাংলা কাব্যে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছিল, ভারতচন্দ্র সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার আখ্যানের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গীতিকবিতার সংযোজনা তাঁহার গীতি-প্রাণতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাকাব্য ভারতচন্দ্রের প্রভাবে অনুপ্রাণিত। এই গীতিকবিতার মধ্যে কোন গভীর আবেগ-অনুভূতি নাই, কিন্তু সাধারণ ভাবের উপস্থাপনা-লালিত্য ইহাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে

অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য

উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, আধুনিক যুগে এক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া ছন্দসম্বন্ধীয় নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ বিশেষ কেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের সাহসিকতা তাঁহার রুদ্র ও বীভৎসরস-বর্ণনার মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ধ্বন্যনুরূপ শব্দের প্রয়োগদক্ষতায় বিশিষ্ট ভাবদ্যোতনাকার্যে তিনি সিদ্ধহস্ত। যুদ্ধবর্ণনা, শিবের ভূত-প্রেতের দ্বারা দক্ষযজ্ঞভঙ্গের বর্ণনা, ঝটিকাবিধ্বস্ত মানসিংহ-বাহিনীর দুর্দশা-বর্ণনা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ভাবোপযোগী ধ্বনিময় শব্দপ্রয়োগে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এইসব অর্থহীন, ধ্বন্যনুকারী শব্দপ্রয়োগের বিশেষ দৃষ্টান্ত ভারতপূর্ব বাংলা কাব্যে বিরল। একঘেয়ে পয়ার ও ত্রিপদীর স্তিমিত, নিদ্রাতুর ছন্দে লেখা বাংলা কবিতায় এই মানস উত্তেজনা ও ত্বরিতগতিপ্রবর্তন ভারতচন্দ্রের মৌলিকতার নিদর্শন। হয়ত এই প্রয়োগের মধ্যে কিছুটা কৃত্রিমতা ছিল ও এই প্রয়োগফলও ভাষা-শ্রুতিতে স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু তাহাতে ভারতচন্দ্রের উদ্ভাবন-কৃতিত্ব কমে না।

ভাবোপযোগী ধ্বনিময় শব্দের প্রয়োগ-দক্ষতা

ভারতচন্দ্রের প্রধান ত্রুটি হইল তাঁহার কাব্যে ভাবগভীরতার ও কল্পনা-সমুন্নতির অভাব। তিনি কাব্যের বহিরঙ্গ শোভার দিকে এত বেশী মনোযোগ দিতেন, যে ভাবের সূক্ষ্মতা ও আবেগের গভীরতার দিকে তাঁহার বিশেষ নজর ছিল না। দেব-দেবীর চিত্রাঙ্কনে তিনি সুলভ কৌতুকরস ও আলঙ্কারিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। উন্নত, গম্ভীরভাব যে সুনিয়ন্ত্রিত মিতভাষিতার দাবি করে তাহা তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল না। রতিবিলাপ ও সুন্দরের মশানে কালীস্তবের মধ্যে করুণ ও ভক্তিরস-উদ্দীপনে তিনি ব্যর্থই হইয়াছেন। তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গপ্রবণতা তাঁহার উচ্চতর কাব্যফলপ্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। রাজসভার ফরমায়েস, স্থূলরুচি ব্যক্তিবৃন্দের মনোরঞ্জন ও প্রাচীন প্রথার অনুসৃতি তাঁহার অন্তরপ্রেরণার স্বচ্ছন্দ স্ফুরণের ও মন্ময় কল্পনার বিকাশের দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য, বহুভাষাজ্ঞান ও বহুসাহিত্যে অধিকারও তাঁহার অনুভূতিকে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত ও উহার কেন্দ্রসংহতি ও অন্তর্মুখীনতাকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিল। যে কবি লিখিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার ভাষাদর্শ সম্বন্ধে অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন ও বাদশাহ্ ও মানসিংহের সংলাপ যাবনিক ভাষায় লেখা উচিত কি না সে বিষয়ে সংশয় পোষণ করিতেন তিনি যে কবিকল্পনার উচ্চতম বিকাশ হইতে বঞ্চিত হইবেন তাহা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নহে।

ভাবগভীরতা ও কল্পনা-সমুন্নতির অভাব

তাঁহার যুগ অবক্ষয়ের যুগ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই যুগে ধর্মাদর্শে খানিকটা শিথিলতা ও অর্থনীতিতে কিছুটা ভাঙ্গন ধরিয়াছিল ইহা ঠিক। কিন্তু যে রুচিহীনতা ও অশ্লীল বিষয়ের অবতারণার জন্য ভারতচন্দ্রকে অবক্ষয়ের চিহ্নাঙ্কিত করা হয়, তাহা তাঁহার যুগের বিশেষত্ব নহে। ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী উদ্ভাবন করেন নাই; এবং কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা যে অন্যান্য রাজসভার তুলনায় বিশেষ ভাবে কলুষিতরুচি ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর—কাহিনীর আরম্ভ যোড়শ শতকে; ভারতচন্দ্রের পূর্বসূরীগণ যে কামকলাবিষয়ে অধিকতর সংযতচিত্ত ও বিশুদ্ধরুচি ছিলেন তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। রামপ্রসাদের মত বিশুদ্ধ ধর্মভাবপ্রবণ, ভক্ত কবিও বিদ্যাসুন্দর কাহিনী-বর্ণনায় একই প্রকার স্থূল রুচি ও ইন্দ্রিয়লালসাপ্রবণতার পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী কোন কবির স্বোপার্জিত সম্পত্তি নহে, অষ্টাদশ শতকের সমস্ত কবিরই সাধারণ উত্তরাধিকার। হীরা-মালিনী বহুশতাব্দীবাহিত কুট্টনী-সম্প্রদায়ের শেষ ও শিল্পস্মরণীয় প্রতিনিধি, ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত রুচিবিকারের নিদর্শন নহে। সুতরাং এবিষয়ে বেচারা ভারতচন্দ্রকে বিশেষ ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা পক্ষপাতমূলক বিচার। ভারতচন্দ্রের প্রকৃত অপরাধ হইল যে যে-বিষয়ে সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেখানে তিনিই একমাত্র পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনিই একমাত্র কবি যিনি কামসম্ভোগকে কাব্যরমণীয় করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন কিন্তু উদ্দেশ্যের দিক দিয়া তাঁহার সঙ্গে অন্য কবির কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং ফল এই দাঁড়াইল যে আমরা অক্ষম কবিপ্রয়াসকে ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু প্রতিভার অসাধারণ সাফল্যই আমাদের নিকট অমার্জনীয় অপরাধরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যবিচারে তাঁহার বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গীর অশ্লীলতা যাহাতে আমাদের বিচারবুদ্ধিকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত না করে সে দিকে সাবধান হওয়াই বোধ হয় আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

কুরুচি ও অশ্লীলতা ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত নহে, যুগগত ত্রুটি

পঞ্চদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ শতকে আধুনিকতার পূর্বলক্ষণ

১

ইউরোপে অষ্টাদশ শতক সত্য সত্যই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগ ও ভবিষ্যতের বীজও উহার মধ্যে অঙ্কুরিত। ইংরাজি সাহিত্যে উহা এলিজাবেথীয় ও ষ্টুয়ার্টবংশীয় রাজতন্ত্রযুগের ক্ষীয়মান সংস্কৃতির ভস্মস্তূপ হইতে নবজীবনারম্ভের উদ্বোধন-লগ্ন। যে কল্পনার আতিশয্য ও ভাব-ভাবনার কৃচ্ছ্রসাধন সপ্তদশ শতকের শেষ প্রান্তে আসিয়া নিষ্প্রাণ প্রথায় নিঃশেষিত হইয়াছে তাহারই সমাধির উপর যুক্তিবাদনির্ভর, বাস্তবভিত্তিক, আদর্শস্বপ্নবিমুখ এক নূতন জীবনবোধের শিল্পসদন নির্মিত হইয়াছে। জাতি যেন কল্পলোকের সৌন্দর্যস্বপ্ন ও আবেগোচ্ছল জীবনাকাঙ্ক্ষা হইতে প্রতিহত হইয়া কাজের সংঘর্ষময়, আঘাত-প্রত্যাঘাতে তীক্ষ্ণকণ্টকিত জগতে নামিয়া আসিয়াছে। একদিকে নূতন দর্শন বিজ্ঞান জাতির মনকে বস্তুনিষ্ঠ করিয়াছে; অন্য দিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের ঝাটিকা উদ্দাম হইয়া উঠিয়া তাহার কোমল বৃত্তিগুলিকে ভূলুণ্ঠিত ও উগ্র আক্রমণাত্মক মনোভাবকে প্রখর করিয়া তুলিয়াছে। বহির্বাণিজ্যের হিরণ্যচ্ছটা ম্লান হইয়া উহার পিণ্ডদেহই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—নূতন দেশ-আবিষ্কারের বিস্ময়কৌতূহলকে হটাইয়া বিজিগীষার অধিকারপ্রতিষ্ঠা ও লালসার হিংস্র জ্বালা মানব মনে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই পরিবর্তিত প্রতিবেশে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহা এই নবযুগের উপযোগী হইয়াছে। ইহার উপর সামাজিক মনের, বিজ্ঞানচিন্তার, রাজনৈতিক ঈর্ষ্যাদ্বেষ-দলাদলির, জীবনের লঘু ও চটুল বিকাশগুলির, যুক্তিসর্বস্ব দর্শন-ভাবনার একটি পুরু ধূলিময় আস্তরণ জমিয়াছে। ইহার মনোজগতের নিয়ামক, বেকন, হব্‌স, লক্‌ প্রভৃতি যুক্তিবাদী দার্শনিক-মণ্ডলী; ইহার কবি ড্রাইডেন ও পোপ প্রমুখ ব্যঙ্গবিদ্রূপনিপুণ ও আক্রমণাত্মকমনোবৃত্তিসম্পন্ন রচনাকার; ইহার ঔপন্যাসিক সুইফট-রিচার্ডসন-ফিল্‌ডিং প্রভৃতি শ্লেষতীক্ষ্ণ, তির্যকদর্শী জীবন-পর্যবেক্ষক, ইহার নাট্যকার শেরিডান ও গোল্‌ডস্মিথের ন্যায় চটুল হাস্যরস ও কৌতুকপূর্ণ আচরণ-অসঙ্গতির পরিবেশক ও

অষ্টাদশ শতকের ইংরাজি সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠা

সর্বপ্রকার অসাধারণত্বের প্রতি প্রতিকূল

ইহারুরুচি নির্দেশক ও সাহিত্য-ব্যাখ্যাতা জন্‌সনের মত সাধারণ জ্ঞান ও শিষ্ট রীতির উদ্‌গাতা।

তথাপি অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের ভাবাকাশ নূতন চেতনা-কণিকায় আন্দোলিত ও নব জীবনদর্শনের প্রেরণায় তাৎপর্যময় হাওয়া-বদলের জন্য প্রতীক্ষমান। সাহিত্যে এই যুগব্যাপী মানস চাঞ্চল্যের যথাযথ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। জাতির মন মোড় ফিরিতেছে ও এই মোড় ফেরার উদ্যোগ যেমন সাহিত্যসৃষ্টিতে তেমনি চিন্তা-রাজ্যে একটা তরঙ্গ তুলিয়াছে। এই পরিবর্তন কেবল সাহিত্যশিল্পে সীমাবদ্ধ নয়, সমস্ত জাতীয় চেতনায় সমভাবে পরিব্যাপ্ত। সমকালীন ফরাসী সাহিত্যে এ লক্ষণ আরও সুপরিস্ফুট। সেখানে শতকের প্রথম পাদে চতুর্দশ লুইএর অতিকেন্দ্রীভূত একনায়কত্ব ও তাহার অন্তর্জীর্ণতার পূর্বাভাসরূপ ছোট বড় ফাটলের আবির্ভাব ও আভ্যন্তরীণ বিপ্লববহ্নির সঙ্কেতবাহী ধূম্র-উদ্‌গীরণ। সাহিত্যেও এই নিয়ম-তান্ত্রিকতার কেন্দ্রীয় শাসনে ব্যক্তি-মানসিকতার কঠোর অবদমন। তাহার পরই রুসো, ভলটেয়ার ও কোষগ্রন্থকারগোষ্ঠীর (Encyclopaedists) রচনায় এই অতিশাসিত রাষ্ট্রতন্ত্র ও সাহিত্যনীতির তলদেশে যে বিপ্লবের বিস্ফোরণ শক্তি সঞ্চিত হইতেছিল তাহার অগ্নিগর্ভ প্রকাশ। ফরাসী বিপ্লবের যজ্ঞানল হইতে উদ্ভূত সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার যে মহামন্ত্র সমগ্র বিশ্বের আকাশ-বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিশ্বমানবের নবজীবনের সূচনা করিল তাহা এই যুগেরই অবদমিত ক্ষোভ ও অভীপ্সা-সঞ্জাত। অষ্টাদশ শতকের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যে নব ভাবশিশু জন্ম পরিগ্রহ করিল তাহা পুরাতন জীর্ণ জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করিয়া রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন ও সাহিত্যে আত্মভাবপ্রধান, ব্যক্তিকল্পনাশ্রয়ী, যুক্তি-অতিসারী দিব্যদৃষ্টিতে জীবনের নবদিগন্ত-উন্মোচনকারী এক রোমাণ্টিক সৌন্দর্যরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল।

ফরাসী বিপ্লব ও ইউরোপীয় রোমাণ্টিকতার সূচনা

আবার যখন কালের অমোঘ নিয়মে এই রোমাণ্টিক ভাবকল্পনা যুগমানসের সহিত সহজসম্পর্কচ্যুত হইল, তখন অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচেতনা, উহার বস্তুনিষ্ঠা ও সত্যানুসন্ধিৎসা বিংশ শতকের জীবনবোধ ও সাহিত্যসৃষ্টিতে পুনরাবির্ভূত হইল। এইরূপে কালচক্রের আবর্তনে ম্যাথিউ আর্নল্‌ড যাহাকে "অপরিহার্য" আখ্যা দিয়াছিলেন সেই অষ্টাদশ শতক মানবমনের একটি শাশ্বত ভাবপ্রেরণারূপে ঋতুপর্যায়ের ন্যায় ঘুরিয়া-ফিরিয়া, কিন্তু অস্খলিত শৃঙ্খলায় অবতীর্ণ হইতে থাকে।

যুক্তিবাদের পুনরাবর্তন

২

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা পরিষ্কার হইবে যে কোনও দেশে সাহিত্যের অন্তঃপ্রকৃতি-পরিবর্তনের গভীরতা উহার মানস প্রস্তুতির সর্বাত্মকতারই ফল। যে দেশে সমাজচেতনায় কোন বৈপ্লবিক আলোড়ন জাগে নাই, সেখানে সাহিত্যের নবরূপ যদি কোন কারণে আসে, তাহা বাহিরের শিল্পকলাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, অন্তঃপ্রকৃতির গভীর পর্যন্ত মূল বিস্তার করে না। বাংলা সাহিত্যে অ'দশ শতকীয় পরিবর্তন পাশ্চাত্ত্য দেশের ছন্দানুসারী নয় কেননা বাঙলা দেশের সমাজচেতনায় কোন মৌলিক রূপান্তর দেখা যায় নাই। তথাপি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারা কালপ্রভাবে কতকটা নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে ও ইহার ফলেই মানসলোকের কক্ষ-পরিক্রমায় কিঞ্চিৎ নূতন আকর্ষণ অনিবার্যভাবেই অনুভূত হয়।

অষ্টাদশ শতকের বাংলার সামাজিক পটভূমি

১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে মুরশিদ কুলি খাঁর কার্যতঃ বাংলার স্বাধীন অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠা ও তৎপ্রবর্তিত নূতন রাজস্বব্যবস্থা জমিদার ও প্রজার বাস্তব অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়। ইহারই জন্য সাধারণ প্রজার মনে বহুশতাব্দীপ্রচলিত দেবানু- কূল্য-প্রভাবিত জীবনবাদের মধ্যে ইহমুখীনতার স্পষ্টতর চেতনার প্রবর্তন সাধিত হয়। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ডিহিদারের অত্যাচারজর্জরিত কবি মুকুন্দরাম তাঁহার বেদনাবিমূঢ় হৃদয়টিকে দুর্ভাগ্যঝটিকা দ্বারা দূরোৎক্ষিপ্ত অর্ঘ্যকুসুমের ন্যায় চণ্ডীদেবীর চরণাশ্রয়ে সমর্পণ করিয়া জীবনে স্বস্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিজীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সুখশান্তি ও অখণ্ড দৈব বিশ্বাসকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার কালকেতুর নবনির্মিত নগরীবিন্যাস ও জাতিধর্মনিবিশেষে সমদর্শী ও সমৃদ্ধ সমাজপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বিকশিত হইয়াছিল। অবশ্য তাঁহার স্বর্গ খুব দূরবর্তী ছিল না। প্রাসাদচূড়ায় আরোহণ করিয়াই উহাকে স্পর্শ করা যাইত। তাঁহার দৈব শক্তিও সহজপ্রসন্ন ও প্রার্থনালভ্য সন্নিহিতত্বেই অবস্থিত ছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বৈষয়িক অশান্তি তাঁহার অন্তরে যে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা দুরারোগ্য ছিল না—দেবানুগ্রহের প্রলেপই তাহা নিঃশেষে নিরাময় করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ইহার কারণ হয় ক্ষতের অগভীরতা, না হয় দৈব ঔষধের ব্যাধি-উপশমে অমোঘতা। মনের এই ধারাই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের প্রণালী বাহিয়া দুই শতাব্দী ধরিয়া সাহিত্যকে অতীতমুখী ও বাস্তববিমুখ করিয়া রাখিতে সহায়তা করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতকে এই একটানা স্রোত কিঞ্চিৎ মন্দগামী হইয়াছে। মুরশিদ কুলি খাঁর নূতন রাজস্বব্যবস্থাকে ডিহিদার মামুদ শরিফের খামখেয়ালীপ্রসূত অন্যায়ের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলা গেল না। দেবীর আবাহনমন্ত্রেও এই অতিপ্রত্যক্ষ শ্বাসরোধী চাপের সুলভ সমাধান সম্ভব হইল না। বর্তমান যুগেও আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষের প্রত্যক্ষীকৃত অলৌকিক দেবমহিমার কথা আলোচনা করি ও উহার প্রতি ক্ষীণ বিশ্বাসও পোষণ করি। কিন্তু এই অপ্রাকৃত শক্তিকে ভাবস্বীকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না করিলেও আমরা কার্যতঃ মানবিক প্রতিকারের উপায়ই প্রয়োগ করি। অষ্টাদশ শতকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নবাবকৃত লাঞ্ছনা শুধু অন্নদার আশীর্বাদেই ঠেকান গেল না। ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল'-এ বাদশাহের হাতে ভবানন্দের দুর্গতি ও শেষ পর্যন্ত দেবীর স্বপ্নাদেশে ভীত জাহাঙ্গীর কর্তৃক তাঁহার কারামুক্তিরূপ দৈবলীলায় মানবিক ঘটনা-নিয়ন্ত্রণের কাহিনী সালঙ্কারে ও রসাল যাবনীভাষামিশ্র বাগ্‌ভঙ্গীর সাহায্যে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ মুনিব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরূপ বিপদুদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অবশ্য মঙ্গলকাব্যধারায় প্রথাগত দেবস্তুতির পালা পূর্বের মতই চলিয়াছে। কিন্তু সমকালীন ঘটনার বিপরীত সাক্ষ্যের বিরোধিতায় এই দেবস্তুতির ভাবৈশ্বর্য কিঞ্চিৎ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। চোখের সামনে সংঘটিত বর্গীর অত্যাচার ও নবাবের ব্যঙ্গসৃষ্ট 'বৈকুণ্ঠ-বাসে'র তীক্ষ্ণ বাস্তবতার নিকট মঙ্গলকাব্যের প্রাণস্বরূপ দেবনির্ভরতা না কবি না পাঠকগোষ্ঠী কাহারও নিঃসন্দেহ আস্থা অর্জন করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতকে যাহা নিঃশ্বাসবায়ুর মত সহজ ছিল, অষ্টাদশ শতকে তাহাই যোগাভ্যাসের মত কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের কাল ও দেবনির্ভরতায় সংশয়

ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন আসিয়াছে ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বাঙালীর মনে নূতন চেতনার উন্মেষ হইয়াছে। রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র দিল্লী হইতে মুরশিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় রাজনীতি সম্বন্ধে নৈকট্যজাত নূতন আগ্রহ ও সচেতনতা জাগিয়াছে। যে রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র ও রাজপরিষদবর্গের ক্ষমতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী সুদূর জনরবরূপে বাঙালীর কানে পৌঁছিত, মাঝে মধ্যে বাদশাহী ফরমানের মাধ্যমে বা ক্বচিৎ বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর পদযাত্রা—সমারোহে যে শক্তির পরিচয় কল্পনারাজ্য ছাড়াইয়া বাস্তবরাজ্যে মূর্ত হইত, তাহাই এখন নৈমিত্তিক হইতে নিত্যরূপ ধারণ করিল, রূপকথার স্বপ্নলোক হইতে প্রাত্যহিক বোধগম্যতায় নামিয়া আসিল। মুরশিদাবাদ রাজকাহিনীর কুশীলবেরাও বাস্তবতর

মূর্তিতে প্রতিভাত হইল। দাক্ষিণাত্য হইতে আগত ও দিল্লীনিয়োজিত মুরশিদ কুলি খাঁ খানিকটা অবাস্তবতার গোধূলিলোকবাসী, ইতিহাস-প্রান্তরে ভ্রাম্যমান প্রেতচ্ছায়া। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী নবাবেরা—সরফরাজ খাঁ, আলীবর্দি, সিরাজউদ্দৌলা সকলেই—শুধু ইতিহাসের কুয়াশা-ঢাকা, অপরিণত ভ্রূণপিণ্ডমাত্র নয়, বাঙালী জীবনপ্রতিবেশলালিত, পূর্ণবিকশিত প্রাণসত্তা। সরফরাজের নবাবীলীলা অতিস্বল্পায়ু, কিন্তু সে অবিমৃষ্যকারিতা ও অস্থিরমতিত্বের প্রতীকরূপে সাহিত্যের মধ্যবর্তিতা ছাড়াই বাঙালীর কথা ভাষায় ও লোকচেতনায় নিজ ব্যক্তিত্বের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। রাজসিংহাসন হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সে জনপ্রবাদের মণিকোঠায় নিজ মূল্যকে কালজয়ী তাৎপর্যে মুদ্রিত করিয়াছে। তাহার পূর্ববর্তী সম্রাট্ আলাউদ্দিন খলজি ও মহম্মদ টুগলক তাহার অপেক্ষা শতগুণে বেশী খেয়ালী হইয়াও ও নানাবিধ অদ্ভুত আচরণে তাহাদের খেয়ালের পরিতৃপ্তি করিয়াও তাহাদের ঐতিহাসিক পরিচয় অতিক্রম করিয়া কোন নিগূঢ়তর দ্যোতনায় জনস্মৃতিতে অবিস্মরণীয় হইতে পারে নাই। আলীবর্দির রাজনৈতিক সমস্যা বর্গীর হাঙ্গামার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত হইয়া বাঙালীর স্মৃতিতে দুঃস্বপ্নের মত অক্ষয় হইয়া আছে। তাহার তিন কন্যা ও দৌহিত্রদের পারস্পরিক ঈর্ষা-দ্বেষ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তাল পরিবারজীবনও বাঙালীর সুপরিচিত কাঠামোতে বিন্যস্ত হইয়া কৌতূহল ও বাস্তববোধকে অধিকতর মাত্রায় উদ্রিক্ত করিয়াছে। মনে হয় যেন মঞ্চসংস্থাপনার কোন্ অপূর্ব কৌশলে এক সুদূর ইন্দ্রপুরীর যাত্রাভিনয় মায়ালোক হইতে বস্তুজগতে নামিয়া আসিয়া বাঙালী জমিদারের গৃহাঙ্গণে ও তাহার একান্ত-পরিচিত অভিনেতৃবর্গের সহযোগিতায় গার্হস্থ্য নাটকরূপে অচিন্তনীয় নবরূপায়ন লাভ করিয়াছে। নিয়তির এই নাট্যপ্রদর্শনীতে বাঙালী যেন এক মুহূর্তে নির্লিপ্ত ও হতবুদ্ধি দর্শক হইতে মর্মরসগ্রাহী, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা

এই প্রাসাদবিপ্লবে যাহারা প্রধান পুরুষ সেই হতভাগ্য সিরাজ, দুর্বুদ্ধি মীরজাফর, ধনকুবের জগৎশেঠ, অর্থগৃধ্নু উমিচাঁদ-ইহারা সকলেই প্রাচীন ধারার অনুবর্তী হইয়াও অনেকটা অজ্ঞাতসারেই আধুনিকতাধর্মী। পাশ্চাত্ত্য চক্রান্তশীলতার সহিত দৈবসংঘটিত মিলনই ইহাদের আধুনিকতাকে অকস্মাৎ মধ্যযুগের নির্মোকযুক্ত করিয়াছে। ইহারা চাহিয়াছিল সনাতন প্রথারই নব সংস্করণ, কিন্তু যাহা ঘটিল তাহা এক অভাবনীয় আমূল ওলট-পালট। ইহারা বিদ্রোহের চাকাকে যেখানে থামাইতে চাহিয়াছিল,

যুগশক্তির প্রভাব ও দেশের নবঅদৃষ্ট

অজ্ঞাত এক যুগশক্তি বাহিরের আরএক সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত মিলিত হইয়া পরিবর্তনচক্রকে আরও অনেক বেশী পাক ঘুরাইয়া দিল। সুতরাং যাহা ঘটিল তাহা শুধুমাত্র শাসক-পরিবর্তন নয়, সমস্ত দেশের এক নব অদৃষ্টরচনা। এই চক্রান্তের প্রকৃতি এবং ইহার সুদূরপ্রসারী ফলাফল অতীত অন্য সমস্ত বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহ হইতে স্বতন্ত্র ও আধুনিককালোপযোগী নিগূঢ়তর তাৎপর্যবাহক।

এই আন্দোলনে যে সমস্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের চরিত্র ও উদ্দেশ্য অতীত ইতিহাসের মানদণ্ডে বিচার্য নয়। সিরাজের বিতর্কমূলক চরিত্রই তাহার আধুনিকতার লক্ষণ। উহার যথার্থ মূল্যায়নে আমাদের মতভেদ এক দুর্ভেদ্যতর সত্তারহস্যের ইঙ্গিত দেয়। মীরজাফরকে আমরা অবিমিশ্র দুবৃ ত্তরূপে গ্রহণ করিয়াই স্বস্তি পাই। কিন্তু তাহার আচরণে ও চরম সঙ্কটমুহূর্তে কর্তব্যবিমূঢ়তার যে অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস প্রচ্ছন্ন আছে তাহার গ্রন্থি-উন্মোচন মোটেই সহজসাধ্য নয়। সাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষ বিশ্বাসঘাতকের সহিত তাহাকে হুবহু মেলান যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "মীরজাফর গাঁজা খায় ও ঘুমায়" তাহার নির্বিকার ঔদাসীন্য ও অপদার্থতার সঙ্গে ক্ষমতালিপ্সার মত্ত প্রেরণার সামঞ্জস্যবিধান করা কঠিন। ইতিহাসের স্থূল ছাঁকনিতে এই সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্বনির্যাসের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া আটকান যায় না। দোষেগুণে মিলাইয়া সে মধ্যযুগীয় পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ধনকুবের জগৎশেঠের রাজনৈতিক প্রভাব সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার। মধ্যযুগীয় রাজশক্তির নীতি ছিল অর্থশক্তির প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য শোষণ, অর্থপতিকে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারত্বে আমন্ত্রণ নয়। সম্ভবতঃ মারাঠা দস্যুর ক্রমবর্ধমান দাবী মিটাইতে উদ্‌ব্যস্ত আলীবর্দ্দির সময় হইতে জগৎশেঠবংশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি। সিরাজ উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলার সিংহাসনের সহিত এই অর্থনৈতিক অধীনতা লাভ করিয়া থাকিবে। কারণ যাহাই হউক, কার্যতঃ দেখা গেল যে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রজালবয়নের প্রধান শিল্পী হইল এই কোটিপতি বণিক্-প্রতিষ্ঠান। মীরকাশিম সিংহাসন হারাইবার পূর্বে অর্থনীতির এই দুর্দম শক্তির বাহনকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া ভবিষ্যৎ নবাবের পথ নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর কণ্টকময় পথে চলিবার দায়িত্ব নবাবের ছিল না। উমিচাঁদ আর একটি বহিরাগত চরিত্র যে ষড়্‌যন্ত্রে ফাঁসযোজনার কার্যে সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু ক্লাইব তাহার খনিত সুড়ঙ্গতলে আরও শক্তিশালী বিস্ফোরক স্থাপন করিয়া তাহার পূর্ববিন্যস্ত মাইনকে উড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং দেখা গেল যে এই রাষ্ট্রনৈতিক

রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ে আধুনিকতার উপাদান

বিপর্যয়ের মধ্যে এমন উপাদান-বিশেষত্ব ছিল যাহা আধুনিকতার আসন্ন আবির্ভাবকে সম্ভব ও ত্বরান্বিত করিয়াছে। পলাশীপ্রাঙ্গণে নবাবের গ্লানিপাংশুল পরাজয়ের রক্তমেঘের মধ্যে যে সূর্য অস্ত গিয়াছে তাহা বাংলার মধ্যযুগের শেষ সূর্য। পরদিন প্রভাতে যে সূর্যের উদয় হইয়াছে তাহা নবযুগপ্রবর্তক, আধুনিকতার প্রথম সূর্য।

ইহার পরে যে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হইল তাহা বাহ্যতঃ পূর্বব্যবস্থার অবিকল অনুবর্তন হইলেও স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র ভারকেন্দ্রে স্থানান্তরিত। ইংরাজ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল না কিন্তু রাজস্বের অধিকার দাবী করিয়া, কর্তব্য ও অধিকারের এই বিচ্ছেদসাধনে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল। বাঙলার প্রজা পলাশীর যুদ্ধের তের বৎসরের মধ্যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এই শাসনদায়িত্বহীন, শোষণসর্বস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার মৃত্যুযন্ত্রণা মর্মে মর্মে অনুভব করিল। কেবল সমাজদৃঢ়তার ভেলা-অবলম্বনে বাঙালী এই প্রলয়সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া অস্তিত্বরক্ষার কূলে পৌঁছিল। যাহারা রক্ষা পাইল তাহারা আধুনিকতার এই প্রথমমন্থনজাত বিষ পরিপাক করিয়া ইহার অমৃতফলপ্রসবিনী পরিণতি উপভোগের জন্য প্রস্তুতি অর্জন করিল। এই শ্মশানযজ্ঞকুণ্ডে শান্তিবারিসেচনের তিন বৎসরের মধ্যেই (১৭৭৪) আধুনিক জীবনবোধের পুরোধা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিলেন।

বিশৃঙ্খল সূচনা

অষ্টাদশ শতকের শেষ চতুর্থপাদ বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার যুগ। তথাপি এই যুগে কিছু কিছু শৃঙ্খলাস্থাপন ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয় ও বাঙালী নিজ মনের সহিত নূতন পরিস্থিতির সামঞ্জস্যসাধনে কিছুটা প্রয়াস করে। অবশ্য একদিকে ইংরাজের অবাধ ও প্রতিযোগিতাহীন বাণিজ্যনীতি বাঙালী ব্যবসায়ীর সঙ্কটকে আরও ঘনীভূত করে ও পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি হইতে তাহাকে উৎখাত করিয়া তাহার জীবনযাত্রাকে আরও দুর্বিষহ করিয়া তোলে। এই দেশব্যাপী ধ্বংসের মধ্যে ইংরাজের নব বাণিজ্যনীতির প্রসাদে কোন কোন পরিবার বেনিয়ানবৃত্তি অবলম্বনে নিজ নিজ সৌভাগ্যসৌধের ভিত্তি স্থাপন করে ও নব আভিজাত্য-সংস্কৃতির বীজ বপন করে। বিদেশী বাণিজ্যের সহিত পরিচয়ের ফলে বাঙালীর মন দেশের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিস্তৃততর পরিধির মধ্যে প্রসারিত হয়, ও বৈদেশিক বাণিজ্য-স্রোতের স্ফীতিসঙ্কোচরহস্য সম্বন্ধে তাহার অস্পষ্ট চেতনা জাগে। ইংরেজের সঙ্গে প্রয়োজনাত্মক ভাববিনিময়ের জন্য সে যে কয়েকটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা, অপপ্রয়োগে হাস্যকর শব্দ আয়ত্ত করে তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ জ্ঞানবিস্তারের প্রেরণা যোগাইয়া

বেনিয়া-সংস্কৃতির সংস্পর্শ

তাহার সম্মুখে এক অকল্পিতপূর্ব মানস দিগন্ত-উন্মোচনের হেতু হয়। জমিস্বত্ব আইনের পরিবর্তনপরম্পরা তাহাকে নূতন কার্যবিধির জ্ঞান দিয়া তাহার বৈষয়িক বুদ্ধি প্রখরতর করে। এই সব দিক দিয়াই তাহার মনে আধুনিকতার প্রথম বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয়। সাহিত্য ও গভীরতর জীবনবোধে এখনও তাহার সহিত আধুনিকতার দুস্তর ব্যবধান।

৩

অষ্টাদশ শতকীয় সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরোক্ষ অনুমানগম্য। নবভাবধারা পরিণতির যে স্তরে সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে অষ্টাদশ শতকে মননের সে পরিণতি ঘটে নাই। কাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্যধারাই অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছে। গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর গান নাথধর্মতত্ত্বকে লোককল্পনার উদ্ভট অতিরঞ্জনের সহিত ও যোগসাধনার পারিভাষিক প্রক্রিয়াকে হেঁয়ালিধর্মী বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু উহাদের গঠনশিল্প ও অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শ অনেকটা মঙ্গলকাব্য-প্রভাবিত। উহাদের মধ্যে নব চেতনা ও লোকজীবনবৈশিষ্ট্যের যে অপরিস্ফুট আভাস পাওয়া যায় তাহা মঙ্গলকাব্যের প্রথানুগত্যের আড়ালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আর এই তত্ত্বচিন্তার মূল অষ্টাদশ শতক অতিক্রম করিয়া সুদূরতর অতীতে নিহিত। চর্যাপদের বৌদ্ধতান্ত্রিকতা ও বেদের ইঙ্গিতের পরিণততর রূপ, পরবর্তী-কালের হিন্দু তান্ত্রিকতার সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়, কিন্তু ইহার কায়সাধনা অধ্যাত্মফললিপ্সু নয়, অক্ষয়ভোগাদর্শবিলাসী। ইহার আপাতবৈরাগ্য কেবল সংসারভোগকে নিরঙ্কুশ করিবার জন্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অধ্যাত্মচিত্তবিশুদ্ধি-নিরপেক্ষ অলৌকিকশক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাজাত। পারলৌকিক সাধনার ছদ্মবেশে ইহা ইহমুখীনতারই একটা উদ্বর্তিত রূপ, প্রাকৃত চিত্তের স্বর্গকামনার মত ইন্দ্রিয়রমণীয়তার স্থূল উপাদানে গঠিত। এই নাথগীতির মধ্যে আধুনিকতার একটা সূত্র হয়ত আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু এই সূত্র সুপ্রাচীন আদিম সংস্কারের অংশুনিঃসৃত।

সাহিত্যে অতীতের অনুবর্তন

মোটামুটি তিনজন লেখকে আধুনিকতার সুর কমবেশী পরিস্ফুট হইয়াছে—ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও মহারাষ্ট্রপুরাণের কবি গঙ্গারাম। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলএ বিষয়টি গতানুগতিক কিন্তু উহার রূপায়ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়বাহী।

উহার শ্রেণীনির্দেশ অনুকরণাত্মক, কিন্তু শ্রেণীর সাধারণ গুণগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত। দেবী চণ্ডী তাঁহার চণ্ডত্ব পরিহার করিয়া লোকধাত্রী অন্নপূর্ণায় নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। কাশীধামে তাঁহার দেবমহিমা অভিব্যক্ত হইয়াছে ও ভবানন্দকেও তিনি রাজৈশ্বর্যদানে কৃপা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমগ্র আচরণ দেবশক্তির গার্হস্থ্য সংস্করণে নামিয়া আসার সাক্ষ্য দেয়। কালকেতুর নিকট চণ্ডীর আবির্ভাবের মধ্যে কিছুটা অভাবনীয়তার বিস্ময়-চমক আছে, আর ব্যাধনন্দনের প্রতি বনপশুরক্ষয়িত্রী দেবীর অহেতুক প্রসাদ-বর্ণনায় আরণ্য জীবনের অসঙ্গতিপুষ্ট কৌতুকরস দেবী-মহিমায় কিঞ্চিৎ রহস্যস্পর্শের জৌলুষ সঞ্চার করিয়াছে। এ দেবী কাছে আসিয়াও সম্পূর্ণ মানবিক হইয়া যান নাই, কিছু দূরত্ব রক্ষা করিয়াছেন। ব্যাধদম্পতির একের অবোধ, বিস্ময়ভরা চোখে, অপরের ঈর্ষ্যা-আবিল দৃষ্টিতে আর দৈবাহত কলিঙ্গ প্রজাবৃন্দের অসহায়, বিহ্বল আর্তিতে যে দেবরহস্য প্রতিভাত হইয়াছে তাহাতে অন্ততঃ দেবতা-মানবের সহজ সম্পর্কটি ফুটিয়া ওঠে নাই। ইহার সহিত তুলনায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেব-মানবের পারস্পরিক সম্পর্কে সহজ ভক্তি ও প্রসন্ন আশ্রিত-বাৎসল্যের উজ্জ্বল ছবিটি কোনরূপ সংশয়ছায়ায় মলিন হয় নাই। ভগবান মানুষের অনধিগম্য থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে মানুষের মনে কোন অনিশ্চয়তা, কোন পথখোঁজার ধাঁধা নাই। যে পাটনি অন্নপূর্ণাকে গঙ্গা পার করিয়াছে, সে দ্ব্যর্থক পরিচয়ের প্রহেলিকা কাটাইয়া যে মুহূর্তে তাঁহার স্বরূপ চিনিয়াছে সেই মুহূর্তে অকুণ্ঠিত সরল প্রার্থনার দ্বারা তাঁহার প্রতি অনন্যশরণত্ব প্রকাশ করিয়াছে। ইহার আশ্রয় লইলেই যে জীবনের সকল সমস্যা মিটে সে সম্বন্ধে তাহার লেশমাত্র সংশয় নাই। কালকেতু না চাহিতেই সাত ঘড়া টাকা পাইয়াছিল এবং সম্পদদাত্রীর আন্তরিকতায় বক্রকটাক্ষও নিক্ষেপ করিয়াছিল। আশাতীত সৌভাগ্য তাহার নিকট স্বপ্নবৎ অলীক মনে হইয়াছিল। ঈশ্বরী পাটনী কিন্তু ঈশ্বরীর করুণায় দৃঢ়বিশ্বাসী ; সে ঘরে ফিরিয়াই গৃহিণীকে 'দুধ-ভাতে'র ফরমাস করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই। হরিহোড়কে দেবী যখন দয়া করিয়াছিলেন, তখন তাহার গার্হস্থ্য সচ্ছলতা উথলাইয়া উঠিলেও সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যেই বিধৃত ছিল। ভবানন্দ দেবীর প্রসাদে রাজা হইলেও তাহার ঐশ্বর্যের ছন্দ অসম্ভব পরিমাণে দীর্ঘায়ত হয় নাই। এই সমস্তই প্রমাণ করে যে মুকুন্দরামের অপরিচিতা অসাধ্যসাধনক্ষমা দেবী ভারতচন্দ্রের যুগে গৃহদেবতায় পরিণত হইয়াছেন—নবযুগের মানুষ অদৃশ্য নিয়তিকে, চঞ্চলা লক্ষ্মীকে ভক্তি ও সেবার

ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা

স্বর্ণপিঞ্জরে অচলা করিয়া রাখিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে, আকাশের পাখীকে খাঁচার পাখীরূপে পোষ মানাইয়াছে। ভক্তের দিক হইতে কোন অপরাধ না হইলে ইষ্টদেবতা তাহাকে ত্যাগ করিবেন না এই নিশ্চিত প্রত্যয়ই দেব-মানবের সম্বন্ধকে অনিশ্চয়তামুক্ত করিয়া কার্যকারণশৃঙ্খলায় নিয়মবদ্ধ করিয়াছে। আদি মঙ্গলকাব্যের খামখেয়ালী দেবতার যুগ শেষ হইয়া ভক্তাধীন দেবতার যুগ আরম্ভ হইয়াছে; যথেচ্ছাচার দৈবশক্তি নিয়মতান্ত্রিক বন্ধন স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের এইখানেই প্রভেদ।

আদিম পর্যায়ের মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য ছিল নব দেবতার পূজা-প্রবর্তন ও ইহারই জন্য প্রাচীনের সহিত দ্বন্দ্ব ও অনিচ্ছুক পূজকের প্রতি জোর-জবরদস্তির প্রয়োগ। পরবর্তী যুগে এই উগ্র বিরোধ ও অনভিজাত দেবতার পূজা পাইবার জন্য অশোভন লোলুপতা ঘটনার দিক হইতে অভিন্ন থাকিলেও মনোভাবের দিক দিয়া ক্রমশঃ মৃদু ও শিথিল হইয়া আসিল। এমন কি মনসার জিঘাংসা ও চাঁদের অনমনীয় বিরোধিতাও অতিপরিচয়ের ফলে পূর্বের তীব্রতা হারাইল ও উত্তাপ বজায় রাখিবার জন্য কৃত্রিম অতিরঞ্জনের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। মাতৃপূজার ক্রমপ্রসারের ফলে চণ্ডী ও মনসা উভয়েই তাঁহাদের চরিত্রগত নির্মমতা হারাইয়া মাতৃ-আদর্শের সহিত ক্রমবর্ধমান স্বারূপ্যের জন্য স্নিগ্ধভাবাপন্ন হইলেন ও তাঁহাদের চারিদিকে যে উত্তপ্ত বিরোধের পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা অনেকটা প্রশমিত হইল। এই ভাবসাম্যবিধানে বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাবও যথেষ্ট কার্যকরী হইয়াছিল। চণ্ডীর অন্নপূর্ণাতে রূপান্তরণ, ভৈরবী দেবশক্তির স্নিগ্ধা মাতৃমূর্তিতে উত্তরণ যুগপ্রভাবেরই প্রেরণা সূচিত করে।

যুগপ্রভাবে চণ্ডীদেবীর চরিত্রগত পরিবর্তন

মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত অঙ্গবিন্যাসও ভারতচন্দ্রে সম্পূর্ণ অনুসৃত হয় নাই। ইতিহাসচেতনা যে ক্রমশঃ কল্পলোকের কল্পনার নিবিড়তাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে ও কালিকাদেবী শ্মশানচারিণী হইয়াও যে ভক্তমনোবাঞ্ছাপূরণের জন্য রোমাণ্টিক প্রেমবাসরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেও আবির্ভূত হইতে দ্বিধা করিতেছেন না এই অনভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গী ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্যে নূতন উপাদান ও প্রেরণা যোগাইয়া উহার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের ইতিহাসবোধ হয়ত সীমিত ও ম্লান; পলাশীর যুদ্ধ তাঁহার কাব্যদিগন্তের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তথাপি পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেও যে যথার্থ জীবনঘটনা স্থান পাইতে পারে, দেবমাহাত্ম্য সদ্যোসংঘটিত ইতিহাসকথা ও ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যেও আত্মঘোষণার সুযোগ

পায়, ইহা একটা অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্যোতক। হয়ত ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা তাঁহার মধ্যে প্রখর নয় ও তাঁহার ইতিহাসবিবৃতি কল্পনাশ্রয়ী ও দেবমহিমাখ্যাপনে নিয়োজিত হইয়া বস্তুতন্ত্রতার মর্যাদা হারাইয়াছে। তথাপি দেবতা যে ভাবরাজ্য হইতে বাস্তব জগতে অবতরণ করিয়াছেন ও কবি তাঁহার পূর্বসংস্কার অতিক্রম করিয়া এই তথ্যনিয়ন্ত্রিত বাতাবরণে দৈবশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছেন ইহার তাৎপর্য লঘু করিয়া দেখিবার নয়। এই দিক দিয়া ভারতচন্দ্র পৌরাণিকতার প্রাচীন বৃক্ষে আধুনিকতার নূতন কলম জুড়িয়াছেন। এই নবরোপিত কলমে ঠিক জোড় লাগিল কি না বা ইহাতে কোন সুস্বাদু ফল ধরিল কি না সে সম্বন্ধে তিনি অবশ্য উদাসীনই ছিলেন।

ভারতচন্দ্রের ইতিহাস-বোধ

দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুটি অবশ্য ততটা যুগধর্ম নয়, যতটা ব্যক্তিমেজাজের বৈশিষ্ট্য। মুকুন্দরাম ভক্তিপ্রধান ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মিয়াও ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া যান নাই—সমাজ ও ব্যক্তিচরিত্রের অসঙ্গতির প্রতি প্রসন্নহাস্যমধুর ব্যঙ্গদৃষ্টি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গপ্রবৃত্তি যেন আরও শাণিত, মর্মঘাতী ও সামগ্রিক মনে হয়। তিনি যেন আঘাতশীলতার সচেতন উদ্দেশ্য লইয়াই, প্রচলিত মূল্যমানের অন্তঃসারশূন্যতা উদ্‌ঘাটনের জন্যই, বড়ঘরের গোপন কলঙ্ক ফাঁস করার মনোবৃত্তি লইয়াই তাঁহার ব্যঙ্গাস্ত্র শাণিত করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের মুরারিশীল ও ভাঁড়ু দত্ত সরল বিশ্বাসনিষ্ঠ সমাজে ব্যতিক্রমস্থানীয়; কালকেতুর বিশ্বাসপ্রবণ সারল্য ও সাধারণ সমাজের কর্তব্যনিষ্ঠ ও সদাচারনিয়মিত জীবনযাত্রা এই ব্যতিক্রমত্বের দৃঢ় প্রতিবাদ ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত মুরারিশীল সৎ বণিকবৃত্তিতে ফিরিল কি না ও তাহার বাটখারার ওজন ফাঁকি সংশোধিত হইল কি না তাহা জানা যায় না। তবে ভাঁড়ুর ক্ষণিক বিজয়গর্ব শেষে যে চরম অপমানে তিরস্কৃত হইয়াছে ও সে যে সমাজদেহ হইতে দুষ্টক্ষতের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। ইহার সহিত তুলনায় ভারতচন্দ্রের শ্লেষ তীক্ষ্ণতর ও ব্যাপকতর। তাঁহার নায়ক-নায়িকা, হীরা মালিনী, কোটাল চৌকিদার, স্বয়ং রাজা-রানী, এমন কি কালিকাদেবী পর্যন্ত কমবেশী ব্যঙ্গস্পৃষ্ট ও উপহাসদৃষ্টিসংবাধিত। এখানে সকলেই ঠারে ঠোরে কথা কয়; সকলেই ব্যঙ্গকটাক্ষ-নিক্ষেপনিপুণ; সকলের আচরণের মধ্যেই একটা পরিহাসযোগ্য অস্বাভাবিকতা ও অতিচতুরতা ক্রিয়াশীল; হয় ঠকান না হয় ঠকা ইহাদের সকলেরই সাধারণ জীবন-ফলশ্রুতি। কাব্যে কোন চরিত্রই ঠিক সুস্থ জীবনমর্যাদার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয় না। মাতা-কন্যা বা শ্বশুর-জামাই-এর সংলাপও এখানে অশালীন অনুচিত

ব্যঙ্গ ও শ্লেষ—প্রয়োগে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র

তির্যক-ভাষণদুষ্ট। স্বয়ং কালিকা দেবীও ভক্তরক্ষার জন্য তাঁহার ডাকিনী যোগিনী লইয়া শ্মশানে অবতীর্ণ হইয়া শক্তির অশোভন আস্ফালনে দেবমর্যাদাভ্রষ্টা হইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গরসিকের তুলির আঁচড়ে সকলের মুখেই কিছুটা চুণকালি লাগিয়াছে—সবাই কিয়ৎপরিমাণে প্রহসনের পাত্র-পাত্রীর অংশ অভিনয় করিয়াছেন। আর এই ব্যঙ্গচিত্রণের প্রতি খুব গুরুত্ব আরোপ না করিলেও ইহা যে প্রশ্রয়দাক্ষিণ্যস্নিগ্ধ নয়, ইহার সমস্ত হাসি-খুসী ও শিল্পচাতুরীর উজ্জ্বল প্রলেপ সত্ত্বেও ইহার মধ্যে যে মানব জীবনের একটা গ্লানিময় দিক, একটা হীনঅবজ্ঞা-মাখানো ধারণা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এই ব্যঙ্গপ্রসূত হীনম্মন্যতা আধুনিকতার একটি সুস্পষ্ট লক্ষণরূপে নির্দেশিত হইতে পারে। ভারতচন্দ্রের দেব-দেবীর প্রত্যক্ষ চিত্রের মধ্যে হয়ত ভক্তির অভাব নাই। তাঁহার শিব ও অন্নপূর্ণা যুগপ্রচলিত দেবাদর্শ হইতে হয়ত বেশী প্রাকৃতলক্ষণ-সমন্বিত নহেন। তাঁহার স্তব-স্তুতির মধ্যে কটাক্ষ-চাতুর্যের ও শিল্পরীতির প্রভাব অপেক্ষাকৃত প্রকট হইলেও অকপট আত্মনিবেদনের সুর বিরলশ্রুত নহে। কিন্তু যে জীবনপরিবেশে এই দেবমণ্ডলীর অধিষ্ঠান হইয়াছে তাহাতে ভক্তি ও কামকেলি-চর্চার মধ্যে ঝোঁক যে দ্বিতীয়ের প্রতি প্রবলতর তাহা নিঃসন্দেহ। ভক্তির ধারা শুষ্ক হইবার ফলেই তলস্থ পঙ্কস্তর অবারিত হইয়া পড়িয়াছে ও কবি দক্ষ শিল্পীর ন্যায় পাঁক লইয়াই তাঁহার মৃন্ময়ী প্রতিমা গঠন করিয়াছেন।

৪

রামপ্রসাদ শাক্ত পদাবলীর প্রথম স্রষ্টারূপে ও ঐ পদাবলীতে একাগ্র ভক্তি-সাধনাকে সমকালীন জীবনঘটনার উপমা-রূপকের প্রয়োগে প্রকাশ করার মৌলিকতায় আধুনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি পুরাণের ছাঁচে ঢালা ও অলৌকিক দেবমাহাত্ম্যবর্ণনায় পরিপূর্ণ আখ্যানকাব্যের মধ্যে যে গীতি—নির্ঝরের উৎসটি প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাকে অবারিত করিয়াছেন; বাস্তব জীবনের ঘটনাবহুল স্থূলতাকে মন্ময় গীতিকবিতার সুরে উদ্বর্তিত করিয়াছেন; ভক্তির ছদ্মাবরণধারী ঐহিক ভোগাকাঙ্ক্ষাকে সর্বত্যাগী আত্মনিবেদনের গৈরিক বস্ত্র পরাইয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের বিচিত্র গল্পাকর্ষণ ও বিরাট বস্তু-অবয়বকে সূক্ষ্ম মানস প্রেরণার রসনির্ধাসে রূপান্তরণই তাঁহার আধুনিক মনের প্রধান পরিচয়। দ্বিতীয়তঃ এই ভক্তিবিহ্বলতাকে তিনি বৈষ্ণব কবির ভাববৃন্দাবনের অপার্থিব সৌন্দর্যলোক হইতে সমকালীন সমাজের মলিন জীবনচর্যার বস্তুজগতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

অথচ এই ভাবতন্ময়তার দিব্য স্বরূপের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। অবশ্য কান্তাসাধনা ও মাতৃসাধনা এই উভয়প্রকার ভগবৎ-তত্ত্বরসানুভূতির স্বরূপেও যেমন, ভাবাবহ ও কাব্য-উপস্থাপনাতেও তেমনি একটি বিশিষ্ট স্বভাবছন্দ আছে এবং উভয় জাতীয় শ্রেষ্ঠ কবিসাধকই নিজ নিজ কবিসংস্কার-প্রবর্তনায় সেই কাব্যরীতিরই অনুবর্তন করেন। মধুরলীলার মধ্যে যেমন আদর্শ সৌন্দর্যের দিব্য দীপ্তি রসসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য, মাতৃমূর্তিকল্পনায় তেমনি গার্হস্থ্য জীবনের ধূসরতা ও প্রাত্যহিকতার চিরাভ্যস্ত উপকরণজীর্ণতা ভাবপটভূমিকার সহিত সুসঙ্গত। যেমন রামপ্রসাদী সুরে বৈষ্ণব কবিতার মর্মকথা প্রকাশিত হইত না, তেমনি বৈষ্ণব কবির অপার্থিব ভাববিলাসে রামপ্রসাদের ভক্ত আত্মা চরিতার্থতা লাভ করিত না। সুতরাং রামপ্রসাদ প্রকৃত কবির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার বশে তাঁহার চারিপাশের জীবনযাত্রার অতিপরিচিত, তুচ্ছ উপকরণ লইয়া, তৎকালীন সমাজের খেলাধূলা, বৈষয়িক কার্যনির্বাহপদ্ধতির সমস্ত বঞ্চনা-চাতুরী লইয়া, পরিবারজীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র আসক্তি ও অবোধ মান-অভিমানের অভিনয় লইয়া তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার মহানাটকের রূপসজ্জাবিধান করিয়াছেন। এই তুচ্ছ ভাব ও বস্তুসঞ্চয়কে তাঁহার হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুবাইয়া সেই নিমজ্জনোত্থিত বুদ্‌বুদ্‌রাশির উদ্ভব-বিলয়ের মানদণ্ডে তাঁহার ভক্তিসমুদ্রের গভীরতার পরিমাপ করিয়াছেন। যেমন জেন অষ্টেন তাঁহার উপন্যাসে জীবননাট্য ফুটাইবার জন্য সঙ্কীর্ণ পল্লীপরিবেশের অতিসাধারণ ঘটনা ও চিত্তসংঘাতকে অবলম্বন করিয়াছেন, তেমনি রামপ্রসাদও ধর্মজীবনের চরম রহস্যদ্যোতনার জন্য তাঁহার অন্তরের গভীর, বেগবান আকূতি ও সেই আকূতিবলয়ে ঘূর্ণ্যমান কয়েকটি মৃৎকণার চিত্রকল্পে আধ্যাত্মিক মাধ্যাকর্ষণের অপরিমেয় শক্তির আভাস দিয়াছেন। জেন অষ্টেন যে কৌশলে প্রাকৃত জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন, রামপ্রসাদও সেই কৌশলে অধ্যাত্ম জীবনের মানচিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উভয়েই বিন্দুসমষ্টির মধ্যে সিন্ধুরহস্য প্রতিবিম্বিত দেখিয়াছেন এবং উভয়েই একই কারণে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তকরূপে স্বীকৃতিলাভের অধিকারী হইয়াছেন।

রামপ্রসাদের সূক্ষ্ম মানসনির্যাস

গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' বা 'ভাস্করপরাভব' অষ্টাদশ শতকে ঐতিহাসিক চেতনা-উন্মেষের ও উহার কাব্যপ্রয়োগের আর একটি উজ্জ্বল ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত তথাকথিত গুরুতর তাৎপর্যপূর্ণ রাষ্ট্রবিপ্লব অপেক্ষা এই ক্ষুদ্র সাময়িক আভ্যন্তরীণ উপদ্রবের কাহিনী বাঙালী মনকে আরও গভীরভাবে আবিষ্ট করিয়াছিল। যেমন

অনেক বাস্তব বিপৎপাত অপেক্ষা কোন কোনও দুঃস্বপ্নবিভীষিকা আমাদের স্মৃতিপটে দৃঢ়তরভাবে অঙ্কিত হয় ও আমাদের চেতনাকে স্থায়ীভাবে অধিকার করে, তেমনি পলাশীর যুদ্ধের বৈপ্লবিক ভাগ্যবিপর্যয় অপেক্ষা মারাঠা দস্যুর লোমহর্ষণ অত্যাচার শুধু বাঙালীর চিত্তে প্রবলতর ভীতির সঞ্চার করে নাই, তাহার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া মায়েদের ঘুমপাড়ানী গানের মধ্যে চিরন্তনভাবে গ্রথিত হইয়াছে ও বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া শিশুচেতনার বোধহীন গভীরেও এক রোমাঞ্চকর অজ্ঞাত বিভীষিকার মূল সংক্রামিত করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়া এই যে ইতিহাসের বাস্তব সংঘটনের স্মৃতি কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায় ও ইতিহাসের বই পড়িয়া এই বিলুপ্তপ্রায়, মন হইতে মুছিয়া যাওয় স্মৃতিকে জীয়াইয়া তুলিতে হয়। কিন্তু রূপকথার তথ্যনিরপেক্ষ, কল্পনাময় আবেদন মানবচিত্তে অক্ষয় ও অবিনশ্বর। আমরা সুলতান মামুদ, চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শাহ প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিগ্‌বিজয়ীদের অন্তর হইতে বিদায় দিয়াছি ও ইতিহাসের সমাধিতে তাহাদের প্রেতমূর্তিদের কোন মতে স্মরণসীমার শেষ প্রান্তে ধরিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু বর্গী দস্যুরা রূপকথার রাক্ষস-খোক্কসের সহিত এক সাঙ্কেতিক অমরতায় আমাদের চিত্তে চিরবিধৃত হইয়া আছে। ঐতিহাসিকের পুঞ্জীভূত তথ্যজালের ও সচেষ্ট তথ্যসন্ধানের বাঁধন ছিঁড়িয়া যাহারা অদৃশ্য হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মায়ের স্নেহাপ্লুত কলগুঞ্জনের ক্ষীণ স্বর্ণসূত্রে আটকাইয়া গিয়া আমাদের নিদ্রাজড়িমাচ্ছন্ন স্বপ্নলোকে চিরবন্দিত্ব স্বীকার করিয়াছে।

গঙ্গারামের বিস্ময়কর ঐতিহাসিকবোধ

অবশ্য গঙ্গারাম সেই কল্পনার মোহময় আবেশ অনুভব করেন নাই। তিনি ঐতিহাসিকের তথ্যনিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়া এই কল্পনার বাস্তব পশ্চাৎপট উন্মোচন করিয়াছেন ও যে প্রচুর শুক্তিসঞ্চয় হইতে এই স্বপ্নের এক ফোঁটা নিটোল, আতঙ্কপাণ্ডুর মুক্তা উদ্ভূত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত ঘটনাপরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য এই সদ্যোসংঘটিত, লক্ষ লক্ষ লোকের মর্মবেদনাসমর্থিত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়াও তিনি পুরাণ-কল্পনার আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারেন নাই। এখানেও তিনি সমস্ত ব্যাপারটিকে দেবসংকল্পসঞ্জাতরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। জগন্মাতার আদেশে ভাস্কর পণ্ডিত যবনকৃত অত্যাচারের শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁহার স্বহস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রাস্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছে। আবার বর্গীদের নারীনিগ্রহে রুষ্টা বিশ্বজননীর ইচ্ছাতেই তাহার নিধন ঘটিয়াছে। সুতরাং এই আধুনিকবিষয়প্রণোদিত কাব্যেও মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যাগত ধারার সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ'-এর পূর্বে কোন কবিরই মানবিক ঘটনাকে দেবপ্রভাব-মুক্ত ক'রয়া দেখাইবার সাহস হয় নাই। অবশ্য নবীনচন্দ্রও পলাশির যুদ্ধের পূর্বরাত্রিতে দুঃস্বপ্নপরম্পরাপীড়িত নবাবের বিনিদ্র অস্বস্তিতে ও পরদিন প্রভাতসূর্যোদয়ের মধ্যে বিধাতার রক্তিম নয়নের প্রতিচ্ছবিকল্পনায় এবং ক্লাইবের স্বপ্নদর্শনে পুরাণের স্থূল দেহকে বর্জন করিলেও উহার সূক্ষ্ম আত্মার প্রভাব মানিয়া লইয়াছেন। যাহা হউক, এগুলিতে দেবলোকের সশরীর আবির্ভাব হয়ত স্বীকৃত হয় নাই; কেন না ইহাদের একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব ও ইহাই লেখকের ইহলোকনিষ্ঠতার কৈফিয়ৎরূপে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গঙ্গারাম খুব স্থূল ও আক্ষরিক অর্থেই ইতিহাসকে দৈবশক্তিপ্রকাশের রঙ্গভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন চৈতন্যদেবের প্র ত ভক্তি কেবল শ্রীচৈতন্যের জীবনব্যাখ্যা ছাড়া অন্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বৈষ্ণব চরিতকারদের বাস্তব দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নাই, তেমনি গঙ্গারামও পৌরাণিক কাঠামোকে কেবল ভূমিকারূপে রাখিয়া তথ্যবিন্যাসে ও মানবিকপ্রতিক্রিয়া-বিশ্লেষণে কোন সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। দেবশক্তি একবার আবির্ভূত হইয়াই অলৌকিক নেপথ্যান্তরালে অপসৃত হইয়াছে, ঘটনানিয়ন্ত্রণে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই। ইহাতেই অষ্টাদশ শতকে দেবলোকের কতটা মর্যাদাহানি ঘটিয়াছে ও বাস্তববোধের ক্রমবর্ধমান প্রসারে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব এই লোকবিশ্বাসের সীমার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কতটা সঙ্কুচিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ মিলে।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংযোগ

সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হইতেছে আধুনিক যুগে অতিপ্রাকৃতের সীমানির্ধারণ। পুরাণও হয়ত স্মরণাতীত কালের ইতিহাসের স্মৃতি-লালিত। মহাঅরণ্য যেমন যুগযুগান্তরব্যাপ্ত ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে কয়লারূপে ভূস্তরে রক্ষিত আছে ও এই কয়লাও কোথাও কোথাও হীরকে রূপান্তরিত হইয়াছে তেমনি ইতিহাসও নানা কল্পনাস্তরের নিবিড় পেষণপিষ্ট হইয়া কিংবদন্তীর কাব্যতায় ও কচিৎ পুরাণের দিব্যজ্যোতিরুদ্ভাসিত বর্ণময়তায় নবজন্মলাভ করিয়াছে। সুতরাং পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসের হয়ত একটা রক্ত-সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আধুনিককালে ইতিহাসের সম্প্রসারণের সঙ্গে পুরাণের অনুরূপ পরিধি-সঙ্কোচ ঘটিতেছে। পুরাণ ক্রমশঃ ইতিহাসকে গ্রাস ও পরিপাক করিবার শক্তি হারাইতেছে। ইতিহাসও এখন পুরাণরূপান্তরনিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অষ্টাদশ শতকে পুরাণ ও ইতিহাসের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়া এই সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল'-এ ইতিহাস ঢুকাইয়াছেন, কিন্তু সে ইতিহাস অনেকটা

প্রাচীন ও কিংবদন্তীর কুহেলিকাচ্ছন্ন। পুরাণ এখানে ইতিহাসকে পূর্ণগ্রাস না করিলেও অর্ধগ্রাস করিয়াছে। ভারতচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে মঙ্গলকাব্য নিছক দেবপ্রশস্তিসর্বস্ব নয়, তাহার মধ্যে কিছুটা প্রাচীন ইতিহাস উপাদানরূপে প্রবর্তন মঙ্গলকাব্যের মূলউদ্দেশ্যবিরোধী নয়, বরং উহাতে উহার সমকালীন আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই তিনি কৃষ্ণনগরের ঐতিহাসিক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মহিমাকীর্তন ও তাঁহাকে দেবীর আশ্রিতরূপে দেখাইবার জন্য তাঁহার পূর্বপুরুষ ভবানন্দের গুণবর্ণনা, দেবীভক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, পরিপূরকরূপে সান্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে দেবীমাহাত্ম্য খর্ব না হইয়া বরং উজ্জ্বলতর হইয়াছে। যদি বা ভক্তির খাঁটি সোনায় ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টির কিছুটা খাদ মিশিয়া থাকে তাহা উহাকে বিনিময়বাহনরূপ স্বর্ণমুদ্রারই ব্যবহারিক মূল্য ও জনপ্রিয়তা অর্পণ করিবে। সুতরাং তিনি পুরাণের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া ইতিহাসের নূতন উপকরণে মঙ্গলকাব্যের সুপ্রাচীন প্রতিমা সজ্জিত করিয়াছেন। তখনও কমলে-কামিনীর করী-গ্রাসের ন্যায় পুরাণ-দেবী ইতিহাস-গজকে গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ। অবশ্য দৃশ্যটা খানিকটা উদ্ভট হইতে পারে। কিন্তু মহারাষ্ট্রপুরাণ-এর লেখকের নিকট পুরাণের উপস্থিতি কেবল সাংকেতিক, কেবল প্রতীকরূপী। ইতিহাস কেবল একবার তাহার পায়ে মাথা ঠুকিয়া নিজ স্বাধীন অভিযানে বাহির হইবার শক্তি অর্জন করিয়াছে। ইতিহাসও কালীভক্ত সুন্দরের দেবানুমতি লইয়া প্রণয়সাধনায় রত হইবার মত পুরাণের আশীর্বাদ লইয়া কাব্যসুড়ঙ্গপথে স্বেচ্ছাবিহারে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। এইখানেই পুরাণপ্রভাবের শেষ অধ্যায় ও বাস্তবতার দিগবিজয়ের সুরু। অষ্টাদশ শতক বাংলা সাহিত্যের এই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া এক যুগান্তকারী দৃশ্যপরিবর্তনের দিকে অর্ধবিমূঢ় নেত্র মেলিয়া ধারয়াছে।

পুরাণ ও ইতিহাসের পরস্পরসাপেক্ষতা

ষোড়শ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব

১

ইংরাজ-রাজত্বপ্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষাপ্রবর্তনের পর পাশ্চাত্য প্রভাব যে বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক ও বদ্ধমূল হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তথাপি ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে এই ক্রমব্যাপ্ত প্রভাবের নানা স্তর ও পর্যায় সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই প্রভাব আমাদের মনের উপরিভাগ হইতে উহার যে গভীর তলদেশে সৃষ্টিপ্রেরণার মূল প্রসারিত সেখান পর্যন্ত ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে জড় উপকরণ বা যান্ত্রিক নিয়ম-কানুনের অন্ধ অনুবর্তন, তাহার পর সূক্ষ্ম সারাংশের স্বীকরণ ও স্বাধীন সৃষ্টিচেতনা-উন্মেষের ফলে নব জীবনবোধের উদ্দীপন, মর্মাশ্রয়ী নিগূঢ় কল্পনাশক্তির বিকাশ এবং সাহিত্যের ভাবপ্রেরণা ও শিল্পরূপের সামগ্রিক রূপান্তর—এই পথ ধরিয়াই পাশ্চাত্য প্রভাবের ক্রমবিবর্তন লক্ষণীয়।

পাশ্চাত্য প্রভাবের ক্রমবিবর্তন

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই ক্ষীণ সাহিত্যসৃষ্টি-প্রয়াসের অন্তঃপ্রেরণাহীন সূচনা। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ শাসকসম্প্রদায়কে বাংলাভাষা ও দেশীয় আচার-ব্যবহার শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা হইতেই বাংলা গদ্যের উন্মেষ। তখন ইহা নিতান্তই তথ্যভারবিড়ম্বিত, গঠনসুষমাহীন ও ভারসাম্যরক্ষায় অক্ষম বিবৃতিমাত্র ছিল। সেই আদিম অপটুতার যুগে ইহা তথ্যভারবাহী, অষ্টাবক্রগতি উষ্ট্রের মতই ছিল, উহার দেহে বা মনে কোন লাবণ্যচ্ছটার সঞ্চার হয় নাই। তাহার কিছুদিন পর রামমোহন রায় তাঁহার বেদান্তবিষয়ক আলোচনা ও ধর্মবিষয়ক বাদ-প্রতিবাদমূলক গদ্যরচনায় প্রয়োজনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আবেগ মিশাইয়া গদ্যশিল্পকে কিছু পরিমাণে সাহিত্যধর্মী করিয়া তুলিলেন। খৃষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে খৃষ্টান ধর্মমতের ত্রুটি ও অপূর্ণতা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিতে হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্য বিতণ্ডারীতিও তাঁহাকে কিছুটা আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। আবার বেদান্ততত্ত্বপ্রতিপাদনেও তাঁহাকে অনেকটা পাশ্চাত্যসুলভ যুক্তিবাদের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণে ও বিশেষতঃ ইউরোপের রাজনীতি ও সমাজনীতির সহিত গভীর পরিচয়ের ফলে তাঁহার মনোভাব স্বধর্মনিষ্ঠ হইয়াও অনেকাংশে পাশ্চাত্য-আদর্শ-প্রভাবিত ছিল।

প্রথম যুগের গদ্যচর্চা

রামমোহনের ধর্ম-চেতনায় পাশ্চাত্য আদর্শ

এই সময়ে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে (১৮১৭ খৃঃ অঃ) ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য দর্শন-ইতিহাস বাঙালী তরুণের জ্ঞানপিপাসা ও সৌন্দর্যবোধকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিয়া তাহার অন্তরে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে এক আনন্দমধুচক্র রচনা করিল ও তাহার সামাজিক জীবনাদর্শকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা এখন শুধু জীবিকার্জনের সীমিত প্রয়োজনে আবদ্ধ না থাকিয়া বাঙালীর মনে এক ভাবদীক্ষার প্রেরণা জাগাইল। উহার স্থূল তথ্যপিণ্ড তাহার অন্তররসে জারিত হইয়া এক তীব্র মাদক রসে রূপান্তরিত হইল ও বাঙালী যুবককে এক ভাবমত্ততার মায়ালোকে উন্নীত করিল। তাহার সমস্ত চিৎকণাগুলি পূর্বস্থাণুত্বের বন্ধন বিদীর্ণ করিয়া এক অসংবরণীয় পুলকাবেগে নবসত্তাসংশ্লেষে মিলিত হইবার জন্য তুমুল আন্দোলন তুলিল। শুধু শিক্ষার মাধ্যমে কোন জাতির এইরূপ মানস বিপ্লব সংঘটিত হইবার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ছাত্রেরা যেন তাহাদের যুগযুগান্তরনির্দিষ্ট কক্ষপরিক্রমা হইতে তীব্রবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এক অভাবনীয় নব গতিপথে আবর্তিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক দুই একটি তরুণেরই যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টিপ্রতিভা ছিল। কিন্তু সকলেরই জীবনদর্শনের মধ্যে একটা সর্বতোমুখী পরিবর্তনের ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হইয়া এক বিরাট তাণ্ডবের নৃত্যঘূর্ণী সঞ্চারিত করিল। সমাজসংস্কারের উগ্র প্রেরণায় ইহারা সকলেই প্রথাশৃঙ্খল ভাঙিতে অত্যুৎসাহী হইয়া উঠিলেন। অনেকে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইলেন; যাঁহারা পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করিলেন না তাঁহারাও রীতি-নীতি ও আহার-বিহার সম্বন্ধে সমস্ত প্রাচীন অনুশাসনের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্মবিরোধী নাস্তিকতা প্রচার করিতে লাগিলেন। ডিরোজিও-এর 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে আখ্যাত ছাত্রদল হিন্দু সমাজের বদ্ধ জলাশয়ে প্রবল তরঙ্গবিক্ষোভ তুলিয়া ও মনের সমস্ত বদ্ধমূল সংস্কারকে সবলে উন্মূলিত করিয়া, নব নব চিন্তাধারার বেগবান প্রবাহে অবগাহন করিল ও ইংরাজি সাহিত্য ও দর্শন-বিজ্ঞানের মাদকতাময়, রোমাঞ্চকর প্রভাব আত্মসাৎ করিয়া এক অভিনব সাহিত্যসৃষ্টির জন্য অনুকূল প্রতিবেশ রচনা করিল। পূর্বগামী ভাববিপ্লবের পরিণত ফলরূপেই ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্যপ্রভাবপ্রসূত সাহিত্য-বিপ্লব দেখা দিল।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও বাঙালী চিত্তে উহার প্রভাব

ডিরোজিও ও ইয়ং-বেঙ্গল

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ এই নব বীজবপনের যুগ; প্রায় পঞ্চাশ বৎসর

ধরিয়া এই বীজ লালিত ও পুষ্ট হইয়া ১৮৬০ খৃঃ অঃ এর কাছাকাছি শস্যফলনের উপযোগী পরিণতি প্রাপ্ত হইল। মধুসূদন দত্তের মধ্যেই এই সৃষ্টিপ্রতিভা যুগ-প্রতিবেশের সমস্ত চাঞ্চল্য, যুগমানসের সমস্ত অস্ফুট আদর্শকল্পনাকে এক নিগূঢ় শক্তিপ্রেরণাসংহত করিয়া উহাকে প্রাণোচ্ছল সৌন্দর্যশিল্পে রূপান্তরিত করিল। মধু কবিই সর্বপ্রথম প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত নূতন প্রতীচ্য প্রেরণার এক প্রাণময় সংযোগ ঘটাইয়া নব সাহিত্যের উদ্বোধন করিলেন। তাঁহার কাব্য-নাটক হইতেই আমরা এই রসায়নপ্রক্রিয়ার একটা ধারণা করিতে পারি। বিশেষতঃ নাটকের ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক অনুকারকদের হইতে তাঁহার স্বকীয়তার পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়াছে। উনবিংশ শতকের বাংলা নাটক মঞ্চানুকরণের সুড়ঙ্গপথ বাহিয়া ইউরোপীয় প্রভাবক্ষেত্রের মধ্যে প্রথম অনুপ্রবেশ করে। তাহার পর পুরাতন সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিকবিন্যাস, অভিনয়কলা ও দৃশ্যপটসংস্থাপনের বহিরঙ্গমূলক অনুসৃতির মধ্য দিয়া বাংলা নাটক ধীরে ধীরে ইংরাজি নাট্যকলার প্রাণকেন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে দুই বিসদৃশ নাট্যাদর্শের অসার্থক সংমিশ্রণের জন্য সে নিজের প্রাণকেন্দ্র-আবিষ্কারের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তৃতীয় স্তরে সামাজিক অসঙ্গতির প্রহসনাত্মক অঙ্কনের মাধ্যমে বাংলা নাটক অতি মন্থরগতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে থাকে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) বিদেশী চাবিতে বাংলার নিজস্ব সমাজজীবনের দ্বার-উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস। ইহা বাস্তব সমাজের প্রতিচ্ছবি ও দেশীয় প্রাণরসে পরিপূর্ণ হইলেও নাট্যশালার দিক্ দিয়া ব্যর্থ, কেননা ইহা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি ও নাটকীয় পরিণতির ঐক্যবন্ধহীন। সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি নাটকেরও ভাবানুবাদ আরম্ভ হইল। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' ও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস', নাটকে প্রাণসঞ্চারের কৃত্রিম প্রয়াসরূপে ও নাট্যাদর্শের প্রয়োগহীন তত্ত্বপরিচয়রূপে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী।

মধুসূদনের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের সমীকরণ

নাট্যসাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাব

এই প্রাণহীন অনুকরণের অসম্পূর্ণ ও বিকলাঙ্গ, ভগ্নমূর্তিবিকীর্ণ পটভূমিকায় মধুসূদনের নাট্যকাররূপে আবির্ভাব। অবশ্য তিনিও যে নিখুঁত শিল্পপ্রতিমা নির্মাণে সক্ষম হইয়াছিলেন, নাটকের নিগূঢ় প্রাণস্পন্দন যে তাঁহার নিকটেও ধরা দিয়াছিল এ দাবী করা যায় না। তিনিও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের অসমাহিত দ্বন্দ্বে যে কিয়দংশে স্রষ্টার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়চ্যুত হইয়াছিলেন তাহাও অস্বীকার

করা যায় না। তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' সংস্কৃত ও গ্রীক্ নাট্যাদর্শের বিপরীতমুখী আকর্ষণে দ্বিধাগ্রস্ত ও ভারসাম্যভ্রষ্ট। ইহাদের মধ্যে পার্শ্ব-ঘটনার চাপে নাটকের মূল অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায়ই আত্মবিস্মৃত ও অস্পষ্ট, অভিশাপের দৈব প্রাধান্যে মানবচিত্তের স্বাধীনতা অনেকাংশে আচ্ছন্ন ও উহার উপশমের সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যঘটনা ও নায়কনায়িকার ভাগ্যবিপর্যয়ের সুলভ অবসান। একমাত্র 'কৃষ্ণকুমারী'ই (১৮৬০) প্রথম সার্থক ও তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক বাংলা ট্রাজেডিরূপে প্রতিভার প্রাণদীপ্ত নাট্যরচনার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছে। সুদীর্ঘকালব্যাপী অনুসরণ ও পথসন্ধানের পালা শেষ হইয়া দ্বিখণ্ডিত জরাসন্ধ-মূর্তির পরিবর্তে ইহা এক অখণ্ড শিল্পসৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। অবশ্য মধুসূদন এখনও দীনবন্ধুর মত গার্হস্থ্য জীবনে ট্রাজেডির বীজ রোপণ করিতে বা প্রহসনে নিমচাঁদের মত প্রতিনিধিস্থানীয় অবিস্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু তিনিই প্রথম নাটককে স্বদেশীয় পরিবেশে ও জাতীয় জীবনযাত্রার সহিত নিবিড়-সম্পর্কযুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। নাটকের ভবিষ্যৎ ইতিহাসও কিন্তু জাতীয় আত্মার সহিত সম্পূর্ণ সমীকরণের পরিচয় বহন করে না। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অতি-আধুনিক নাট্যকারগোষ্ঠীর কেহ কেহ অনেক চমৎকার নাটকরচনার দ্বারা বাংলার নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু কোন নিগূঢ় কারণে নাটক সম্বন্ধে আমাদের একটা সূক্ষ্ম অতৃপ্তি কোন দিনই সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। নাটকে আতিশয্য ও অসংযমের অস্তিত্ব, উপাদানসমন্বয়ের ত্রুটি, ভাববিন্যাস ও ফলশ্রুতির অপরিণতি, তত্ত্ব ও থিয়োরির অতিপ্রকট তীক্ষ্ণতা, সংলাপ ও ঘটনা, অনিবার্য জীবনবোধ ও প্রচারধর্মিতার অসঙ্গতি আমাদের শিল্পবোধের সর্বোত্তম আদর্শকে বরাবর ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। আমরা যেখানে পাশ্চাত্য প্রভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছি অথবা যেখানে জাতীয় প্রেরণাকে অবলম্বন করিয়াছি, সর্বত্রই কোন অভ্রান্ত নাট্যসংস্কার আমাদের নাটকসৃষ্টিকে অনবদ্য রূপ দিতে পারে নাই। কাজেই নাটকীয় চেতনা আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত হয় নাই, নাটক আমাদের মনের পরোক্ষ প্রকাশ মাত্র, ঘর ও পরের মিলন এখানে প্রায় কখনই সমন্বিত রূপসৃষ্টিতে আবির্ভূত হয় নাই, এইরূপ ধারণা অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

নাট্যকার মধুসূদন

পরবর্তী নাট্যধারা

কাব্য-উপন্যাসের ক্ষেত্রেই মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টিপ্রতিভার যাদু-দণ্ডের আন্দোলনেই নব কল্পনারীতির বৈদ্যুতী শক্তি বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত হইল। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী

কবিতাবলী'ই এই আকাশ-বাতাসে বিকীর্ণ ও প্রতিভার দিব্য আধারে ঘনীভূতরূপে বিধৃত বিদ্যুৎছটার প্রথম দীপ্ত শিল্পসুষম আত্মপ্রকাশ।

মধুসূদনের কাব্য পরিকল্পনার পাশ্চাত্য প্রভাব

সাধারণতঃ আমরা এই কাব্যগুলিতে পাশ্চাত্য প্রভাব দেখাইতে গিয়া মধুসূদনের বিভিন্ন প্রতীচ্য মহাকবির নিকট তথ্য ও পরিকল্পনাগত ঋণের হিসাব দিতেই ব্যস্ত হই, তাঁহার মহাকাব্যে আহৃত বিভিন্ন উপাদানের আকরনির্দেশকেই মুখ্য স্থান দিয়া থাকি। কিন্তু মধুসূদনের তথাকথিত মহাজনগোষ্ঠীর তালিকারচনা বা তাঁহার ভাববস্তুর উৎস-সন্ধানই তাঁহার আশ্চর্য স্বীকরণশক্তি ও প্রয়োগদক্ষতার যথার্থ পরিমাপক নহে। পুরাতন উপাদানসমূহের নূতন উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী বিন্যাস, বিদেশীয় বস্তুর সহিত প্রাচ্য আদর্শের সামঞ্জস্যস্থাপন, পরিচিত ঘটনাবলীর মধ্যে নবতাৎপর্যসঞ্চার এবং এই মিশ্র ও দূরাহৃত উপকরণবিশৃঙ্খলার এক অখণ্ড আবহ-রচনা-কার্যে সার্থক নিয়োগ কবিকল্পনার এক অভাবনীয় নির্মাণশক্তির পরিচয়। মধুসূদন যেন মন্ত্রবলে এক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। তাঁহার আহ্বানে হোমার-ভার্জিল ব্যাস-বাল্মীকির সঙ্গে একাসনে বসিয়াছেন, গ্রীক দেবদেবী ও হিন্দু দেবতা তাঁহাদের সমস্ত স্বরূপপার্থক্য ভুলিয়া একই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। রণক্ষেত্র ও প্রমোদকানন, বীর, মধুর ও করুণরস, রাজনীতির নির্মমতা ও গার্হস্থ্য জীবনের কোমল আকৃতি, অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয়তা ও কর্মফলের অমোঘতা—এক কথায় অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের অপরিমেয় বৈচিত্র্য সব যেন এক স্বর্গমর্তপাতালব্যাপী সৃষ্টি-যজ্ঞশালায় আমন্ত্রিত হইয়া এই বিরাট যজ্ঞসম্পাদনে সহায়তা করিয়াছে। এই বিপুল আয়োজন এবং উহার সূক্ষ্মতমরূপে পরিকল্পিত, নিখুঁত পরিণতি বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে এক অকল্পনীয় শক্তির আবির্ভাব ও উহার আশ্চর্য-কুশল প্রয়োগসিদ্ধি সূচিত করে। এযেন দ্বৈরথ সংগ্রামের সমতলভূমিতে গিরিসঙ্কটচারী, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর জটিল ব্যূহরচনা ও মুহূর্তে মুহূর্তে সুযোগসন্ধানী রণকৌশলের পরিবর্তনশীল দ্রুত ছন্দসমাবেশ।

আধুনিক মহাকাব্যের আদর্শ

যখন কোন কবি প্রাচীন মহাকাব্যের অনুসরণে আধুনিক মহাকাব্যরচনায় ব্রতী হন, তখন তাঁহাকে মহাকাব্যোপযোগী বিশেষ ভাবাবহ ও ফলশ্রুতিলাভের জন্য বিশেষ কল্পনারীতির প্রয়োগ ও কলাকৌশলের অবলম্বন করিতে হয়। ভারতে ব্যাস ও বাল্মীকির ও প্রতীচ্য দেশে হোমারের মহাকাব্য তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত কবিপ্রেরণারই অনায়াসসাধনালব্ধ ফল। তাঁহাদের অনুভবে জীবনপ্রেরণার যে সহজ মহিমা প্রতিভাত হইয়াছিল,

তাহাই তাঁহাদের কাব্যে অকৃত্রিম অভিব্যক্তি পাইয়াছে। হিন্দু ভারতের সাধনা র্জিত জীবনাদর্শ ও সহজ ধর্মসংস্কার, প্রাচীন গ্রীসের চিরাভ্যস্ত জীবনচর্চা হইতে উদ্ভূত সরল বলিষ্ঠতা ও শক্তিবাদ, দেবনির্ভর নিয়তিবোধ, উহার রাজনৈতিক বিখণ্ডতার ফলস্বরূপ ঈর্ষ্যা-অভিমান প্রভৃতি প্রাকৃত বৃত্তির প্রাদুর্ভাব, উহার বর্বরতা-মিশ্র সভ্যতা-সংস্কৃতি, ও উহার বিচিত্র-অভিজ্ঞতা-বিচ্ছুরিত লাবণ্য ও মহিমাচ্ছটা—এগুলি সবই কবিদের কোন শিল্পসচেতন অলঙ্করণপ্রয়াস ব্যতীতই তাঁহাদের কাব্যে নিজস্ব গৌরবে প্রতিফলিত। সমস্ত সমাজের অন্তরাত্মা, সমস্ত লৌকিক কাহিনী-কিংবদন্তীর ভাব ইতিহাস, মাথার উপরকার আকাশের সব প্রজ্বলন্ত ইঙ্গিত, মৃত্তিকার সমস্ত স্নিগ্ধ শ্যামলতা, জীবনযাত্রার সমস্ত উপরিতলার রুক্ষতা ও রসধারার ফল্গুপ্রবাহ এই মহাকাব্যের আধারে স্বতঃসঞ্চিত হইয়া উহার সমগ্র বহুমুখী সত্তাকে কবিকল্পনার সহজ অনুভববেদ্য রূপ দিয়াছে। কবির কল্পনাশক্তি যেন এখানে সচেতনভাবে ক্রিয়া না করিয়াই জীবনসমুদ্রের অপরিমেয় গভীরতা ও বিস্তৃতিকে এক অগস্ত্য-গণ্ডূষে পান করিয়াছে। হোমার বা ব্যাস-বাল্মীকির আর্টের কথা আমরা স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করি না; তাঁহাদের বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যেই এক সুবিশাল পটভূমিকা, এক গৌরবময় সংস্কৃতির সুমহান্ ইতিহাস অনায়াস-প্রতিবিম্বিত। ঋষির মন্ত্রোচ্চারণের মত আদি কবিগোষ্ঠীর সঙ্গীতে যেন সমস্ত অতীত সমুদ্রস্বননের ন্যায় গম্ভীর নির্ঘোষে কথা বলিয়া উঠিয়াছে।

আদি যুগের মহাকবিগোষ্ঠী যে ঐতিহ্য-প্রাসাদে স্বচ্ছন্দবিচরণের অধিকার পাইয়াছিলেন, পরবর্তীকালের মহাকাব্যকারেরা কাব্য-ইন্দ্রজালের বলে সেই প্রাসাদদ্বার উন্মোচন করিয়াছেন। কাজেই ব্যাস-বাল্মীকি-হোমারের সঙ্গে মিলটন-মধুসূদনের একটা শিল্পগত মৌলিক পার্থক্য আছে। পূর্বতন কবিদের যে স্বভাব-সমুন্নতি, পরবর্তীরা শিল্পবিন্যাসের সচেতন প্রয়োগে, শব্দনির্বাচনে, ধ্বনিগাম্ভীর্যে, ভাষা ও ভাবের অভিজাত-মর্যাদায়, সর্বোপরি এক বিশাল পটভূমিকার সার্থক দ্যোতনায় তাহা অধিগত করিয়াছেন। সুতরাং মিলটন ও মধুসূদনের কবি-কল্পনা আরও গূঢ়ানুপ্রবেশী, আরও ব্যঞ্জনাময় ও বিস্মৃতপ্রায় অতীত-মহিমার উদ্বোধনে আরও কুশলী। ইলিয়াড-রামায়ণ-মহাভারতের রচয়িতাদের কাব্যবর্ণনার সহিত প্রত্যক্ষ সত্যের ব্যবধান অতি সামান্য। তাঁহারা যে সমস্ত ঘটনা ও ভাবের সংঘাত বিবৃত করিয়াছেন তাহারা অতীতের গোধূলিচ্ছায়াস্পৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের নিকট জ্বলন্ত সত্যরূপে বর্তমান ছিল। যে উত্তাপ তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন তাহা তখনও

প্রাচীন ও আধুনিক মহাকাব্যের তুলনা

অনির্বাণ ইতিহাসের অগ্নিকুণ্ড হইতে সরাসরি কবিকল্পনার দিব্য দীপ্তিতে সঞ্চারিত হইয়াছিল। জীবনের উপাদান আর কাব্যের উৎবর্তিত রূপান্তর প্রায় অব্যবহিত নৈকট্যে সমন্বিত। গঠনশিল্পের দিক দিয়াও তাঁহাদিগকে বেশী আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। সমস্ত বিচিত্র ঘটনার পরিবর্তনশীল দৃশ্যাবলী বাস্তব জীবনের সূত্রে গ্রথিত ও কবির অমোঘ নীতিবোধের দ্বারা বিন্যস্ত হইয়া এক অনায়াস-সিদ্ধ নাটকীয় সংহতিতে ঘনবদ্ধ হইয়াছে। রামের জীবনকাহিনী, কুরুপাণ্ডবের ও গ্রীক-ট্রোজানের যুদ্ধবৃত্তান্ত কবির মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দানা বাঁধিয়াছে ও আর্টের মহিমামণ্ডিত হইয়াছে।

যেমন পর্বত অরণ্য প্রভৃতি মহান্ প্রাকৃতিক রূপবিষয়ের মধ্যে মানবকল্পনাতীত এক বিরাট ও জটিল নির্মিতসুষমা লক্ষিত হয়, প্রাচীন মহাকাব্যের শিথিল-গ্রথিত বিষয়বৈচিত্র্যের মধ্যেও তেমনি একটি কবির সহজচেতনাপ্রসূত বিন্যাসপারিপাট্য পাঠকের নিকট প্রতিভাত হইয়া থাকে। পরবর্তীকালের মহাকাব্যকারকে কিন্তু এই অবয়ব-বিশালতা ও পরিবেশ-মহিমা পরিণত শিল্প-কৌশলের সাহায্যে পরিস্ফুট করিতে হয়। চিত্রকর যে ভাবে রেখা ও রং-এর দ্বারা অসীম দূরত্বের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন, অর্বাচীন মহাকাব্যরচয়িতাকেও তেমনি পরোক্ষ উল্লেখে, দৃশ্য ও ঘটনার দূরচারিতায় এবং সঙ্কেত ও বর্ণময় শব্দপ্রয়োগে সেই সুদূরের ব্যঞ্জনা প্রক্ষেপ করা প্রয়োজন।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যে কল্পনার এইরূপ শক্তির আশ্চর্য উদাহরণ মিলে। অতি পুরাতন রামরাবণের যুদ্ধকাহিনী দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে আমাদের মনে যে বর্ণৌজ্জ্বল্য হারাইয়াছিল, যে অভ্যস্ত ভক্তিসংস্কারের প্রলেপে উহার বহ্নিগর্ভ উত্তেজনাকে স্নিগ্ধতার আবরণতলে সমাধি দিয়াছিল, মধুসূদন উহার সেই প্রাণময় জ্বলন্ত সত্তাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণ আদর্শ নরদেবতার প্রশস্তিতে মুখর; রাম সেখানে শাশ্বত ধর্মাদর্শের প্রতীক-রূপেই নিজ মানবিক পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। চৈতন্যধর্মে অনুপ্রাণিত কৃত্তিবাস সেই রামকে যুগোচিত ভক্তিসাধনার পাত্ররূপে, পরমকারুণিক পাপী-তাপী-উদ্ধারকর্তারূপে, ভাগ্যবিড়ম্বনা ও বিরহক্লেশপীড়িত, অশ্রুবিহ্বল প্রেমিকরূপে দেখাইয়া তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের পূর্বসূরীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মধুসূদন উনবিংশ শতকের নবজাত স্বাধীনতাস্পৃহাকে তাঁহার মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় ভাবপ্রেরণারূপে গ্রহণ করিয়া ও রামলক্ষ্মণের প্রচলিত প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া দেশাত্মবোধের প্রতীক রাবণ-ইন্দ্রজিৎকে

মহাকাব্যে মধুসূদন

নায়কের মর্যাদা দিয়াছেন। তিনি মহাকাব্যের দেহমধ্যে নূতন আত্মার সঞ্চার করিয়া উহাকে প্রাচীনের প্রথাবদ্ধ পুনরাবৃত্তি হইতে নবভাবের প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। এই যুগচেতনার বাহন হইয়া মহাকাব্যখানি যুগপ্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় নূতনরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এই নবতাৎপর্য-আরোপ, সুপ্রাচীন কাব্যরূপের জরাজীর্ণ ধমনীতে নূতনরক্তধারাসঞ্চার মধুসূদন-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কল্পনার এই যুগোপযোগী সঞ্জীবনী শক্তি তাঁহার দ্বারা পাশ্চাত্য প্রভাবের নিগূঢ় স্বীকরণ সূচিত করে। মহাকাব্যের যে হরধনুতে জ্যারোপণ অতি-ব্যবহারের জন্য শিথিল হইয়াছিল, মধুসূদন-প্রতিভা তাহাতে মৌলিক উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর নূতন জ্যা লাগাইয়া টান করিয়া বাঁধিল ও উহার টঙ্কারনির্ঘোষ ও অস্ত্রক্ষেপণশক্তি নবঅস্ত্রআবিষ্কারের গৌরব লাভ করিল।

মধুসূদনের নানা খণ্ড-আখ্যানসংযোজনার দ্বারা রসবৈচিত্র্যসম্পাদন, তাঁহার যুদ্ধপ্রস্তুতি ও রণক্ষেত্রবর্ণনা, তাঁহার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য-পরিস্ফুটনের উপায়-নির্ণয়, তাঁহার ঘটনাবিন্যাসে পরিমিতিবোধ ও কেন্দ্রসচেতনতা, তাঁহার বীর ও করুণরসের, হিন্দু প্রাচীন ভাবাদর্শের ও আধুনিক মনোবৃত্তির সমন্বয়, তাঁহার রচনার চিত্রধর্মিতা ও সংকেতশীলতা, সর্বোপরি তাঁহার তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র-দ্যোতনা—সবই কবিকল্পনার এক অভিনব লীলাময়তার নিদর্শন। এই কল্পনার স্বরূপপ্রকৃতি উহার অনুষ্ঠেয় উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে আশ্চর্যভাবে উপযোগী। ব্যাস ও হোমারের মত পটভূমিকার ব্যাপকতা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বহুলতা মধুসূদনের নাই—তাঁহার সংক্ষিপ্ততর পরিবেশে কয়েকটি মাত্র চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। সুতরাং মহাভারতের কৌরব-পাণ্ডবপক্ষীয় বা ইলিয়ডের গ্রীক ও ট্রোজানজাতীয় অসংখ্য বীরকুলের সূক্ষ্ম ও ব্যক্তিত্বদ্যোতক চরিত্রপার্থক্য ফুটাইয়া তুলিবার অবকাশ মধুসূদনের নাই। তথাপি শ্রেণীগত সাধারণ লক্ষণের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার স্বরূপনির্ণয়ে কল্পনাশক্তির যে গূঢ়ানুপ্রবেশের প্রয়োজন তাহা তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। তাঁহার রাবণ একাধারে চিরকালের স্বেচ্ছাচারী ও দুর্দম-প্রকৃতি, ধর্মসঙ্কোচহীন অনার্য রাজার প্রতিনিধি, আবার অদৃষ্টরহস্যবিড়ম্বিত, বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ, অশান্ত আধুনিক মানবেরও প্রতিমূর্তি। যে একসঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক; তাহার সত্তার মধ্যে শ্রেণীচেতনার সহিত বর্তমানযুগোচিত অনির্দেশ্য বিহ্বলতাবোধ, এমন কি তাহার স্রষ্টার পরোক্ষ আত্মপ্রক্ষেপের ছায়াও যে আশ্চর্য সঙ্গতিলাভ করিয়াছে, বিসদৃশ উপাদানের যে যৌগিক ঐক্য নির্মিত হইয়াছে তাহা পাশ্চাত্য কল্পনারই গূঢ়প্রভাব—

সঞ্জাত। মহাভারতের দুর্যোধন ও ইলিয়ডের ইউলিসিস-চরিত্রেও কতকটা এই ধরনের মানস জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মধুসূদনের রাবণ আরও সুক্ষ্মভাবে সঞ্জীবিত ও কবির প্রাণচেতনাস্পর্শে আরও বিদ্যুৎ-স্পন্দিত। প্রাচীন মহাকাব্য-গুলি লেখা হইবার পরে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে বেদনাস্মৃতি, যে অপরিহার্য জীবন-যন্ত্রণা মানবচিত্ততলে সঞ্চিত হইয়াছে, যে করুণ রস উদ্বেল হইয়া মানব-জীবনের মহাদেশকে দ্বৈপায়নত্বে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, মধুসূদনের বীররস তাহার সমস্তই আত্মসাৎ করিয়া বর্বর শক্তিপরীক্ষা হইতে জীবনযন্ত্রণাস্পর্ধী, আত্মিক সংকল্পের দ্যোতনায় অর্থগূঢ় হইয়াছে। মধুসূদন-কল্পনার অভিনব শক্তি স্বল্পপরিসরের মধ্যে বীর ও করুণরসের এই অপূর্ব রাসায়নিক সমন্বয়-সাধনে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের মেঘগর্জনগম্ভীর ওজস্বিতা ও কাব্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য-সাধন তাঁহার কবিকল্পনার সর্বত্র-প্রসারী, সদাসক্রিয় অস্তিত্বের পরিচয় দিয়াছে। দেহ ও আত্মার মিলনের এরূপ নয়সর্গব্যাপী, নিখুঁত দৃষ্টান্ত বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অদৃষ্টপূর্ব।

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী' কবিতাবলী' একদিকে যেমন নূতন কাব্য-প্রকরণের নিদর্শন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার কল্পনার নব নবনির্মিতি-বৈচত্র্যেরও পরিচয়বাহী। এই দুই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা বৈপ্লবিক চমক সৃষ্টি না করিলেও শান্তশ্রী মৃদু জ্যোতিতে উহার মৌলিকতাকে প্রকাশ করিয়াছে। কল্পনা কত বিচিত্রগামী ও নবসন্ধানী হইলে নূতন কাব্যাঙ্গিক সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, নূতন ভাবের উপযোগী দেহবিন্যাস রচনা করে তাহা এখানেই প্রমাণিত হইয়াছে। পত্রকাব্য রোমান কবি অভিড হইতে কত স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় পৌরাণিক পরিবেশে স্থানান্তরিত ও ভারতীয় নারী-চরিত্রের মনোভূমিতে নবপল্লবিত হইয়াছে! আবার যে আত্মলীন ভাব-ভাবনার মৃদু উচ্ছ্বাস সনেটের কায়াদৃঢ়তা ও অনুভূতির সংযমনিবিড়তায় নিজ মূর্তি অঙ্কন করে তাহা মধুসূদনের কবিকল্পনার মাধ্যমে বাংলা কাব্যমানচিত্রে প্রথম চিহ্নিত হইয়াছে। বাঙালী কবি-হৃদয়ে প্রথম এই ভাবকল্পনা সঞ্চারিত ও উহার উপযোগী রূপচেতনা শিল্পোৎকীর্ণ হইয়াছে। এই সবই মধুসূদনের কল্পনার প্রেরণা-উৎস ও জীবনপ্রক্রিয়ার বিচিত্রতার সন্ধান দেয়।

মধুসূদনের অন্যান্য কাব্য

৩

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এই পাশ্চাত্য প্রভাব আর একটি নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সাধারণতঃ কাব্যসৌন্দর্যের দিক দিয়া বিভিন্ন জাতি ও যুগের মধ্যে

একটা রুচিসাম্য আবিষ্কার করা যায়। বিশেষতঃ ঐতিহ্যাশ্রয়ী মহাকাব্যসমূহকে পর্বতশৃঙ্গচূড়া হইতে পরিদৃশ্যমান দিগন্তরেখার ন্যায় পরস্পরসংসক্ত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের সহিত তুলনায় বাস্তবজীবননিষ্ঠ গদ্যসাহিত্য জাতীয় বৈশিষ্ট্যের তীক্ষ্ণ প্রকাশ দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে কল্পনাক্রিয়া যেন উপাদান ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং কাব্য অপেক্ষা উপন্যাস বা প্রবন্ধসাহিত্যে বিদেশীয় প্রভাব স্বভাবতঃই সূক্ষ্মতর ও দুর্লক্ষ্যতর। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির গভীর প্রভাব সত্ত্বেও নিজ জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি প্রবল নিষ্ঠা পোষণ করিতেন। নিজ প্রতিষ্ঠাভূমিতে দৃঢ়বদ্ধ না থাকিলে, নিজ জাতীয় চেতনার ভাববেষ্টনীতে আত্মরক্ষা না করিতে পারিলে কোন প্রতিভাশালী সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে বিদেশীয় প্রভাব আত্মসাৎ করা সম্ভব নয়। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ বা আচার-আচরণ সহজেই গ্রহণ-বর্জন করা যায়। কিন্তু আত্মার যে গভীরে সৃষ্টিপ্রেরণা গুহাহিত, সেখানে নিজ স্থির জীবনপ্রজ্ঞা ও অধ্যাত্ম সংস্কারের নির্ভরযোগ্য আশ্রয় ছাড়া ঋণ-করা মানস ঐশ্বর্যকে সৃষ্টিশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় না। বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে প্রথম দুইজন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মন্ত্রদীক্ষিত সাহিত্যস্রষ্টা অতীতে দৃঢ়সংসক্ত থাকিয়াই নূতনকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ ঐতিহ্যরচিত জীবনমধুচক্রে প্রতীচ্য ভাবকল্পনার মধু সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সৌন্দর্যবোধকে আরও বিচিত্ররসাস্বাদী করিয়া তুলিয়াছেন। উভয়েই আশ্চর্য স্বীকরণ ও সমন্বয়শক্তির ফলস্বরূপ গদ্যে ও পদ্যে, কাব্যকল্পনায় ও জীবনসমীক্ষায়, এক একটি অভিনব তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য রচনা করিয়াছেন। মধুসূদনের মহাকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব উপকরণে ও অলঙ্করণে, ওজস্বিতায় ও ভাব-মহিমায় সর্বত্র পরিস্ফুট, কোথাও বা মাত্রাসুষমা ছাড়াইয়াও অতিপরিস্ফুট। বঙ্কিমচন্দ্রের গার্হস্থ্য উপন্যাসে, রোমান্সে ও মননশীল, গূঢ়ানুভূতিমূলক রচনায় ইহা মৃত্তিকাভ্যন্তরপ্রবাহিণী রসধারার ন্যায় সাহিত্যে অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া উহাকে এক অসাধারণ প্রাণোচ্ছল লাবণ্যে পরিপূর্ণ করিয়াছে।

মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি মোটের উপর পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূলসূত্র-অনুসরণে রচিত। কিন্তু তাঁহার প্রত্যেকটি উপন্যাসে চরিত্র-কল্পনা, ঘটনাবিন্যাস ও দ্বন্দ্বসমাধান বাঙলার সমাজজীবনের সহিত গ্রথিত ও উহারই ছন্দ ও ভাবপ্রেরণায় গতিশীল। আমরা তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র উপর স্কটের 'আইভানহো'র প্রত্যক্ষ প্রভাব কল্পনা

করিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের পরিচয় দিয়াছি। সাধারণতঃ ব'র যুগের জীবনাদর্শ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে প্রায় সমপ্রকৃতিক ; আর প্রণয়-প্রতিযোগিতায় ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব বর্তমান সমাজজীবনে যতটা দুর্লভ অতীত ক্ষাত্রশৌর্যের কালে ততটা ছিল না। যখন স্বয়ংবরপ্রথা প্রচলিত ছিল ও বীর্যশুল্ক নারীগ্রহণ যখন বিবাহের অন্যতম বৈধ প্রকাররূপে স্বীকৃত হইত, তখন জগৎসিংহ-আয়েষার সম্পর্ক-জটিলতার পূর্ব-দৃষ্টান্ত খুঁজিতে প্রতীচ্য আদর্শের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাহা হইলে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার রোমান্সকে ভারতের ইতিহাস হইতে বাদ দিয়া উহার অস্তিত্বের মূল ইউরোপীয় জীবনকাহিনীতে কল্পনা করিতে হয়। এই দাসমনোবৃত্তির আতিশয্যই আমাদের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষার সম্পর্কের সহিত আইভানহো-রোওয়েনা-রেবেকা-সম্পর্কের যে ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে তাহা যে উভয়ত্রই সাধারণ মানবিকবৃত্তিসঞ্জাত, প্রত্যক্ষঅনুকরণজাত নয় তাহা জোর করিয়াই বলা যায়। জগৎসিংহের প্রণয়োন্মেষে যুদ্ধকালীন সঙ্কটের আকস্মিকতা আছে, অথচ হিন্দু সমাজনীতির বাধা-নিষেধও ইহার উপর ক্রিয়াশীল। গড় মান্দারণের জীবনযাত্রা অনেকটা সংস্কারমুক্ত ও স্ফূর্তিময় হইলেও, ইহাতে স্ত্রীস্বাধীনতা ও আনন্দোচ্ছলতার অশৃঙ্খলিত প্রাচুর্য থাকিলেও, ইহা সূক্ষ্মভাবে হিন্দু-আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত। ইহাকে ইংলণ্ডের মধ্যযুগীয় জীবনছন্দের কৃত্রিম প্রতিচ্ছবি মনে করিবার কোন কারণ নাই। হয়ত ইহার ইতিহাস তথ্যরিক্ত ও কল্পনাস্ফীত ; সমাজজীবনের উপর ইহার প্রভাবও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। ইহা ব্যক্তিজীবনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে না ; সুদূর দিগন্তে দাঁড়াইয়া উহার উপর কিঞ্চিৎ বর্ণমায়া সংক্রামিত করে ; কখনও বা উহার প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে দুই একটি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া ব্যক্তিজীবনে ছোট-খাট ক্ষণস্থায়ী বহ্ন্যুৎসবের সৃষ্টি করে। বঙ্কিমের উপন্যাসে ইতিহাসের উৎস পশ্চিমের ভাবাকাশ, উহার বস্তুবদ্ধ জীবনঘনতা নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাশ্চাত্য প্রভাব

বঙ্কিমের অন্যান্য ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসও স্বদেশীয় জীবনকল্পনালালিত। 'মৃণালিনী,' 'চন্দ্রশেখর,' 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' ও তাঁহার স্বয়ংস্বীকৃত একমাত্র বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'—সকলেরই বহির্বেষ্টনী দেশীয় ইতিহাসরচিত ও অন্তরের সারনির্যাস হিন্দু ভাবাদর্শ-ক্ষরিত। কেবল উভয়ের মধ্যে সংযোগসূত্রটি পাশ্চাত্য রীতির বয়নশিল্প হইতে গৃহীত। শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্ত,

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস

আনন্দমঠের ধর্মসাধনার সহিত অভিন্ন দেশাত্মবোধ, দেবীচৌধুরাণীর নিষ্কাম ধর্মদীক্ষা ও সীতারামের অন্তরজীবনসমস্যা—এ সবই ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের বিভিন্নমুখী প্রকাশ। কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখক ইতিহাসকে এইরূপ সূক্ষ্ম ধর্মানুভূতির পরিপোষক আধাররূপে, ইতিহাসের দাবানলকে যজ্ঞবহ্নির হোমশিখা-রূপে কল্পনা করিতে চাহেন নাই ও চাহিলেও পারিতেন না। এক 'রাজসিংহ' ছাড়া অন্যত্র বঙ্কিম ইতিহাসের উত্তাপকে নিজ আদর্শ-অনুযায়ী সম্পূর্ণ নূতন উদ্দেশ্যে, নূতন তপশ্চর্যার প্রেরণারূপে প্রয়োগ করিয়াছেন। নিজ সংস্কৃতিতে অবিচল থাকিলে বিদেশীয় প্রভাবকেও যে একান্ত আপনার করিয়া লওয়া যায়, ঋণকরা ঐশ্বর্যকেও যে নিজ সনাতন লক্ষ্মীশ্রীর লাবণ্যবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের গার্হস্থ্য উপন্যাস

বঙ্কিমের গার্হস্থ্য উপন্যাসগুলিতে এই পাশ্চাত্য প্রভাব আরও সূক্ষ্ম ও অন্তরঙ্গ-ভাবে ক্রিয়াশীল। ইতিহাসের রাজবেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সাদৃশ্যটি চিনাইয়া দেয়—রাজমহিমা ও শৌর্যাদর্শ, রাষ্ট্রসমস্যা ও যুদ্ধের নির্মম ছন্দ অনেকটা সার্বভৌম পদার্থ; দেশকালভেদে কিছু কিছু ছোটখাট পার্থক্য সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে একটা সাধারণ লক্ষণসাম্য সহজেই অনুভব করা যায়। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনেই দেশে দেশে ব্যবধান প্রচুর ও দুরতিক্রম্য; এক দেশের জীবনধারাকে অন্য দেশে চালাইয়া দেওয়ার চেষ্টা আমাদের ঔচিত্যবোধ ও সাহিত্য-প্রেরণাকে পীড়িত করে। সেই খানেই বঙ্কিম-প্রতিভা প্রাচ্য জীবনছন্দের সহিত পাশ্চাত্য আবেগোচ্ছলতা ও দুর্দম মনোবৃত্তির তীব্র আত্মদ্বন্দ্বের আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করিয়াছে। ইউরোপীয় জীবন-স্রোতের যে অপ্রতিরোধ্য জোয়ার উনিশ শতকের প্রথম পাদ হইতে তরলমতি, বিলাসপ্রিয় বাবুনন্দনকে সমাজনীতি ও সুরুচির সমস্ত আশ্রয় হইতে ছিন্ন করিয়া সর্বনাশের মরণমোহানায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহাই কিছুকাল পরে স্থির ও চিরকালীন বেগ সঞ্চয় করিয়া উন্নততর ও আত্মসংবিদে দৃঢ় ব্যক্তিজীবনেও এক অন্তর্দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ মানস বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক এই মুহূর্তে, যখন বাহিরের বিক্ষেপ অন্তরের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া মনোলোকের গূঢ় প্রতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইয়াছে, তখনই বাঙালীর জীবনসমস্যারূপায়ণে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে বাঙালী পরিবার-বিন্যাস, ভারতীয় ধর্মসংস্কার ও জীবনদর্শন ও পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব ও ভাবকল্পনা এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হইয়া বাহ্যঘটনার মধ্যে এক অসাধারণ তাৎপর্যগৌরব সঞ্চার করিয়াছে।

তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতেই এই রূপান্তরপ্রক্রিয়ার সমস্ত শিল্পকলা, ভাবগৌরব ও মনস্তত্ত্বনৈপুণ্যের সম্মিলিত শক্তির ধারণা করা যাইবে। ঐ দুই উপন্যাসের নায়কদ্বয় শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান ও চরিত্রবান্ যুবক, কোন বহিরাগত প্রভাব তাঁহাদের ভারসাম্য বিচলিত করিতে পারিবে না। তাঁহারা-ইংরাজি শিক্ষায় কতদূর ব্যুৎপন্ন ছিলেন, বা সেই শিক্ষা হইতে তাঁহারা কোন নূতন বিপর্যয়কারী জীবনদর্শনে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কি না, বঙ্কিম তাহা পাঠককে জানাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। তাঁহারা তৎকালোচিত শিক্ষাদীক্ষায় সম্পূর্ণ আত্মস্থ হইয়াছিলেন, এমন কি তাঁহাদের সনাতন ধর্মবোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠাও এই শিক্ষা দ্বারা কোন অংশে বিচলিত হয় নাই। তাঁহাদের প্রলোভন ও দুর্বলতা অন্তরের ব্যাপার, বাহিরের নয়, কোন নূতন সমাজচেতনাপ্রসূত নয়। এমন কি নগেন্দ্রের বিধবাবিবাহ, কোন সমাজনীতিসম্পর্কিত নয়, তাঁহার ব্যক্তিস্বভাবের দুর্দমনীয় রূপমোহের প্ররোচনা। গোবিন্দলালও রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন আধুনিক সমালোচকের ন্যায় তাহার বৈধব্যের প্রতি সমবেদনার জন্য নয়, তাহার জ্বলন্ত রূপবহ্নি ও ভ্রমরের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহার দ্বারা। মধুসূদনের প্রহসন দুইটিতে যেমন নায়কের চরিত্র ও আচরণের মূল তাহাদের বিশেষ সমাজ-প্রতিবেশনিহিত, ভক্তপ্রসাদ যেমন প্রাচীন ভণ্ড ও নবকুমার যেমন আধুনিক যুগের প্রতিনিধি ও তাহাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই, বঙ্কিমচন্দ্রে তাহার অনুরূপ কিছু দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র হয় সমাজ-প্রতিবেশকে সম্পূর্ণ অবান্তর মনে করিয়াছেন, না হয় অন্তর্জীবনসমস্যার পরিপোষক শক্তিরূপে উহাকে ব্যক্তি-সত্তাকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কৌতূহল ব্যক্তিজীবনে কেন্দ্রীভূত ও উহার রহস্যোদ্ভেদে নিয়োজিত।

এই ব্যক্তিজীবনসমস্যারূপায়ণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জীবনঘটনাকে নিখুঁত ভাবে অনুবর্তন করিয়া উহার প্রবৃত্তিদ্বন্দ্বের শক্তি অসাধারণরূপে বৃদ্ধি ও উহার চরম ফলশ্রুতিকে আশ্চর্যরূপে মহিমান্বিত করিয়াছেন। বাঙালীর সনাতন অদৃষ্টবাদের সহিত পাশ্চাত্য জীবনসমীক্ষার মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণশৃঙ্খলিত অমোঘ পরিণতির সংযোগ সাধন করিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছেন। বাঙালীর তুচ্ছ, গতানুগতিক, ঘটনাচমকহীন জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সংঘাতের তীব্রতা, ভাবের সমুন্নতি ও আদর্শের উত্তুঙ্গ মহিমা নিহিত আছে, এক একটি জীবনে এক সার্বভৌম তাৎপর্য বীজাকারে প্রস্তুত আছে এই শাশ্বত কিন্তু অজ্ঞাত সত্য বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রথম উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। মান-অভিমান,

প্রণয়-কলহ, প্রেমের দ্বৈত আকর্ষণ—এ সবই অতি প্রাচীন কাহিনী। কিন্তু বঙ্কিমের পাশ্চাত্যপ্রভাবপুষ্ট ভাবকল্পনায় এই পুরাতন, মরিচা-ধরা উপকরণগুলি এক নূতন দীপ্তিতে ঝলসিত হইয়া উঠিয়াছে; ভোঁতা পারিবারিক অস্ত্রগুলি, মিলন-বিরহ-মনোমালিন্যের স্যাঁৎসেঁতে, মলিন মানস তৈজসপত্রগুলি অভাবনীয় তীক্ষ্ণতা অর্জন করিয়াছে, মার্জিত, নূতন পাত্রের ন্যায় সূর্যরশ্মিপ্রতিঘাতী ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত হইয়াছে। দরিদ্রের জীর্ণ কুটির ও ততোধিক জীর্ণতর গৃহসজ্জা এক মুহূর্তে রাজপ্রাসাদের অভিজাত মহিমায় ও চারু শিল্পসৌন্দর্যে বিকশিত হইয়াছে। এ যেন গৃহের মধ্যে এক অদৃশ্য আলোক-উৎস নিঃশব্দে ক্রিয়াশীল হইয়া যাহা কিছু ম্লান, বিবর্ণ ও উপেক্ষনীয় তাহাকে প্রখর দীপ্তিতে ও সুস্পষ্ট তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করিয়া তোলা; যাহা কিছু শিথিল ও প্রথাজীর্ণতায় স্বল্পমূল্য ও ক্ষীণ ঔৎসুক্যের মৃদু-তাপবাহী তাহাকে টান দিয়া সতেজ, পরিপূর্ণ উত্তপ্ত প্রাণচেতনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা; সহস্রের নামহীন জনতায় অবলুপ্ত ব্যক্তিসত্তার পুনরুদ্বোধন ও নব মূল্যায়ন। ভ্রমর, সূর্যমুখী, হীরা, রোহিণী, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল যেন বঙ্কিম-প্রতিভার যাদুদণ্ডস্পর্শে তাহাদের যুগযুগান্তের অর্ধস্তিমিত চেতনা ও অনুচ্চারিত মর্মবেদনা হইতে জাগিয়া এক মুহূর্তে তীক্ষ্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা ও বিস্তারে আমাদের রসবোধকে উন্মথিত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্কিম পুরাতনকে ত্যাগ করেন নাই বলিয়াই উহার মধ্যে নবশক্তি সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা সম্পূর্ণ ভাবে পুরাতন-বর্জনকারী তাঁহারা কেবল "দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাস" বিকীর্ণ করিয়াই আমাদিগকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব-কল্পনায় পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতিক্রিয়া

বঙ্কিমের মননশীল প্রবন্ধেও এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট। কিন্তু এখানে যুক্তিবাদ, তথ্যসঞ্চয় ও বক্তব্যের মধ্যে বক্তার স্বরূপাভাস কোন মৌলিক শিল্পরূপান্তর ঘটায় নাই। আমরা ইহাদের সাহিত্যরীতির উৎকর্ষের মধ্যে বঙ্কিমমানসের পরিচয় পাই, তাঁহার বক্তব্যের স্বচ্ছ দর্পণে তাঁহার মুখের ঈষৎ প্রতিচ্ছায়া অনুভব করি, কিন্তু কোন নূতন শিল্পরূপের সাক্ষাৎ পাই না। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ মননশীল জীবনসমীক্ষা একটি অপূর্ব রসরূপে উদ্বর্তিত হইয়াছে। এখানে বঙ্কিম নিজেকে অর্ধ-পাগল, আফিং-খোর অথচ দার্শনিক চেতনাবিষ্ট কমলাকান্তরূপে কল্পনা করিয়া সেই তির্যক্ রশ্মিতে নিজ সমস্ত মননঅনুভূতিকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। এই আশ্চর্য রাসায়নিক সমন্বয়ের ইন্দ্রজালশক্তিতে এক অভিনব সৌন্দর্যবোধ ও জীবন-

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্য

তাৎপর্যদ্যোতনা রূপ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব, ইউরোপীয় রীতি ও কল্পনা, দেশের বাস্তব সমস্যা ও তাহা হইতে উদ্ভূত এক বিশুদ্ধ ভাবসারগঠিত দেশাত্মবোধ সব মিলিয়া, যেমন জটিল যজ্ঞ-প্রক্রিয়ার পূর্ণাহুতি হইতে এক অভাবনীয় সিদ্ধি উৎপন্ন হয়, তেমনি এক দিব্য মানসবৃত্তি এক অপূর্ব দ্যুতিময় লাবণ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। বঙ্কিম পাশ্চাত্য সোমরস পান করিয়া এক নূতন সাহিত্যিক অমরতায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪

বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কল্পনার ধারা গঙ্গা-যমুনার ন্যায় মিলিত স্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকিলেও উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভবগম্য ছিল। রবীন্দ্রনাথে আসিয়া ঐ দুই ধারা পরস্পরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এক অখণ্ড মৌলিক সত্তায় পরিণত হইয়াছে। যেমন শুকতারার কম্পমান দীপ্তির সহিত নবোদিত অরুণরাগ নিশ্চিহ্নভাবে মিশাইয়া যায়, তেমনি রবীন্দ্রমানসে ভারতীয় ও প্রতীচ্য ভাবদৃষ্টি ও প্রকাশগূঢ়তা উৎস হইতেই এক হইয়া কবিচেতনার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছে, শাব্দিক ও ছান্দসিক-রূপগ্রহণের বহু পূর্বেই অনুভূতির মনোলীন স্তর হইতেই একই রসনির্ঝরে অভিস্নাত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও শিল্পসাধনা দ্বৈমাতুর স্তন্যধারায় পুষ্ট হইয়াছে। এক দিকে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, অন্যদিকে ইউরোপীয় দার্শনিক তত্ত্ব ও অভিব্যক্তিবাদ, একদিকে অসীমচেতনা, অন্যদিকে মানবপ্রেমের অতি সুকুমার আকৃতি তাঁহার কাব্যানুভূতিতে এমন সহজ ভাবে মিলিত হইয়াছে যে ইহাদের মধ্যে জোড়ের কোন চিহ্ন অতি দুর্লক্ষ্য। তাঁহার মন হইতে এই মিশ্র প্রবাহ অতি স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় ও তাঁহার কল্পনাশক্তির সমীকৃত প্রেরণায় উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার 'মানসী'তে প্রেমকবিতাগুলি উহাদের সূক্ষ্ম ভাববৈচিত্র্যে ও সুরমূর্ছনার ভাবানুসারী তারতম্যে প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তাঁহার 'কচ ও দেবযানী' ও 'গান্ধারীর আবেদন'-এ মহাভারতীয় আবহ ও আধুনিক গীতিময়তা, নাটকীয়তা ও নীতিতত্ত্ব এক অখণ্ড রসসত্তায় মিলিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা' মহাভারতীয় কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়াও পুরাতন বিষয়কে এক নূতন ভাবতাৎপর্যে মণ্ডিত ও এক অভিনব সৌন্দর্যতত্ত্বের নীতি-অতিসারী, অথচ উচ্চতর নীতিবোধাশ্রয়ী ব্যঞ্জনায় রহস্যময় করিয়াছে। তথাপি ইহাকে আরোপিত

রবীন্দ্রনাথ

প্রাচ্য—প্রতীচ্য ভাব-দৃষ্টির সমন্বয়

পাশ্চাত্য প্রভাবের নিদর্শন বলিয়া মনে হয় না, ইহা যেন মহাভারতীয় কাহিনীরই অন্তর্গূঢ় সৌরভের বাহিরে মুক্তি। তাঁহার 'বলাকা'য় বার্গস-এর আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে ঔপনিষদিক অগ্রগতির অধ্যাত্ম আবেগ ও জড়ের অনুগমনবেগ ও চেতনের জ্যোতিঃ-স্পন্দনের নিগূঢ় মিলন ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনে যাহা সৌরমণ্ডলের গতিতত্ত্বরহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে তাহাই প্রাচ্যদেশীয় মহাকবির কাব্যে অধ্যাত্ম চেতনার স্বরূপনির্ণয়ে জ্যোতির্ময় ও আবেগস্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যামী, জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা সবই ভারতীয় অধ্যাত্মপ্রত্যয়প্রসূত। কিন্তু এই পরিকল্পনা'র মধ্যে যে নরনারীপ্রেমের আত্মহারা, বাহ্যচেতনালোপী, বিপর্যয়ী আবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার জন্য প্রাচ্য ভগবৎপ্রেমিকের নজির থাকিলেও ইহাতে যে অন্ততঃ শেলি প্রভৃতি পাশ্চাত্য মরমিয়া কবিদের প্রভাবেরও কিছু স্থান আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রভাবের বিমিশ্রতা স্বীকার করিলেও ইহারা কবিচেতনা হইতে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ অখণ্ড অনুভূতিরূপে নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহার মনে তত্ত্ব ও ভাবকল্পনা এক আভ্যন্তরীণ অদৃশ্য অগ্নিতে গলিয়া এক অভিনব সংশ্লেষক্রিয়ায় একীভূত হইয়াছে। ইহার উৎসসন্ধান অপেক্ষা ইহার রসাস্বাদনই আমাদের নিকট অধিকতর স্বাভাবিক মনে হয়। তাঁহার 'উর্বশী'ও পৌরাণিক নারী না কবিকল্পনাসৃষ্টা, অনন্তকাল ও মানব ইতিহাসের সমস্তস্তরব্যাপিনী, সমস্ত নীতিশাসন ও গার্হস্থ্য সম্পর্কের অতীতা, বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং আশাভঙ্গ ও আদর্শচ্যুতির যুগযুগান্তরসঞ্চিত বেদনাবাষ্পে অন্তর্হিতা বঞ্চনাময়ী রূপপ্রতিমা, মানবদুঃখ ও ইতিহাস-প্রমাদের ক্রান্তিবিন্দুচারিণী মহামায়া—এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা মোটেই সহজসাধ্য নয়। উর্বশীর এই পরিকল্পনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের স্বর্ণসূত্রগুলি এমন নিপুণ বয়নশিল্পে একত্র গ্রথিত হইয়াছে যে ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া না কাটিয়া উহাকে রহস্যসন্ধানী মানবাত্মার সংশয়কণ্টকবৃন্তে বিকশিত একটি পরমরমণীয় আদর্শস্বপ্নপ্রসূনরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত ও শোভন।

যেখানে রবীন্দ্রকাব্য স্পষ্টতঃ প্রাচ্যভাবভাবিত—যেমন তাঁহার মৃত্যুপূর্ব শেষ দশ বৎসরের কাব্য—সেখানেও উহার প্রকাশে পাশ্চাত্য কল্পনারীতি, উহার চিত্রধর্ম, উহারআবেগছন্দ ও শিল্পাদর্শ লইয়া কবির গভীরতম প্রত্যয়কে নবরূপ দিয়াছে। হিন্দুর পরলোকতত্ত্ব, বর্ণময় মানবিক সত্তার শুভ্র নিরঞ্জন আত্মার জ্যোতিঃপরমাণুতে বিলুপ্তি মৃত্যুসাগরসংগমে উত্তীর্ণপ্রায় মানবাত্মার নিঃসঙ্গ ভাবশূন্যতা ও আদিম বিশুদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন—এসব প্রক্রিয়াই শিল্পরীতির

প্রয়োগকৌশলে পাঠকের উপলব্ধির নিকট প্রত্যক্ষসত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এখানে কবির অন্তরঙ্গতম সংস্কার কাব্যচেতনার কষ্টিপাথরে সুমার্জিত হইয়া স্বর্ণদীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কবির যে মন রূপকল্পনা করে ও যে গঠনশক্তি তাহাকে মূর্তি দেয় এই উভয় উপাদান বিভিন্ন কাল ও সংস্কৃতি-পরিবেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াও এক অপরূপ সৃষ্টিকার্যে সহযোগিতা করিয়াছে। দুই জাতীয় কল্পনা-কল্পতরুর দুই প্রকারের বীজ তাঁহার অন্তরের সৃষ্টির গোপন-গভীর গুহায় এক সঙ্গে পড়িয়া সেই আধারের মধ্যেই এক হইয়াছে ও পরিণামে এক অভাবনীয় কল্পবৃক্ষের স্বাদ ও রস একাধারে মিশ্রিত করিয়াছে। ইহাই রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক প্রভাবের স্বরূপ।

রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক প্রভাবের স্বরূপ

রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্যান্য বিভাগে, বিশেষতঃ তাঁহার ছোটগল্পে, একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রমানস অতি সহজেই নিজ দেশের জীবনযাত্রা আঁকিতে গিয়া উহার মধ্যে একটা দেশকালাতীত, সার্বভৌম জীবনাদর্শের নিগূঢ় ছন্দ অনুভব করিতে পারিত। রবীন্দ্রনাথের কুলীনকুমারী মহামায়া নিজ প্রখর রূপদ্যুতির মধ্যে শ্রাবণনিশীথিনীর সুনিবিড় রহস্য-উল্লাস জাগাইয়াছে ও তাহার অনমনীয় কৌলীন্যগর্ব বাঙলার সমাজ বৈশিষ্ট্যের ফল হইলেও ইহারই পিছনে যেন সকল দেশের সমস্ত সুন্দরী নারীর রূপাভিমানের অহঙ্কার ও সংকল্পদার্ঢ্যের প্রতিচ্ছায়া মিলিত হইয়াছে। যে বাঙালী মেয়ে হইয়াও বিশ্বের সুন্দরীসমাজের প্রতিনিধি। সে যখন তাহার বিমূঢ় প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিরুদ্দেশযাত্রায় পা বাড়াইল, তখনই সে বাঙালীর নিজস্ব পরিচয় বিলুপ্ত করিয়া বিশ্ববাসিনীর অনির্দেশ্যতায় আত্মগোপন করিল। 'অতিথি' গল্পের তারাপদ বাঙালী নিশ্চয়ই, বাঙালী প্রতিবেশে লালিত ও বাঙালীর কলাসংস্কৃতির রসপানে তাহার মন পুষ্ট ও লালিত্যময়। কিন্তু তাহার জীবনের সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও পরিধি-বিস্তার অনুধাবন করিলে তাহার বাঙালীত্ব নির্মোকের ন্যায় খসিয়া পড়ে ও তাহার একটি সাঙ্কেতিক, বিশ্বমানবিক পরিচয়ই ধীরে ধীরে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। পৃথিবীর এত বিচিত্র আবেদন স্পর্শ ও শোষণ করিবার এই অগস্ত্য-শক্তি সে কোথা হইতে অর্জন করিল? রবীন্দ্র-কল্পনা এক গৃহকোণে আবদ্ধ বাঙালী তরুণকে, এক ঘর বাঁধিবার কল্পনায় মুগ্ধচিত্ত প্রেমিককে হঠাৎ চলমান ধরিত্রীর আহ্বান শোনাইয়া উহাকে বিশ্বপথিক করিয়া ছাড়িয়াছে। তাঁহার 'ক্ষুধিত পাষাণ'—ইতিহাসপর্বের এক সঙ্কীর্ণ স্মৃতিচর্যাকে অতিপ্রাকৃত অনির্বচনীয়তার শাশ্বত বিস্ময়ে রূপান্তরিত করিয়াছে—ভোগমুগ্ধ ইন্দ্রিয়লালসা সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় সত্তায় উদ্বর্তিত হইয়া জন্মান্তরীণ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

মোহবিভ্রমরূপে মানবচিত্তে অক্ষয় আসন পাতিয়াছে। 'মনিহারা'-য় বাঙালী পুরুষের স্ত্রৈণ আসক্তি ও বাঙালী নারীর অলঙ্কারপ্রিয়তা এক প্রেতলোকের মায়াজালের ফাঁস বয়ন করিয়াছে—যাহা জীবনে একের কাহিনী ছিল তাহা জীবনান্তের পর সার্বভৌম রূপকসত্তায় পুনর্জীবিত হইয়াছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্তই রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শ ও ভাবচেতনা কিরূপ সূক্ষ্মভাবে মিলিত হইয়া আঞ্চলিক জীবনযাত্রার মধ্যে সমগ্র বিশ্বজীবনের সুরটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে তাহার চমৎকার নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই দুইটি সুরের মিশ্রণের মধ্যে জোড়াতালি দেওয়ার প্রবণতা কতকটা বিসদৃশভাবে প্রকট হইয়াছে। এমন কি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোরা'-তেও নায়কের ধর্মাচারমূঢ় ও পরদেশবিদ্বেষান্ধ সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা উদার বিশ্বমানবিকতায় রূপান্তরিত হইয়াছে সহজ সমীকরণপ্রক্রিয়ার নয়, আকস্মিক রূঢ় ঘটনাভিঘাতে। গোরার এই অতর্কিত রূপান্তর সমস্তজীবনব্যাপী আদর্শের অস্বীকৃতিরূপে একটা নূতন ভাবপ্রবাহের বিপর্যয়কারী শক্তির নিকট হঠাৎ আত্মসমর্পণ বলিয়াই মনে হয়। এখানে দুইটি রসধারা ধীরে ধীরে দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে একাত্ম হইয়া মিশিয়া যায় নাই, এক অন্যকে বলপূর্বক স্থানচ্যুত করিয়াছে। সুচরিতার সহিত বিবাহের পর গোরা তাহার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব দিয়া এই নবার্জিত আদর্শকে কি নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবে, উহাকে ঘিরিয়া আর কি অভিনব কল্পনামুগ্ধতার জাল বয়ন করিবে, আর কিরূপ দুর্বার আত্মদ্বন্দ্বে তাহার সমস্ত সত্তা দ্বিধাবিদীর্ণ হইবে আমরা তাহার কোন পূর্বাভাসই পাই না। সুচরিতাকে লইয়া সে যে আনন্দময়ীকে প্রণাম করিয়া নবজীবনে প্রবিষ্ট হইল, তাহার পর লছমনিয়ার হাতে একগ্লাস জল খাওয়ার মত তুচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনা করিয়াই তাহার আর কোন কাজ অবশিষ্ট রহিল না। মনে হয় তাহার ভবিষ্যৎ জীবন পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর মত ক্ষুব্ধ, ব্যর্থকাম, আত্মরোমন্থনরত মানবাত্মার ম্লানচ্ছায়াকে ঘনতর ও দীর্ঘতর করিবার কাজেই উৎসর্গিত হইবে। শেষ মুহূর্তে গলাধঃকৃত খাদ্য জীবনীশক্তি বাড়াইবার প্রয়োজনে লাগিবে না।

অন্যান্য উপন্যাসের সমস্যাসমূহও ঠিক বাঙালীজীবনকেন্দ্রিক হয় নাই—পশ্চিমের অনভ্যস্ত তীক্ষ্ণতা উহার বৃত্তসম্পূর্ণতাকে বার বার বিদীর্ণ ও ব্যাহত করিয়াছে। 'ঘরে-বাইরে'র বিমলা, 'চার অধ্যায়'-এর শচীশ-দামিনী, 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য-অমিত, 'যোগাযোগ'-এর কুমুদিনী-মধুসূদন সকলে মিলিয়া

যে খরধার জীবননদীতে সমস্যাসঙ্কুল ঘূর্নীচক্র উদ্দাম করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে কোথাও কোথাও বাঙালী জীবনাদর্শের মগ্নশৈল হয় আবর্তকে আরও জটিল করিয়াছে না হয় বিপরীতমুখী ধারার একটা ক্ষণিক উচ্ছ্বাস প্রবর্তন করিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর এই তরঙ্গোৎক্ষেপ বাঙালী জীবন-তটের সীমা লঙ্ঘন করিয়া বহু পরিমাণে উপকূলস্থ ভূভাগকে উৎপ্লাবিত করিবার দিকেই ঝুঁকিয়াছে। কাব্যে ও ছোটগল্পে যেরূপ পরিণত সমীকরণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, উপন্যাসক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রমই ঘটিয়াছে। হয়ত রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে উপন্যাস দ্রুত-পরিবর্তনশীল, নানা স্রোতোধারায় খণ্ডিত-বিচ্ছিন্ন জীবনরাজ্যের অন্তর্বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি। এখানে অন্তর-আলোড়নের বেগ-পরিমাপ ও বাহিরের রূপরেখার নব নব সীমানির্দেশই বড় কথা। এখানে আগে বস্তুপ্রাচুর্য ও ভাবসংঘাত, পরে রসপরিণতি। এখানে রস কোনও ধ্যানসাধনানির্ভর নয়, বিচিত্রবেগদ্যোতনারই আনুষঙ্গিক সূক্ষ্মতর মন্থননির্যাস। এখানে রসসমুদ্রের সার্বিক বিস্তার নয়। নির্ঝরের চলার ছন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত, অনিয়মিত, অসমপরিমাণ রসবর্ষণ। কাব্যে ও ছোটগল্পে বিসদৃশ উপাদানের রসসমন্বয়ের পর তবে রূপমূর্তিতে প্রকাশ; উপন্যাসে লেখকের জীবনকল্পনার সমস্ত আকস্মিকতা ও অন্তর্বিরোধকে অসমাহিত রাখিয়াই উহার বৈচিত্র্য-উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস। উপন্যাসক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমকে বা পশ্চিমপ্রভাবিত বাঙলাকে অসংস্কৃত রূপেই আবাহন জানাইয়াছেন। এখানেই তাঁহার সঙ্গে ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যের যোগসূত্র। তিনি নীলকণ্ঠ হইয়াও যে বিক্ষেপ-বিষকে সম্পূর্ণভাবে অমৃতে রূপান্তরিত করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যে সেই বিক্ষেপ-মাদকতা, সেই বৈচিত্র্য-উপভোগের ব্যাধি রস-শোধনের সমস্ত দায়িত্ব এড়াইয়া বাংলা কথাসাহিত্যের সর্বদেহেমনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ভাবুকতাময় রচনা ও সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের মনন ও দূরগামী ভাবকল্পনা তাঁহার সমন্বয়শীল মনের পরিচয় বহন করে। প্রাচ্য ও ইউরোপীয় উভয়রূপ দৃষ্টিভঙ্গী ও রসচেতনার সার্থক মিলনের ফলেই এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হইয়াছে।

৫

অতি-সাম্প্রতিক যুগে এই অনুশীলনজাত সমন্বয় আবার বিধ্বস্ত হইয়াছে। এখন সর্ববিধ বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে স্বদেশীয় ভাবভূমিচ্যুত ও ঐতিহ্যসংস্কারভ্রষ্ট হইয়া

আন্তর্জাতিকতার মনোভূমি হইতে রস-আকর্ষণের কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী। স্বাদেশিকতার শ্যামল ভূমি ছাড়িয়া এখন আমাদের সাহিত্যিকেরা আন্তর্জাতিক মহাকাশে পক্ষ-বিস্তারকামী। বিভিন্ন দেশের মানুষে আর বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যসংস্কারে আর কোন বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইতেছে না। সাহিত্য-সৃষ্টিতে জাতীয়তার সুর এখন অনুদার সঙ্কীর্ণতার লক্ষণরূপে নিন্দিত। সার্বজনীন ভাবপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিলেই এখন সাহিত্যিক অমরতার কূলে পৌঁছান সুনিশ্চিত। বিশ্বমানবিকতা যে বিভিন্নজাতীয় মানবিকতার সম্পূর্ণ উন্মূলনে নয়, উহার রসানুকূল সংশ্লেষে এই সত্য যেন বর্তমানে অস্বীকৃত। সমস্ত বর্ণবৈচিত্র্য মুছিয়া ফেলার দ্বারাই যে শাশ্বত সার্বভৌম সাহিত্য সৃষ্ট হইবে না, পরন্তু প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সূক্ষ্মতর অভিব্যঞ্জনার সাহায্যে এক নিগূঢ় সার্বভৌমতাবোধ উদ্দীপ্ত করাই যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কাজ এ বোধ আমাদের মনে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আকাশের নিঃসীম, উদার বিস্তার আপাততঃ খুব আকর্ষণীয় মনে হয়; কিন্তু উহার অপর নাম শূন্যতা; সেখানে হয়ত মানবচিত্তের উপযোগী রসবস্তু উৎপন্ন করা যায় না। রসবস্তু সৃষ্টি করিতে হইলে বিচিত্রসম্পৎশালিনী, বিশেষজীবনছন্দসমন্বিতা একটি ভৌগোলিক ও মানবিক সীমার মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। বিশেষের মধ্যেই নির্বিশেষকে আবিষ্কার করিতে হইবে—বিশেষবর্জনে যে নির্বিশেষত্ব তাহা দার্শনিক ভাবকুহক, স্বাদযোগ্য সৌন্দর্যসত্তা নয়।

আধুনিক বাংলাসাহিত্য

বিশেষতঃ সাহিত্যসৃষ্টির ভাষাই এই বায়ুভূত সার্বজনীনতার পরিপন্থী। প্রত্যেক ভাষা এক একটি দেশের বিশেষজীবনরসপুষ্ট, সাহিত্যস্মৃতি লালিত যুগযুগান্তরের অনুশীলনজাত ভাবাবহ ও ভাবানুষঙ্গসূত্রে গ্রথিত। সুতরাং সেই ভাষা প্রয়োগ করিতে হইলে একটি দেশের সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিতেই হইবে। আন্তর্জাতিক ভাববস্তুকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিবার প্রস্তুতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক ভাষার প্রয়োজন। নতুবা এক দেশের ভাব অন্য দেশের ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে কিছু না কিছু অনতিক্রম্য ব্যবধান পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবেই। অবশ্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের নিবিড়তা ও জীবনাদর্শের ক্রমবর্ধমান সাম্যের জন্য তাহাদের সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যেও অনেকটা অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি এখন রুশ বা জার্মান সাহিত্যের ইংরাজি অনুবাদ অনেক সূক্ষ্মরুচি পাঠকের মনেই কিছু না কিছু অতৃপ্তি জাগায়। উনবিংশ শতকের ইংরাজি গদ্যশিল্পীদের মধ্যে একমাত্র

আন্তর্জাতিক ভাববস্তু-গ্রহণের উপায়

কার্লাইলই যেমন জার্মান সাহিত্যের দার্শনিক অতীন্দ্রিয়বাদ ও আত্মসন্ধানের অসহ্য অন্তর্বেদনার দিক্ দিয়া ঐ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর প্রায় সমধর্মী ছিলেন, তেমনি প্রকাশের দিক দিয়াও তাঁহাদের রচনারীতির অমসৃণ বাক্যগঠন ও গভীরতম প্রত্যয়ের অনিবার্য উৎক্ষেপজাত, উচ্ছ্বসিত অতিকথনের দ্বারা মুহুর্মুহু-বিচলিত ভাষণভঙ্গীরও প্রায় নিখুঁত অনুবর্তন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ জার্মান আত্মার গূঢ়সঞ্চারী, বিসর্পিত গতিরেখা তাঁহার প্রকাশবৈশিষ্ট্যের মধ্যেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইহাতে ভাবের সহিত ভাষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি প্রমাণিত হয়। সুতরাং বাংলাভাষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কবিগোষ্ঠীর বিশেষত্ব ফুটাইতে হইলে মূল কবিদের ভাষার অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে এইরূপ চেষ্টা অনেকটা ব্যর্থ অনুকরণে পর্যবসিত হওয়ারই সম্ভাবনা।

কিন্তু আত্মসংবিৎহীন, নিজ ঐতিহ্যভূমিবিচ্ছিন্ন সাহিত্যিকের পক্ষে বৈদেশিক প্রভাব আত্মসাৎ করিয়া উহাকে নূতন শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করাও সহজসাধ্য নয়। আত্মার গভীরই অপর আত্মার গভীরকে আকর্ষণ করিতে পারে, এই সত্য মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে উদাহৃত হইয়াছে।

সাম্প্রতিক বৈদেশিক প্রভাব-গ্রহণের অন্তরায়

সাম্প্রতিক যুগে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিদেশীয়-প্রভাব-স্বীকরণ ফলের দিক দিয়া শুভ হইতেছে না। ইংরাজি সংস্কৃতির সহিত প্রথম পরিচয়ের যুগে আমাদের ভারসাম্য যে কারণে বিচলিত হইয়াছিল, সাম্প্রত সাহিত্যে ঠিক তাহার বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে। সেকালে আমাদের রক্ষণশীলতাই আমাদের নূতন ভাবধারা গ্রহণের পক্ষে অন্তরায় ছিল; একালে আমাদের স্থির প্রত্যয়ের আত্যন্তিক অভাব ও বিদেশ হইতে আহরণের অতিলোলুপতাই সেই বাধা ঘটাইতেছে। একদালে মাইকেলের কল্পনা ও ছন্দ-স্বাধীনতা ও বঙ্কিমের নারীপ্রেমের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা যেমন আমাদের গোঁড়া মনোবৃত্তিকে বিমুখ করিয়াছিল, একালে তেমনি আমাদের গ্রহণশীলতার নির্বিকার আতিশয্যই সেই একইপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। মাইকেলের রাক্ষসকুলের প্রতি সহানুভূতি ও রামলক্ষ্মণের প্রতি আপেক্ষিক শ্রদ্ধাহীনতা আমাদের ধর্মাসক্ত মনে যে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া উদ্রেক করিয়া তাঁহার প্রতিভার রসাস্বাদনের প্রতি আমাদিগকে অক্ষম করিয়াছিল বা বঙ্কিমের দেবমন্দিরে প্রণয়োন্মেষের কাহিনী, সূর্যমুখীর পতিগৃহত্যাগ ও ভ্রমরের দুরন্ত অভিমান আমাদের লোকাচারপুষ্ট ঔচিত্যবোধের প্রতি যে নিদারুণ আঘাত হানিয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রশংসনীয় জীবননিষ্ঠার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত করিয়াছিল তাহা অতীত সমালোচনা-বিভ্রান্তির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সেখানে প্রাচীন সংস্কারের প্রতি

অন্ধ আনুগত্য আমাদের আধুনিককে অভিনন্দন জানাইবার সহজ শক্তিকে ব্যাহত করিয়াছে। বর্তমানে ইহার ঠিক বিপরীত চিত্র। অতি-আধুনিক যুগের আবিল ভাবপ্লাবন আমাদের রুচিপ্রত্যয়ের সমস্ত দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই প্লাবনকে আত্মসাৎ করা দূরের কথা, উহার তোড়ে আমাদের সুস্থ জীবনবোধ ও শিল্পসুষমা বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে। আধুনিক কাব্য যেন বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের দৃশ্য মনে জাগাইয়া দেয়। ইহাতে কত সাহিত্যের কত ভাঙা-চোরা খণ্ড, কত জ্ঞানভাণ্ডারের কত বিচ্ছিন্ন টুকরা, কত স্মৃতিসঞ্চয় হইতে ভাসিয়া-আসা সংগীতের রেশ ও কল্পনার অসংলগ্ন পুচ্ছাংশ, কত অনির্দেশ্য স্বপ্ন ও অবচেতন মনের উদ্‌গার এক অস্বাভাবিক সমাবেশে স্তূপীকৃত হইয়া প্রকৃতি-বিপর্যয়ের উদ্বেগজনক সাক্ষ্য দিতেছে। উপন্যাস-ছোটগল্পে যে মানুষের সন্ধান মিলে, তাহারা দেশকাল ও পরিবেশের সহিত নিঃসম্পর্ক মানবিক সত্তার এক প্রতীকী ছায়া, তাহাদের চিন্তা ও আচরণের পিছনে কোন সমগ্র সংস্কৃতির ও জীবনদর্শনের বিশ্বাসজনক অভিজ্ঞানচিহ্ন নাই, তাহাদের ক্ষণিক খেয়ালের বুদ্‌বুদ কোন অভ্যস্ত মানস ক্রিয়ার স্থির প্রভাব নির্দেশ করে না। প্রায়ই গোটা মানুষের বদলে তাহার একটা মানস খণ্ডাংশ, তাহার কোন গূঢ়সঞ্চারী, একক বৃত্তি তাহার এক অকারণ, অমূল কল্পনাবিভ্রম তাহার বায়বা সত্তার পরোক্ষ ইঙ্গিতরূপে উঁকি মারিয়া আমাদিগকে ধাঁধায় ফেলে। এই সূক্ষ্ম ভাবদ্যোতনা সময় সময় অসাধারণ শিল্পোৎকর্ষের চিহ্ন বহন করে, কিন্তু কোন স্থির জীবনবোধের সহিত অসংশ্লিষ্ট বলিয়া সংশয় লাগে যে সন্ধ্যারাগরক্ত আকাশ-পটে বর্ণোচ্ছ্বাসের ন্যায় এই সৌন্দর্যমরীচিকা অচিরে আমাদের মানসপট হইতে বিলুপ্ত হইবে। এই অভিমত নিশ্চয় সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের যথার্থ পরিচয় নয়, কিন্তু ইহার প্রেরণায় ও সৌন্দর্যসৃষ্টিতে যে ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ প্রকটতর হইতেছে, যে কেন্দ্রহীন কল্পনাবিকাশের খদ্যোতদীপ্তি উদ্‌ভ্রান্তি জাগাইতেছে সেই মৌলিক দুর্বলতারই ইহা কারণ-নির্দেশ-প্রয়াস। বিশ্বের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া, এই ভিক্ষালব্ধ ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে চোখে ধাঁধা লাগাইয়া যে আমরা মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির পথে চলিয়াছি তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। সেই দিক্ দিয়া আধুনিক সাহিত্যে বিদেশীয় প্রভাব, যদিও ইহার মধ্যে নানা নূতন সম্ভাবনার বীজ ভবিষ্যৎ উন্মেষের প্রতীক্ষা করিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ মহাকবির হাতে নূতন সৌন্দর্যসংশ্লেষের উপাদান যোগাইতে পারে, তথাপি আপাততঃ আমাদের অবিমিশ্র অভিনন্দনের অধিকারী হয় নাই এই সিদ্ধান্তে পৌছানই অনিবার্য মনে হইতেছে।

আধুনিক সাহিত্যের স্বভাব

আদর্শ প্রশ্নাবলী (প্রথম খণ্ড)

প্রথম অধ্যায়

১। বাংলা ভাষায় আর্যপূর্ব তথা অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষাগত উপাদান কী পরিমাণ আছে তাহা উদাহরণসহ আলোচনা কর।

২। বাংলা ভাষা কোন্ ভাষা হইতে সরাসরি উদ্ভূত? সে ভাষার প্রধান লক্ষণগুলি কী? উদাহরণসহ বিবৃত কর। (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬)

৩। প্রাচীন বাংলাভাষার লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৪। মধ্যযুগের (১৩৫০—১৮০০) বাংলাভাষার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। প্রাচীন বাংলাভাষার নিদর্শন কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তাহার বিবরণ দাও। প্রাচীন বাংলার লক্ষণই বা কী কী তাহা যতদূর জান লিখ।

(ক. বি., ১৯৬৫)

৬ বাংলাভাষার আদিযুগের ইতিহাস রচনা করিবার জন্য কোন্ কোন্ উপাদান গ্রহণ করা যাইতে পারে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশে রচিত প্রকীর্ণ কবিতা হইতে কী কী উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে? এই সকল উপাদানের সহিত বাংলা সাহিত্যের যোগ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

(ক. বি., এম.,এ. ১৯৫৪)

২। প্রাচীন ভারতীয় (সংস্কৃত ও প্রাকৃত) সাহিত্যের বিচিত্র ধারা সংকুচিত হইয়া বাংলা দেশে শুধু যে ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যরচনাই প্রাধান্য লাভ করিল ইহার কারণ কী? এই ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সহিত কতটা যোগ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার হেতু নির্দেশপূর্বক আলোচনা কর।

(ক. বি., এম,এ., ১৯৫৫)

৩। বাংলা দেশে রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কী কী উপাদান সংগ্রহ করা যায় সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কর। (ক. বি., এম. এ, ১৯৬৩)

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর টীকা লিখ—সদুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়, রামচরিত, জয়দেব, গাথাসপ্তশতী, প্রাকৃতপৈঙ্গল।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়

১। ছন্দ, ভাষা ও কাব্যরীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার নিজস্বরূপ বৌদ্ধগান ও দোহার মধ্য দিয়া কতখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যুক্তি ও উদাহরণ সহিত বিশদ ভাবে আলোচনা কর। (ক. বি., এম. এ., ১৯৫৮)

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের স্থান নির্ণয় কর।

৩। বাংলা পদাবলী-সাহিত্যে বিদ্যাপতির প্রভাবের উদাহরণসহ বিবরণ দাও। (ক. বি. ১৯৫৭, ১৯৬১)

৪। কেউ কেউ মনে করেন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের যা কিছু মূল্য সবই ভাষাতত্ত্বগত, তার সাহিত্যিক মূল্য প্রায় নগণ্য। কিন্তু অন্য মতে, সাহিত্যিক মূল্যের বিচারে এই কাব্য বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ'—এ বিষয়ে তোমার নিজের মত প্রতিষ্ঠিত কর। (উত্তরবঙ্গ, এম.এ., ১৯৬৬)

৫। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যরচনার আনুমানিক কালের বিচার করিয়া কবি ও তাঁহার কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (ক. বি., ১৯৬.)

৬। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বলিতে কী বোঝ? এ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনার সংক্ষেপে পরিচয় দাও। (ক. বি., অনার্স, ১৯৬৬)

৭। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—এই তিন কবির রচনার তুলনা করিয়া সংক্ষেপে প্রবন্ধ লেখ। (ক. বি., অনার্স, ১৯৬৬)

৮। বাংলা কাব্যসাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থান কোথায় তাহা নিরূপণ কর। (ক. বি., ১৯৬৫)

৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে গেলে কোন্ সময়কে প্রাথমিক বলিয়া চিহ্নিত করা যায়? এই প্রাথমিক যুগের সাহিত্যের পরিচয় দাও এবং উহার সাহিত্যিক মূল্য কতখানি সে বিষয়ে আলোচনা কর। (ক. বি., এম.এ ১৯৫৬)

পঞ্চম অধ্যায়

১। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাল বিষয়ে আলোচনা কর। ইহার কাব্য প্রকাশিত হইবার পর অনেককাল ধরিয়া অন্য কোনো চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয় নাই কেন? (ক. বি., ১৯৫৭)

২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে? তাহার কাব্যের সাধারণ পরিচয় দাও। (ক. বি., ১৯৫৯)

৩। ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিযুগের বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে যে কোনও একজনের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৫৯)

৪। তোমার মতে মনসামঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কাহাকে বলা যাইতে পারে? তাঁহার রচনাকাল ও কাব্যবৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(ক. বি. ১৯৬০)

৫। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠকবি সম্বন্ধে তোমার অভিমত লিপিবদ্ধ কর। (ক. বি. ১৯৬৪)

৬। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া মনসামঙ্গলে সেই লক্ষণের দৃষ্টান্ত দাও। (ক. বি. ১৯৬৩)

৭। ধর্মমঙ্গলরচয়িতাদের মধ্যে কোন একজনের জীবনকথা আলোচনা কর। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সহিত তুলনায় ধর্মমঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

(ক. বি. ১৯৬৫)

৮। মনসামঙ্গল কাব্যধারার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর এবং ঐ কাব্যধারায় সমাজজীবনের যে সাধারণ চিত্র পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(ক. বি. অনার্স ১৯ ৩)

৯। মনসামঙ্গল কাব্যধারার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বিবৃত কর এবং এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দাও। (ক. বি অনার্স ১৯ ৫)

১০ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট এক রীতির আখ্যানকাব্যকে মঙ্গল এবং পাঁচালী বলা হইত কেন? এই প্রসঙ্গে এ রীতির কাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

(ক. বি. অনার্স ১৯৬৬)

•১১। 'মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর অন্তরালেই যেন লৌকিক দেবদেবীপূজা প্রবর্তনের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।'—মনসামঙ্গলকাব্যের কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া উক্তিটি বিচার কর। (উত্তরবঙ্গ অনার্স ১৯৬৬)

১২। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে শিবায়ন অন্নদামঙ্গল দুর্গামঙ্গল ও কালিকামঙ্গল জাতীয় যে নূতন ধরণের মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মধ্যযুগ প্রারম্ভের আদি মঙ্গলকাব্যের ধারা ও আদর্শ কতটা অনুসৃত হইয়াছে তাহা আলোচনা কর। এই নবতর বিকাশগুলিকে খাঁটি মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করা কতদূর সংগত সে বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর। (ক. বি. এ ১৯৫৪)

১৩। বিভিন্ন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কোনটির কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা তাহা বিচার কর এবং ইহাদের মধ্যে কোন্ জাতীয় মঙ্গলকাব্য আধুনিক রুচির বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে সে বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত কর।

(ক. বি. এম. এ ১৯৫৫)

১৪। টীকা লিখ—

ঘনরাম চক্রবর্তী, ময়ূর ভট্ট, হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। মধ্যযুগের বঙ্গ সাহিত্যে অনুবাদের স্থান কতখানি সে বিষয়ে আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৫৮)

২। কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যের কাব্যোৎকর্ষ ও মৌলিক ভাবধারার আলোচনা কর। তাঁহার আত্মজীবনীতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কী তথ্য জানা যায় তাহা বিবৃত কর। (ক. বি. ১৯৬০)

৩। মহাভারত-পাঁচালী রচনার পূর্ব ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বাংলা ভাষার ইহার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি ও তাঁহার কাব্যের পরিচয় দাও।

(ক. বি. ১৯৬১)

৪। মধ্যযুগে বাংলা অনুবাদসাহিত্যের বিশদ পরিচয় দাও এবং ওই সাহিত্যের কোনো সাধারণ লক্ষণ ও বিশিষ্টতা আছে কিনা আলোচনা কর।

(উত্তরবঙ্গ এম. এ ১৯৬৬)

৫। প্রাচীন রামায়ণ কাব্য মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে কিরূপে ধর্মগ্রন্থে পরিণত হইয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও। এই রূপান্তর বাংলা দেশের রামায়ণ সম্বন্ধে কতটা কার্যকরী হইয়াছিল তাহা আলোচনা কর।

(ক. বি. এম. এ ১৯৫৩)

৬। টীকা লিখ—

কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস।

সপ্তম অধ্যায়

১। শ্রীচৈতন্যের জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত? সপক্ষে ও বিপক্ষে উদাহরণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তোমার নিজের মত প্রতিষ্ঠিত কর। (ক. বি. ১৯৫৭)

২। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দাও—

(ক) কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? (খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি? (গ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতের দোষগুণ আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৫৮)

৩। বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্য রচনা করিয়া 'আদিযুগে যে চারিজন কবি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন. তাঁহাদের রচনাগুলির কালক্রমের নির্দেশ দিয়া এগুলির মধ্যে যেখানি সর্বশ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে সেখানির আলোচনা কর।

৪। শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও এবং বাংলা ভাষায় তাঁহার প্রথম জীবনীকাব্যের পরিচয় দাও। (ক. বি. ১৯৬১)

৫। বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই তিনজন চৈতন্য-চরিতকারকে মুখ্যত অবলম্বন করিয়া চৈতন্যচরিত কাব্যধারার পরিচয় দাও।

(ক. বি, ১৯৬৩)

৬। বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনীর মধ্যে জীবনকাহিনীর বাস্তব বর্ণনা, অলৌকিক ঘটনা ও দার্শনিক তত্ত্বের কিরূপ সমাবেশ হইয়াছে তাহা দেখাও।

(ক. বি, ১৯৬৫)

৭। বৈষ্ণব যুগের তথাকথিত 'জীবনীসাহিত্যে'র পরিচয় দাও। এই জাতীয় রচনাসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা নির্দেশ কর। আধুনিক যুগের জীবনীসাহিত্যের সহিত উহাদের মূল পার্থক্য কোথায়? এই সাহিত্য বাংলা দেশে কতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বা করে নাই, হেতু নির্দেশপূর্বক তাহা নির্ণয় কর। (ক. বি. এম. এ, ১৯৫৩)

৮। ভাগবতের (কৃষ্ণমঙ্গল) অনুবাদ-সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থকর্তার ও গ্রন্থের একটি সাধারণ পরিচয় প্রদান কর এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই শাখা অন্যান্য শাখা অপেক্ষা স্বল্প-প্রচলিত বা জনপ্রিয়তায় ন্যূন হইয়া থাকিলে তাহার হেতু নির্দেশ কর। (ক. বি, এম. এ, ১৯৫৪)

৯। টীকা লিখ—

মালাধর বসু, গোবিন্দদাসের কড়চা, চৈতন্যভাগবত, লোচনদাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

অষ্টম অধ্যায়

১। চৈতন্যোত্তর যুগের তিনজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবির কবিকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৬৩)

২। বৈষ্ণব পদাবলীর অসামান্য মহিমা নির্দেশ করিয়া সর্বাধিক প্রসিদ্ধ দুইজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী পদকর্তার বৈশিষ্ট্যের কথা সংক্ষেপে নির্দেশ কর। (ক. বি, ১৯৬২)

৩। বৈষ্ণব কবিদের রচনায় গৌরচন্দ্রিকার তাৎপর্য কী? তাঁহাদের রচিত গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর। (ক. বি, ১৯৬৩)

৪। রূপ ও রসের দিক দিয়া প্রাক্‌চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা কর। (উত্তরবঙ্গ ১৯৬৬)

৫। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পদাবলীসাহিত্যের রূপ ও ভাবের পরিণতি দেখাইয়া একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর। (ক. বি. এম. এ, ১৯৬৫)

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলীর যে একটি বিভিন্ন যুগে প্রসারিত মূল্য ছিল তাহার বিচার কর। (ক. বি. এম. এ, ১৯৬৪)

৭। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিগণ ও তাঁহাদের রচিত বৈষ্ণব কবিতার পরিচয় দাও। চৈতন্যপরবর্তী কবিগণের ভাবদৃষ্টির সহিত চৈতন্য-সমসাময়িক কবিগণের ভাবদৃষ্টির কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কিনা এ বিষয়ে আলোচনা কর। (ক. বি. এম, এ, ১৯৬৩)

নবম দশম ও একাদশ অধ্যায়

১। শাক্ত পদাবলীর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিগীতিকার কে, তাহার প্রসিদ্ধি ও রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (ক. বি. ১৯৬২)

২। বাংলা চর্যাপদ ও নাথসাহিত্যের রচনাকাল ও কাব্যধর্মের তুলনামূলক আলোচনা সহকারে ইহাদের মধ্যে কোনও যোগসূত্র ও ইহাদের সাধনায় বৈশিষ্ট্য কিছু থাকিলে তাহা প্রদর্শন কর। (ক. বি. এম. এ, ১৯৬১)

৩। লোকসাহিত্যের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় কর। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বপর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত কী কী লোক সাহিত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য কতখানি তাহা বিচার কর। (ক. বি. এম. এ, ১৯৬৩)

৪। টীকা লিখ:—

গোরক্ষবিজয়, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান,

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। "শুধু আরাকানের নয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল।" আলাওলের রচনাবলী আলোচনা করিয়া এই উক্তির সার্থকতা নির্ণয় কর। (ক. বি. ১৯৬০)

২। আলাওলের জীবৎকাল নির্ধারণ করিয়া তাঁহার জীবনী ও রচনাবলীর কথা সংক্ষেপে লিখ। (ক. বি. ১৯৬২)

৩। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর। (ক. বি. ১৯২৪)

৪। সপ্তদশ শতকের রোসাঙ অঞ্চলে ইসলামী বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহার ইতিহাস বিবৃত কর। (উত্তরবঙ্গ ১৯৬৬)

৫। আরাকান ও চট্টগ্রামের কবিগণের রচনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও মূল্য নির্দেশ কর। (ক. বি. এম. এ. ১৯৫৪)

৬। টীকা লিখ—

দৌলত কাজী, সতী ময়না, আলাওল, ময়মনসিংহ গীতিকা।

চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়

১। মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের স্থান নির্ণয় কর।

(ক. বি. ১৯৬১)

২। ভারতচন্দ্রের রচনাতে আধুনিক যুগসুলভ অনেকগুলি লক্ষণের পূর্বাভাস দেখা যায়, কিন্তু রামপ্রসাদের রচনাতে এমন কতকগুলি আধুনিক লক্ষণ সূচিত হয় যা ভারতচন্দ্রের রচনাতেও নেই।" এই মন্তব্যের সত্যতা বিচার কর।

(উত্তরবঙ্গ এম. এ, ১৯৬৬)

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন সাহিত্য-ধারায় যে সকল আধুনিকতার প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল তাহার উদাহরণ দাও।

৪। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় কর এবং বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনারীতি ও ভাবাদর্শ কী পরিমাণে পাশ্চাত্য রূপ-ভঙ্গিমা ও চিন্তা গ্রহণ করিয়াছে তাহার পর্যালোচনা কর।

৫। টীকা লিখ—

বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, মহারাষ্ট্র পুরাণ।

কাব্য-সঞ্চয়ন

[আদি-মধ্যযুগ]

চর্যাগীতি

(১)

রাগ—পটমঞ্জরী

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস
জো মনগোঅর সো উআস ॥ ধ্রু ॥
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না ॥ ধ্রু ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই
ভণই কাহ্নু মো-হিঅহি ণ পইসই ॥ [৭ নং পদ

সরলানুবাদ

আলি-কালিতে বাট রুদ্ধ করিল,
তা দেখিয়া কাহ্নু মন মরা হইল।
কাহ্নু কোথায় গিয়া নিবাস করিবে
যে মনগোচর সে উদাস।
সে তিন, সে তিন, তিন অভিন্ন অথবা তিনই ভিন্ন।
কাহ্নু ভণে—ভব বিনষ্ট।
যেমন যেমন আসিল তেমন তেমন গেল,
আনাগোনায় কাহ্নু মন-মরা হইল।
এই সে, কাহ্নি, নিকটে জিনপুরে বসে।
ভণে কাহ্নু—আমার হৃদয়ে পশে না ॥

[ডঃ সুকুমার সেন কৃত

(২)

রাগ—দেশাখ

নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছোই ছোই যাই সো বাহ্ম নাড়িআ ॥ ধ্রু ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম কারব ম সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
এক সো পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥ ধ্রু ॥
হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে
আইসসি জাসি ডোম্বী কাহরি নাবেঁ ॥ ধ্রু ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর ন চাঙ্গেড়া
তোহোরি অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া ॥ ধ্রু ॥
তু লো ডোম্বী হাউ কপালী
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়েরি মালী ॥ ধ্রু ॥
সরবর ভঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥ ধ্রু ॥ [১০ নং পদ

সরলানুবাদ

নগর বাহিরে, ওরে ডোমনী তোর কুঁড়ে
তোকে ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায় সেই বিজ্ঞ বামুন।
ওলো ডোমনী, তোর সঙ্গে আমার সাঙ্গা করিতে হইবে,
(আমি) কাহ্ন নাঙ্গা কাবাড়ি যোগী।
এক সে পদ্ম, চৌষট্টি পাপড়ি
তাহাতে চড়িয়া নাচে ডোমনী (ও) বেচারি (কাহ্ন)।
ওলো ডোমনী, তোকে আমি সদভাবে জিজ্ঞাসা করি—
আসিস যাস তুই কাহার নায়ে ?
তাঁত বেচা হয় ডোমনী আর তো চাঙ্গারি
তোর তরে আমি ছাড়িলাম নটসজ্জা।

তুই লো ডোমনী, আমি কাবাড়ি,
তোর তরে আমি লইলাম হাড়ের মালা।
সরোবর ভাঁজিয়া ডোম্বিনী খাও (অথবা খায়) মৃণাল।
মারি আমি ডোম্বিনীকে (অথবা ডোম্বিনী তোকে). লই তোর প্রাণ ॥

[ডঃ সুকুমার সেন কৃত

(৩)

রাগ—কামোদ

তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকমারী
নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেরী ॥ ধ্রু ॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা
মঝ বেণী তরঙ্গ ম মুনিআ ॥ ধ্রু ॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল। ধ্রু ॥
গন্ধ পরস রস জইসোঁ তইসোঁ
নিন্দ বিহুনে সুইণা জইসো ॥ ধ্রু ॥
চিঅ কন্নহার সুণত মাঙ্গে
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

[১৩ নং পদ

সরলানুবাদ

ত্রিশরণ করা হইল আট কামরা নৌকা,
নিজ দেহ (হইল) করুণা, শূন্য মেয়ে-মহল।
তরণ করা গেল সংসার-সাগর যেমন মায়ায় স্বপ্নে।
মাঝ-নৌকায় তরঙ্গ আমি টের পাইলাম।
পঞ্চ তথাগত কেরোয়াল করা হইল।
বেচারা কাহ্ন, কায় (নৌকা) বাহিতেছে মায়াজাল (মধ্যে)।
গন্ধ-স্পর্শ-রস যেমন তেমনই
নিদ্রা বিনে স্বপ্ন যেমন।
চিত্ত কাণ্ডারী (বসিয়া) শূন্যতা-মাঝে।
চলিল কাহ্ন মহাসুখের সাঙ্গায় ॥

[ডঃ সুকুমার সেন কৃত

(৪)

রাগ—বলাড্ডি

উচা উচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥ ধ্রু ॥
উমতো সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী ॥ ধ্রু ॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল-বজ্রধারী ॥ ধ্রু ॥
তিঅ-ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী ॥ ধ্রু ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥ ধ্রু ॥
গুরুবাক্ পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ
একে শরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥ ধ্রু ॥

[২৮ নং পদ

সরলানুবাদ

উচু উচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা।
ময়ুরপুচ্ছ-পরিহিত শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা।
উন্মত্ত শবর পাগল শবর, গোল করিও না—দোহাই তোমার।
(তোমার) আপন গৃহিণী (ও), নামে সহজ সুন্দরী।
নানা তরুবর মুকুলিত হইল রে, গগনেতে ডাল ঠেকিল।
একেলা শবরী এ বন ঢুঁড়ে—কানে কুণ্ডল, কণ্ঠে বজ্র।
ত্রিধাতুর খাট পড়িল, শবর মহাসুখের শয্যা পাতিল।
শবর নাগর, নৈরামণি নাগরী, প্রেমে রাতি পোহাইল।
হৃদয় তাম্বুল মহাসুখ কর্পূর খাওয়া হইল,
শূন্য নিরামণিকে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মহাসুখে রাতি পোহাইল।

গুরু বাক্য-পুচ্ছ (বাণের)। নিজমন বাণে বিদ্ধ কর,
এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর।
অতি রোষে শবর উন্মত্ত।
গিরিবর-শিখর মাটিতে প্রবেশ করিলে শবরকে খোঁজা যাইবে কিসে॥

(৫)

রাগ—পটমঞ্জরী

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥ ধ্রু ॥
বেঙ্গ সংসার বড়্হিল জাঅ
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ ॥ ধ্রু ॥
বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥ ধ্রু ॥
জো সো বুধী সোই নিবুধী
জো সো চোর সোই সাধী ॥ ধ্রু ॥
নিতি নিতি ষিআলা ষিহেঁ ষম জুঝঅ
ঢেণ্টণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ ॥ [৩৩ নং পাঠ

সরলানুবাদ

টোলায় মোর ঘর, নাই পড়শী,
হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্য রাতের অতিথি।
বেগে সংসার বহিয়া যায়,
দোহা দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে ?
বলদ প্রসব করিল, গাই (রহিল) বন্ধ্যা,
পাত্র দোহা হয় এ তিন সন্ধ্যা।
যে সেই বুদ্ধি সে ধন্য বুদ্ধি,
যে সেই চোর সেই কোটাল।
নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের সনে যুঝে
ঢেণ্ঢনপাদের গীত কম লোকে বুঝে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

(১)

কেদার রাগঃ ॥ রূপকং ॥

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হঁআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
বন পোড়ে আগ বড়াই জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[বংশীখণ্ড

[বাএ = বাজায়। নই = নদী। আউলাইলোঁ—বিপর্যস্ত করিলাম। বেআকুল = ব্যাকুল। কৈলোঁ = করিলাম। আহ্মার = আমার। সুসর = সুস্বর। নহোঁ = নহি। কুম্ভারের পণী—কুম্ভকারের পোয়ান। যেহ্ন = যেন।]

(২)

ললিত রাগঃ ॥ একতালী ॥

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ।
বড়ায়ি না মানিলোঁ লঘুগুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি গো ॥ কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোএঁ নারী বড় অভাগিনী ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোএঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ২ ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞি'র সঙ্গে আছে ॥ ৩ ॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি মোকে নেহ কাহ্নাঞি'র পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[রাধাবিরহ

[আন=অন্য। মনে পড়িহাসে=মনে হয়। বুলী=বলিয়া। পো=পুত্র। নেহা=স্নেহ, প্রেম। গুপতে=গোপনে। বিকাসিলোঁ=প্রকাশ করিলাম। গোআল= গোপ। ননন্দ=ননদ। প্রতি বোল বাছে=প্রতি কথায় দোষ ধরে।]

(৩)

ললিত রাগঃ ॥ একতালী ॥

ময়ূর-পুছে বান্ধি চূড়া কেশ পাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা
যেন উয়ে গগনে চান্দগোটা ॥ ১ ॥

দূতা ল

তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জাঁয়িতে। আ।·
এ বাটে জায়িতেঁ গায়িতেঁ নান্দের পোঅ
হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলায়িতেঁ ॥ ধ্রু ॥
নির্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে
রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে।
মাণিক দশন-যুতী গিএ শোভে গজমুতী
জীএ রা'হি তার দরশনে ॥ ২ ॥
চন্দন চর্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ
হেন বেশ হেন দরশনে।
নেত পরিধান লাসী হাতে মৌহারী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে ॥ ৩ ॥
মোঞঁ ত অভাগিনী রাহী তেঁসি হারায়িলোঁ কাহ্নাঞিঁ
এবেঁ তাক চাহি বন-দেশে।
তথাঁত পাইব সুধী বড়ায়ি তোহ্মার বুধী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[রাধাবিরহ

[কনয়া=স্ববর্ণোজ্জ্বল। উয়ে=উদিত হইতেছে। চান্দগোটা=পূর্ণ চন্দ্র। পোঅ=পুত্র। কন্ন=কর্ণ। জীএ=জীবিত হয়। রাহি=রাধা। দশন-যুতী=দন্তজ্যোতি। ঘাঘর=ঘুঙুর। নেতলাসী=বহুমূল্য বস্ত্র। গেলান্ত=গেলেন। মোঞঁত=আমি তো। তেঁসি=এই কারণে। তোহ্মার বুধী=তোমার বুদ্ধির সাহায্যে। সুধী=সন্ধান।]

(৪)

ধানুষী রাগঃ ॥ একতালী ॥

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ॥

মুছিআঁ পেলাইবোঁ [মো] য়ে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ॥১

দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান।
আপনার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন ॥ ধ্রু ॥

মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনী রূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর ॥

যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে ॥ ২ ॥

কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতিসিধী।
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥

এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার।
আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্ন একবার ॥ ৩ ॥

মাথে শম্ভুসম খোঁপা শিসতে সিন্দুর।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদূর ॥

আনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ পালাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

[রাধাবিরহ

[আসার=অসার। পেলাইবোঁ=ফেলিব। মোএ=আমি। সিসের=সিঁথার। শঙ্খচুর=চূর্ণ। রতিসিধী=রতিসিদ্ধি। এভোহোঁ=এখনও। না মিলিহে=মিলিবে না। দিআর=দাও।]

(৫)

শ্রীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাঁও তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ ॥ ১ ॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাস।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস ॥ ধ্রু ॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ॥
কতনা সহিব রে কুসুমশর জালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা ॥ ২ ॥
ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুটি জায়িবে বুক ॥ ৩ ॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী ॥
তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

[রাধাবিরহ

[কদনে=পীড়নে। বঞ্চিবোঁ=যাপন করিব। সেজাত=শয্যাতে। সুতিআঁ=শুইয়া। একসরী=একাকিনী। নিন্দ=নিদ্রা। কাহ্ন সমে কর মেলা=কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা কর। ফুটি=ফাটিয়া। নিবড়ে=শেষ হয়। বারিষী=বর্ষা। কাশী=কাশফুল।]

বিদ্যাপতির পদাবলী

(১)

রূপবর্ণনা

এ সখি কি পেখল এক অপরূপ
শুনইতে মানবি সপন সরূপ ॥ ১ ॥
কমলযুগল পর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল ॥ ২ ॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরি-লতা।
কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা ॥ ৩ ॥
শাখা শিখর সুধাকর-পাঁতি।
তাহি নবপল্লব অরুণক ভাঁতি ॥ ৪ ॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করু বাস ॥ ৫ ॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তাপর সাপিনী ঝাঁপল মোড় ॥ ৬ ॥
এ সখি রঙ্গিণী কহল নিসান।
পুন হেরইতে হমে হরল পরাণ ॥ ৭ ॥
ভণই বিদ্যাপতি ইহ রস ভণে।
সুপুরুখ মরম তুহুঁ ভল জনে ॥ ৮ ॥

(২)

শ্রীরাধার পূর্বরাগ

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি নতমুখী
কৈসনে হেরব বয়ান ॥
সখি হে, অপরূব চাতুরী গোরী।
সব জন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি ॥

তঁহি পুন মোতি-হার তোড়ি ফেকল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি লেল॥
নয়ন-চকোর কাহ্নু-মুখ-শশিবর
কএল অমিয়-রস পান।
দুহুঁ দুহুঁ দরশনে রসহু পসারল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

(৩)

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ

জব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নবজলধর বিজুরিরেহা
দন্দ পসারিয় গেলি॥ ১॥

ধনী অলপ বয়সি বালা
জনি গাঁথলি পুহপ মালা।
থোরি দরশনে আশ ন পূরল
রহল মদন জ্বালা॥ ২॥

গোরী কলেবর নূনা
জনি কাজরে উজোর সোনা।
কেশরী জিনি মাঝ ক্ষিণ
দুলহ লোচন কোণা॥ ৩

ঈষত হসনি সঞে
মুঝে হানল নয়নবাণে।
চিরে জীব রহু রূপনারায়ণ
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥ ৪

(৪)

অভিসার

নব অনুরাগিণী রাধা
কছু নাহি মানএ বাধা ॥ ১

একলি কয়ল পয়াণ।
পথ বিপথ নাহি মান ॥ ২

তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার ॥ ৩

কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহি তেজল সগরি ॥ ৪

মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূর হি তেজি চলি যায় ॥ ৫

যামিনী ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার ॥ ৬

বিঘিনি বিথারল বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট ॥ ৭

বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐসে ন হেরি আন ॥ ৮

(৫)

রূপানুরাগ

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানিয়ে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ ১ ॥

জনম অবধি হম রূপ নেহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল ॥ ২ ॥

কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
 ন বুঝল কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
 তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥ ৩ ॥

কত বিদগধ জন রস অনুমগন
 অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
 লাখে ন মিলল এক ॥ ৪ ॥*

(৬)

মাথুর

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ই ভরা বাদর মাহ ভাদর
 শূন্য মন্দির মোর ॥ ১ ॥

ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
 ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
 সঘনে খরশর হন্তিয়া ॥ ২ ॥

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
 ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
 ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ ৩ ॥

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
 অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
 হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ ৪ ॥

* পদটি বিদ্যাপতির কিনা, এই বিষয়ে মতান্তর আছে।

(৭)

মাথুর

অংকুর তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ই নব যৌবন বিরহে গমায়ব
কি করব সে পিয়া-নেহে ॥ ১ ॥

হরি হরি কে ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥ ২ ॥

চন্দনতরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ॥ ৩ ॥

শ্রাবণ মাহ যব বিন্দু ন বরিখব
সুরতরু বাঁঝ কি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে ॥ ৪ ॥

(৮)

বিরহ

চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা ॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা ॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কী আর জীবনে ॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে ॥

আন অনুরাগে পিয়া আনদেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

(৯)

বিরহ

সুরতরুতল জব ছায়া ছোড়ল
হিমকর বরিখয় আগি।
দিনকর দিন ফলে সীত ন বারল
হম জীয়ব কথি লাগি॥ ১॥

সজনি অব নহি বুঝিএ বিচার।
ধনকা আরতি ধনপতি ন পুরল
রহল জনম দুখ ভার॥ ২॥

জনম জনম হরগৌরী অরাধলোঁ
সিব ভেল সকতি বিভোর।
কাম ধেনু কত কৌতুকে পূজলোঁ
ন পূরল মনোরথ মোর॥ ৩॥

আসিয়া সরোবরে সাধে সিপায়লোঁ
সংসয় পড়ল পরান।
বিহি বিপরীত কিএ ভেল ঐছন
বিদ্যাপতি পরমান॥ ৪॥

(১০)

বিরহ

অনুখন মাধব মাধব সুমরইতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব সোভাবহি বিসরল
আপন গুণ অনুধাই॥ ১

মাধব অপরূপ তোহর সিনেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর
জীবইতে ভেলি সন্দেহ ॥ ২

ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পাণি।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহি
আধা আধা বাণী ॥ ৩

রাধা সঞো যব পুনতহি মাধব
মাধব সঞো যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥ ৪

দুহু দিস দারু দহনে বৈসে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐসন বল্লভ হেরি সুধামুখী
বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৫

(১১)

ভাব-সম্মিলন

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা ॥ ১ ॥

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টূটল সবহুঁ সন্দেহা ॥ ২ ॥

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বান হোউ
মলয়-পবন বহু মন্দা ॥ ৩ ॥

অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোঅত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নবলেহা ॥ ৪

(১২)

প্রার্থনা

মাধব, বহুত মিনতি কর তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥ ১

গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥ ২

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীটপতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥ ৩

ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ ৪

(১৩)

প্রার্থনা

যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ
মিলিমিলি পরিজন খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই ন পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥ ১
এ হরি বন্দো তুয়া পদনায়।
তুয় পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হোয়ব কওন উপায়॥ ২
যাবত জনম হম তুয়া পদ ন সেবল
যুবতী মতি সঞে মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিয়ল
সম্পদে বিপদ হি ভেলি॥ ৩
ভণই বিদ্যাপতি নেহ মনে গণি
কহলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোন মাগই
হেরইতে তুয়া পায় লাজে॥ ৪

চণ্ডীদাসের পদাবলী

(১)

পূর্বরাগ

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মনপ্রাণ॥ ১
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥ ২

নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥ ৩
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥ ৪

(২)

পূর্ব্বরাগ

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥ ১
রাই কেন বা এমন হৈল।
গুরু দুরজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল ॥ ২
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে ॥ ৩
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা ॥ ৪
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাঢ়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে ॥ ৫

(৩)

অনুরাগ

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি ॥ ১
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥ ২
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥ ৩
ভানু-কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয় ॥ ৪
চাতক-জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥ ৫
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল ॥ ৬
কি ছার চকোর-চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে ॥ ৭

(৪)

অভিসার

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥ ১
সই কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥ ২
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সংকেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু ॥ ৩

বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে ॥ ৪
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিতে জগত সুখী ॥ ৫

(৫)

প্রেমবৈচিত্ত্য

যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে ॥ ১
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥ ২
এ ছার নাসিকা মুই কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥ ৩
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥ ৪
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা যে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥ ৫
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ ॥ ৬

(৬)

আক্ষেপানুরাগ

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে ॥ ১

কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥ ২
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্ব-তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে ॥ ৩
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥ ৪

(৭)

আক্ষেপানুরাগ

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন। ১
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥ ২
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥ ৩
কোন বিধি নিরমিল সোতের শেওঁলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি ॥ ৪
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥ ৫
বাশুলি-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয় ॥ ৬

(৮)

রসোদগার-নিবেদন

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ ১
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ ২
ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥ ৩
একুলে ওকুলে তুকুলে গোকুলে
আপন বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও তুটি কমল-পায় ॥ ৪
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতিক নাহিক মোর ॥ ৫
আঁখির নিমিখে যদি নাহি হেরি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশরতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥ ৬

(৯)

রসোদগার

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতয়ে তিতিল দে ॥ ১

সই, এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি কহে ॥ ২
পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ ॥ ৩
কপট পিরীতি আরতি বাঢ়াঞা
মরণ অধিক কাজে।
লোক চর্চায় কুল রাখা দায়
জগত ভরিল লাজে ॥ ৪
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মলুঁ।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেলুঁ ॥ ৫
এ মতি পিরীতি না জানি কী রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম দুখময় হয়
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ৬

(১০)

আক্ষেপানুরাগ

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি কিন্তু হাসি লোক লাজে ॥ ১
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী ॥ ২
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥ ৩
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধরে সুধা উগারে গরল ॥ ৪

যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তার লাগি পাঙ।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাঙ॥ ৫
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥ ৬

গোবিন্দদাসের পদাবলী

(১)

গৌরপদ

চম্পক শোন-কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর তনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগ মনোমোহন ভাঙন রে॥ ১
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন-মণ্ডন কলিযুগ কাল-
ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে॥ ২
বিপুল পুলককুল-আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥ ৩
নিজরসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত ভকতহি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তঁহি পরশ না ভেলি॥ ৪

(২)

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥ ১
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমলদল খলই॥ ২

দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি ॥ ৩
যাঁহা যাঁহা ভাঙুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল ॥ ৪
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই ॥ ৫
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ পরকাশ ॥ ৬
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান ॥ ৭

(৩)

রাধার অনুরাগ

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ ॥ ১
সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু-অনুরাগে মোর তনুমন মাতল
না শুনে ধরম-লব-লেশ ॥ ২
নাসিকাহো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম ॥ ৩
গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তঁহি এক মনোরথ যদি হয় অনুরত
পুছত গোবিন্দদাস ॥ ৪

(৪)

রাধার অনুরাগ

আধক আধ-আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ ॥ ১
সজনি জানলু বিহি মোহে বাম !
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম ॥ ২
সুনয়নী কহত কানু ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জ্বলু আগি ॥ ৩
প্রেমবতী প্রেম লাগি জিউ তেজত
চপল জীবন মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতী-রস-মরিযাদ ॥ ৪

(৫)

অভিসার

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥ ১
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনীজাগি ॥ ২

কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কন-পণ ফণি-মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু-পাশে ॥ ৩
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধী সম হাস
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ৪

(৬)

অভিসার

কুলমরিয়াদ-কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ-সিন্ধু সঞে পঙারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা ॥ ১
সজনি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙ'র মন ঝুর ॥ ২
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছুপর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেমদহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরকি আগি ॥ ৩
যছু পদতলে নিজ জীবন সোপলু
তাহে তমু অমুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ ॥ ৪

(৭)

মাথুর

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখলব ভৈ গেল নৈরাশা ॥ ১
সখি হে, অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই ॥ ২
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু-পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি-নিরমাণ ॥ ৩
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস-পূর।

জ্ঞানদাসের পদাবলী

(১)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর-পুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা ॥ ১
মল্লিকা মালতী-মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
হেন মনে অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীলগিরি-শিখর বহিয়া ॥ ২

কালার কপালে চান্দ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিলে ফাগু রঙ্গিয়া।
রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিয়াছে
জবা কুসুম তাহে দিয়া ॥ ৩
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যাম-রূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥ ৪

(২)

রূপানুরাগ

আলো মুঞি জানো না—
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে ॥ ১
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ ২
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥ ৩
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা ॥ ৪
কটি পীত-বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোঁড়া ॥ ৫
জাতি কুল শীল মোর সব বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥ ৬
কুলবতী সতী হৈয়া দুকুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥ ৭

(৩)

রূপানুরাগ

মনের মরম কথা তোমারে কহিব এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই ॥ ১
রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি-ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥ ২
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে
ঝিঁজা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সঘনে গাজে
স্বপন দেখিলুঁ হেনকালে ॥ ৩
নয়নে পৈঠল সেহ মরমে লাগল লেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
হেরিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক রহু কুলের কামিনী ॥ ৪
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে পায়ে হাত দিই ছলে
আমা কিনি বিকাইলুঁ বোলে ॥ ৫
ভূষণ ভূষণ অঙ্গ কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥ ৬
রসাবেশে দিই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥ ৭

(৪)

রূপানুরাগ

দেইখ্যা আইলাম তারে সই দেইখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে ॥ ১
বান্ধ্যাচে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥ ২
কালিয়া-বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি-কুল নাহি গেল রাখা ॥ ৩
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব-হেলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥ ৪
গৃহকর্ম করিতে আল্যায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ ॥ ৫

(৫)

রসোদ্গার

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ ২
সই কি আর বলিব।
যে পণ কর্য়াছি মনে সেই সে করিব ॥ ৩
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে ॥ ৪
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ ৫
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতের সার ॥ ৬
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে ॥ ৭

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ ৮
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি ॥ ৯

(৬)

আত্মনিবেদন

শুন শুন হে পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি
আর না দিব ছাড়িয়া ॥ ১
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কেমনে আছিলা তুমি ॥ ২
যে ছিল আমার করমেরি দুখ
সকলি করিলুঁ ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ ॥ ৩
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর ॥ ৪
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ানলোরে ॥

(৭)

আত্মনিবেদন

তোমার গরবে গরবিণী হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে ॥ ১

অন্যের আছয়ে অনেক জন আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করে মানি ॥ ২
শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ গণে জীবন অধিক পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥ ৩
নয়ন-অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ তুমি যে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাস কহে কালার পিরীতি অন্তরে অন্তরে বাঁধা ॥

অন্যান্য বৈষ্ণব কবি

১

গোবিন্দ ঘোষ—নিমাই সন্ন্যাস

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও ॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান-পুতলি নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্তন-বিলাস ॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া ॥

(২)

রাধামোহন—গৌরচন্দ্রিকা

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ ॥

(৩)

যাদবেন্দ্র দাস—গোষ্ঠ

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরানের পরান নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ-ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥
ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায়॥

(৪)

বলরাম দাস—গোষ্ঠ

চান্দ মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লৈয়া
ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণু উর্ধ্বমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণুরব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলল নিজ সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে॥

শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন শ্যাম ॥
ঘন বাজে শিঙা বেণু গগনে গোখুর-রেণু
পথে চলি করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥

(৫)

বলরাম দাস—প্রেমবৈচিত্ত্য

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা সিরজিল বিধি ॥
বসিয়া দিবসরাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি ॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন-সমান ॥
যতনে আনিয়ে যদি ছানিয়ে বিজুরি।
অমিয়ার ছাঁচে যদি গড়য়ে পুতলি ॥
রসের সায়রে যদি করায় সিনান
তবু তো না হয় তোমার নিছনি সমান ॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই যেন সদা করে চিত ॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির ॥

(৬)

রায় শেখর—অভিসার

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পতন শব্দ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই ॥

সর্জন আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি
সংকেত কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থরথর কাঁপ।
মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥

(৭)

জগদানন্দ—শ্রীরাধার রূপ

মঞ্জ বিকচ কুসুমপুঞ্জ
মধুপ-শব্দ গঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জর-গতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুলনারী॥
ঘন-গঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতী-ফুল-মাল রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী
খঞ্জন-গতিহারী॥
কাঞ্চন-রুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী কর কঙ্কণ মৃদু
ঝংকৃত মনোহারী॥

নাচত যুগ ভুরু-ভুজঙ্গ
কালিয়দমন-দমন-রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে
রঙ্গিল নীল শাড়ী ॥
দশন কুন্দ-কুসুম-নিন্দু
বদন জিতল শারদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে
প্রেমসিন্ধু প্যারী ॥
অমরাবতী-যুবতীবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্ধ
মন্দ মন্দ হসনানন্দ
নন্দন-সুখকারী ॥
মণিমাণিক নখে বিরাজ
কনক-নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থল-জলরুহ-
চরণকি বলিহারী ॥

(৮)

বৃন্দাবন দাস—মান

কৈছে চরণে কর পল্লব ঠেললি
মিললি মান-ভুজঙ্গে
কবলে কবলে জীউ জরি যব যায়ব
তবহি দেখব ইহ রঙ্গে ॥
মা গো, কিয়ে ইহ জিদ অপার।
কো অছু বীর বীর মহাবল
পাঙরী উতারব পার ॥
শ্যামর ঝামর মলিন নলিন-মুখ
ঝর ঝর নয়নক নীর।
পীতাম্বর গলে পদহি লোটায়ল
হিয়া কৈছে বান্ধলি থির ॥

সাধি সাধি ছরমি ঘরমি মহা বিকল
ঘন ঘন দীঘ নিশাস।
মনমথ দাহ- দহনে মন ধসি গেও
রোখে চলল নিজ বাস॥
অবিরোধি প্রেম- পন্থ তুহুঁ রোধলি
দোষ-লেশ নাহি নাহ।
বৃন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি
হামারি ওরে নহি চাহ॥

(৯)

যদুনন্দন দাস—মাথুর

ধৈর্যং রহু ধৈর্যং রাই গচ্ছং মথুরাওয়ে।
ঢুঁড়ব পুরী প্রতি প্রতক্ষে
যাঁহা দরশন পাওয়ে॥
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।
অবিলম্বনে মথুরপুর আওল ব্রজরমণা॥
মথুরাবাসিনী এক রমণী
তাকর দূতী পুছে।
নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ খ্যাত
কাহার ভবনে আছে॥
শুনি তার বাণী কহয়ে সো ধনি
সো কাহে ইহ আওয়ব।
দেবকীসুত কৃষ্ণখ্যাত কংসঘাতী মাধব॥
সোই সোই কোই কোই
তারি দরশনে মোর আসা।
যদুনন্দন দাসে কহে ঐ যে উচ্চ বাসা॥

রামায়ণ

(১)

কৃত্তিবাস ওঝা

বিষ্ণুর চারি অংশে প্রকাশ

গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর॥
সেখানে অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু।
যাহা চাই তাহা পাই, নাম কল্পতরু॥
দিবা নিশি তথা চন্দ্রসূর্যের প্রকাশ।
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস॥
নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি।
বীরাসনে আছেন বসিয়া বনমালী॥
মনে মনে প্রভুর হৈল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইব প্রকাশ।
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশ চারি অংশ হৈলা নারায়ণ॥
লক্ষ্মী-মূর্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে।
স্বর্ণছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে॥
ভরত শত্রুঘ্ন তাঁরে ঢুলান চামর।
হনুমান স্তব করে যুড়ি দুই কর॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর।
হেনকালে চলিলা নারদ মুনিবর॥
বীণাযন্ত্র হাতে করি হরিগুণ গান।
উত্তরিলা গিয়া মুনি প্রভু বিদ্যমান॥
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে।
বসন তিতিল তাঁর নয়নের নীরে॥
হেন রূপ ধরিলেন কেন নারায়ণ।
ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পঞ্চানন॥
ভাবী ভূত বর্তমান শিব ভাল জানে।
এ কথা কহিব গিয়া মহেশের স্থানে॥

এতেক ভাবিয়া যাত্রা করে মুনিবর।
উত্তরিলা প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর ॥
বিধাতাকে লয়ে যান কৈলাস শিখরে।
শিবকে বন্দিয়া পরে বন্দিলা দুর্গারে ॥
নিরখিয়া দুইজনে তুষ্ট মহেশ্বর।
জিজ্ঞাসা করেন তবে তাদের গোচর ॥
কহ ব্রহ্মা কহ হে নারদ তপোধন।
দোঁহে আনন্দিত অত্য দেখি কি কারণ ॥
বিরিঞ্চি বলেন শুন দেব ভোলানাথ।
দেখিলাম গোলোকে অপূর্ব জগন্নাথ ॥
দেখিতাম পূর্বেতে কেবল নারায়ণ।
চারি অংশ দেখিলাম কিসের কারণ ॥
ব্রহ্মা বাক্য শুনিয় কহেন কৃত্তিবাস।
সেইরূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ ॥
যেরূপে আছেন হরি গোলোক ভিতর।
জন্ম নিতে আছে ষাটি সহস্র বৎসর ॥
রাবণ রাক্ষস হবে পৃথিবী মণ্ডলে।
তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে ॥
দশরথ ঘরে জন্ম নিবে চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন ॥
এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া;
তিন গর্ভে জন্মিবেন শুভক্ষণ পাইয়া ॥
জানকী সহিত রাম লইয়া লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালনার্থ যাইবেন বন ॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রাবণ।
লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দন ॥
মনুষ্য গো-হত্যা আদি যত পাপ করে।
একবার রাম নামে সর্বপাপ তরে।
মহাপাপী হয়ে যদি রামনাম গায়।
সংসারসমুদ্র তার বৎসপদ হয় ॥

(২)

রঘুনন্দন

নৃসিংহমূর্তি

কিবা চমৎকার রূপ তার অতিঅনুপম।
মুখ সিংহাকার অঙ্গ তার মনুষ্যের সম॥
অতি উচ্চতর কলেবর মহাভয়ঙ্কর।
কোটি নিশাপতি জ্যোতিঃ জিতি কান্তি মনোহর॥
শিরে জটাজাল কালব্যাল জিনিয়া দোলয়।
যেন শম্ভুশিরে শোভাকরে কালসর্পচয়॥
দ্রবী- ভূত স্বর্ণ তুল্য বর্ণ তিনটি লোচন।
যাহা দেখি ভয় মগ্ন হয় এ তিন ভুবন॥
তাহে ভয়ঙ্কর উচ্চতর কুটিল ভ্রূকুটি।
মহা কোপবেগে ঊর্ধ্বভাগে স্থির কর্ণ দুটি॥
কোপ- শ্বাসে চণ্ড নাসা দণ্ড অতি ভয়ঙ্কর।
গিরি গুহাপ্রায় মুখ তার দন্ত ঘোরতর॥
মিলি সে বদন ঘনে ঘন ঘুরায়্যা রসন।
নিজ মুখপ্রান্ত রমাকান্ত চাটেন সঘন॥
স্থূল গ্রীবাদেশে পরকাশে কত শত জটা।
জিনি করিশুণ্ড ভুজদণ্ড সহস্রের ঘটা॥
তাহে নখজাল মহাকাল ত্রিশূল সমান।
স্থূল বক্ষঃদেশ সবিশেষ ক্ষীণ মাঝখান॥
কটি অতিপুরু দুই উরু স্থূল মনোহর।
চর- ণের তল সুকোমল কমল সুন্দর॥
তার চারিপাশে পরকাশে দৈত্য ভয়ঙ্কর।
দিব্য অস্ত্রগণ সুদর্শন আদি মূর্তিধর॥

(৩)

কবিচন্দ্র

অঙ্গদ রায়বার

অঙ্গদে দেখিয়া রাবণ মায়াজাল পাতে।
শত শত রাবণ হঞা বসিল সভাতে॥
যে দিগে অঙ্গদ চায় সেদিগে রাবণ।
দশমুণ্ড কুড়িকর বিংশতি লোচন॥
তা দেখি অঙ্গদ বীর করেন ভাবনা।
রাক্ষসের মায়া ফাঁদ পাতিল রাবণা॥
অঙ্গদ বলে কথা কৈব কোন রাবণের সনে।
সব বেটা নি রাবণ হৈল ভেদ নাই কোন জনে॥
সভে মাত্র ইন্দ্রজিত ছিল আপন সাজে।
পুত্র হঞা পিতাবেশ ধরিবেক কোন লাজে॥
অতএব বুঝিলা এই খানে মেঘনাদ।
আকার ইঙ্গিতে তাকে করিছে সম্বাদ॥
তা দেখি অঙ্গদ বীর ভাবে মনে মনে।
এক কথা শুন্যাছি আমি বিভীষণের স্থানে॥
নিত্য নিকুম্ভিলা করে রাবণের বেটা।
কপালে দেখ্যাছি তার যজ্ঞশেষ ফোঁটা॥
অঙ্গদ বলে সত্য কথা কহরে ইন্দ্রজিতা।
এতগুলি রাবণের মাঝে কে হয় তোর পিতা॥
(ইহার) কোন রাবণ দিগ্বিজয়ে গেছিল কোথাকে
কোন রাবণ কোথা গেছিল পরিচয় দে মোকে॥
চেড়ী উচ্ছিষ্ট খালেক কোন রাবণ পাতালে।
কোন রাবণ বান্ধা ছিল অর্জুনের অশ্বশালে॥
কোন রাবণ যম জিনিতে গেছিল দক্ষিণ।
কোন রাবণ মান্ধাতার বাণে দন্তে কৈল তৃণ॥
কোন রাবণ ধনুক ভাঙিতে গেছিল মিথিলা।
তুলিতে কৈলাস গিরি কোন রাবণ গেছিলা॥

কোন রাবণ সুরাপানে সদা থাকে মত্ত।
কোন রাবণের ভগ্নী হয়্যা নিলেক মধুদৈত্য॥
তোরে) একে একে কঞা দিলাঞি সকল রাবণের কথা।
ইহা সভাতে কাজ নাই তো যোগী রাবণটি কোথা॥
শূর্পণখা রাণ্ডী তারে করাইল দীক্ষা।
দণ্ডক কাননে সে মাগি খালেক ভিক্ষা॥
শঙ্খের কুণ্ডল কাণে রক্ত বস্ত্র পরে।
ডম্বুরা বাজাঞা ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে॥
তপস্বীর বেশ ধরে মুখে মাথে ছাই।
ইহা সভাতে কাজ নাই তোর সেই যোগী রাবণটি চাই॥

(৪)

অদ্ভুতাচার্য

সীতার বর প্রার্থনা

জনক আদি করিয়া যতেক রাজগণ।
বিশ্বামিত্র সঙ্গে লয়া শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
পুরীর ভিতরে লয়া করিল গমন।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিলেক আসন॥
নানা মধু দ্রব্য দিয়া করাইল ভোজন।
বিচিত্র শয্যাতে মুনি করিল শয়ন॥
ঘরেতে থাকিয়া আসি জনকনন্দিনী।
গবাক্ষের দ্বারে দেখে রাম চক্রপাণি॥
রাম দেখি সীতাদেবী দড়াইল মন।
আর বর নাই মোর এ তিন ভুবন॥
মনে ত ধরিল সীতা রামের চরণ।
মনে মনে কহিতে আছেক মন কথন॥
পৃথিবীতে জনমিনু অযোনি সম্ভবা হৈনু
বাপে নাম থুইল জানকী।
বাপের প্রতিজ্ঞা বাণী ঘটক হইল মহামুনি
রঘুচন্দ্র পতি হেন দেখি॥

নর রূপে নারায়ণ রূপে মোহে ত্রিভুবন
কামিনী ধরাইতে নারে চিত্তে।
কমোট কঠোর ধনু রামের কোমল তনু
না পারিবে গুণ চড়াইতে॥
শুনিয়া আকাশবাণী আনন্দিত কমলিনী
বিষাদ না ভাবএ চন্দ্রমুখী।
পাইবা উত্তম পতি ত্রিভুবনে তুমি সতী
তোমার ধর্মে ব্রহ্মা দেব সুখী॥
দেবের শুনিয়া কথা আনন্দিত হৈল সীতা
দেব চক্র বুঝিতে না পারি।
বর দিলা ভগবতী শ্রীরাম হউক পতি
অদ্ভুত মধুর ভারতী॥

মহাভারত

(১)

সঞ্জয়

যুধিষ্ঠির ও বিরাট রাজার বিতর্ক

শুনিয়া বিরাট রাজা হইল কুপিত।
কঙ্কেরে চাহিঁয়া রাজা ক্রোধে অতুলিত॥
ওষ্ঠ থর থর কাঁপে বিরাট রাজার।
ক্রোধদৃষ্টি কঙ্করে নেহালে বার বার॥
আর বার কহে রাজা পরম পীরিতে।
এক রথে কুরু সৈন্য জিনে মোর পুতে॥
মোর সম কেহ আছে সংসার ভিতর।
কুরুবংশ মোর পুত্র জিনে একেশ্বর॥
কঙ্কে বলে সাজে যদি এ তিন ভুবনে।
তথাপি জিনিতে নারে বৃহন্নলা সনে॥
ইন্দ্র যদি রণে আইসে দেবের সহিত।
বৃহন্নলা সহিতে না পারে কদাচিত॥

শুনিয়া বিরাট রাজা ক্রোধে অতি জ্বলে।
ত্রিগুণ কুপিয়া রাজা কঙ্ক প্রতি বোলে॥
মোর পুত্র জয় কৈল তাহাকে নিন্দসি।
বৃহন্নলা নপুংসক তাহাকে প্রশংসি॥
মোর কথা হৈল তোহ্মার মনে অনাদর।
কোন গুণে বৃহন্নলা প্রশংস বিস্তর॥
ব্রাহ্মণ না হইতে যদি লইতাম জীবন।
এই বুলি পাশা ক্রোধে করিল ক্ষেপণ॥

(২)

শ্রীকর নন্দী

অশ্বমেধের জন্য অশ্ব আনিবার ব্যবস্থা

ইন্দুকুন্দ সমবর্ণ সেই অশ্ববর।
পীত পুচ্ছ দীর্ঘকর্ণ পরম সুন্দর॥
মাথাতে লিখিব পত্র সুবর্ণের জলে।
এড়িবেক সেই ঘোড়া অঙ্গ কুতুহলে॥
ঘোটক চালক হৈব নিজ সহোদর।
যে রাজার শক্তি থাকে ধরৌক অশ্ববর॥
এই পত্র লিখি বান্ধিব ললাটে ঘোড়ার।
এড়িব ঘোড়া বৎসরেক চরিবার॥
আপনে আরম্ভিব যজ্ঞ অসিপত্র ব্রত।
এড়িব সব ভোগ যত উপগত॥
যজ্ঞের বিধানে এহি কহিল সকল।
পারিবা করিতে সব না হইও বিকল॥
মুনির বচনে রাজা পুনিহ বোলন্ত।
কিরূপে করিমু কার্য কহ মতিমন্ত॥
হেন অশ্বরত্ন মুঞি কথাতে পাইমু।
ঘোটক চালক মুঞি কারে নিয়োজিমু॥
যে বা ভীমার্জুন সহোদর মোর।
মোর হেতু দুঃখ পাইছে বহুতর॥

তাহাকে পাঠাইতে রণে না হয় যুকতি।
কৃষ্ণ হেন বন্ধু মোর নাহি নিকট সম্প্রতি ॥
বহু বিঘ্ন হএ যজ্ঞ করিবারে আশ।
সিদ্ধি না হইলে যজ্ঞ হইব উপহাস ॥
এ যজ্ঞ না হএ সাধ্য দেখোম যে বুদ্ধি।
কথাতে যে ঘোটক আছে না জানোম শুদ্ধি ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির হেন বাক্য শুনি।
ঘোড়ার উদ্দেশ তবে কহে ব্যাসমুনি ॥

(৩)

কবীন্দ্র পরমেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ

তবে কৃষ্ণ সৈন্যক যে প্রশংসা করন্ত।
আজ ভীষ্ম বীরের করিমু মুঁই অন্ত ॥
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সব করিমু সংহার।
যুধিষ্ঠির রাজাক যে দিমু রাজাভার ॥
এ বলিয়া চলিলেক দেব নারায়ণ।
হাতে চক্র লৈয়া যায় প্রসন্ন বদন ॥
রথ ত্যক্ত হৈয়া তবে চক্র লৈল হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যাএ ত্রিজগত নাথে।
কৃষ্ণের যে পদভরে কাঁপে বসুমতী।
মৃগেন্দ্র ধরিতে যাএ যেন পশুপতি ॥
অম্বক লইয়া ভীষ্ম হাতে ধনুঃশরে।
নির্ভয়ে বোলন্ত ভীষ্ম রথের উপরে।
জগতের নাথ আইলা মারিবার মোক।
রথ হোতে পাড় মোক দেখতক লোক ॥
তুমি মোক মারিলে তরিমু পরলোক।
ত্রিভুবনে এহি খ্যাতি ঘুষিবেক মোক ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের কোপ পাণ্ডুর নন্দন।
রথ হোতে ত্যক্ত হৈয়া ধরিল চরণ ॥

দশপদ অন্তরে ধরিল দুই হাতে।
সংহর সংহর কোপ ত্রিভুবন নাথে ॥
প্রতিজ্ঞা করিছো মুঞি তোম্মার অগ্রতে।
পুত্র দিব্য যদি ভীষ্ম না পারো মারিতে।
ভীষ্ম মারি কুরু বল করিমু যে ক্ষয়।
তোম্মার প্রসাদে হইব সংগ্রামেতে জয় ॥
অর্জুনের বচন শুনিয়া দামোদর।
ক্রোধ এড়ি উঠিলেক রথের উপর ॥

(৪)

কাশীরাম দাস

উতঙ্কের উপাখ্যান

উতঙ্ক তৃতীয় শিষ্য পড়ে গুরু স্থানে।
কত দিনে যায় গুরু যজ্ঞ নিমন্ত্রণে ॥
উতঙ্কে বলিল গুরু থাক তুমি ঘরে।
কিছু নষ্ট নহে যেন তোমার গোচরে ॥
ব্রাহ্মণ বিদেশে গেল শিষ্য রাখে ঘর।
ব্রাহ্মণ আইল কত দিবস অন্তর ॥
উতঙ্কের কাজ ব্রাহ্মণীর মনে জাগে।
একান্তে ব্রাহ্মণী কহে ব্রাহ্মণের আগে ॥
দিবে গুরু দক্ষিণা উতঙ্ক যেই ক্ষণে।
পাঠাইবে তাহাকে আমার সন্নিধানে ॥
তবে দ্বিজ জানিল এসব বিবরণ।
তুষ্ট হইয়া উতঙ্কে বলিল ততক্ষণ ॥
যাহ দ্বিজ সর্বশাস্ত্র হও তুমি জ্ঞাত।
শুনিয়া উতঙ্ক কহে করি জোড় হাত ॥
আজ্ঞা কর গোসাঁই দক্ষিণা কিছু দিব।
গুরু বলে তব পাশে কিছু না মাগিব ॥
যদি দেবে দেহ গুরুপত্নী যাহা মাগে।
এত শুনি গেল দ্বিজ গুরুপত্নী আগে ॥

দক্ষিণা যাচয়ে দ্বিজ করি জোড় পাণি।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী॥
পৌষ্য-ভূপ-মহিষীর শ্রবণ কুণ্ডল।
আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল॥
সপ্তদিন ভিতরে আনিয়া দিবে মোরে।
না আনিলে দিব শাপ কহিলাম তোরে॥

এত শুনি উতঙ্ক গুরুকে নিবেদিল।
যাও হে নির্বিঘ্নে দ্বিজ গুরু আজ্ঞা দিল॥
গুরুকে প্রণাম করি উতঙ্ক চলিল।
কতদূর পথে এক বৃষভ দেখিল॥
পুরীষ ত্যজিয়া বৃষ আছে দাঁড়াইয়া।
উতঙ্কে দেখিয়া বৃষ বলিল ডাকিয়া॥
হের দেখ মল মোর উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
হইবে তোমার প্রিয় করহ ভক্ষণ॥
উতঙ্ক বলিল হেন নহে কদাচন।
অসম্মান পথে প্রিয় নাহি প্রয়োজন॥
বৃষ বলে অসম্মান নহে দ্বিজবর।
তোমার গুরুর দিব্য খাও হে গোবর॥
গুরুদিব্য শুনি দ্বিজ ভাবিল বিস্তর।
গোবর ভক্ষণ করি চলিল সত্বর॥
তথা হৈতে চলি গেল পৌষ্য নৃপঘর।
মাগিল কুণ্ডলযুগ্ম নৃপতি গোচর॥
নৃপ পাঠাইল দ্বিজে রাণীর সদনে।
কর্ণ হইতে কুণ্ডল দিলেন ততক্ষণে॥
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল কাটিয়া দিল রানী।
পাইয়া কুণ্ডল চলি গেল দ্বিজমণি॥

ভাগবত

(১)

মালাধর বসু

গোষ্ঠলীলা

রজনী প্রভাত হইল রাম দামোদরে।
বাছুর লইয়া যান যমুনার তীরে॥
ভোজন করিয়া সবে সিঙ্গা বাজাইয়া।
পাছু যায় শিশুগণ বৎস চালাইয়া॥
একত্র লইয়া সবে যমুনার তীরে।
নানাবিধ জলক্রীড়া করে ধীরে ধীরে॥
কোথাহ মর্কটশিশু লাফ দেই রঙ্গে।
তেন মতে যান কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে॥
চিত্র বিচিত্র গড়ি ময়ূরে নৃত্য করে।
তাহা দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে॥
কতি হো কোকিল পাখী সুস্বর নাদ পূরে।
তাহার সঙ্গে রা কাড়ে রাম দামোদরে॥
কতি হো পক্ষগণ আকাশে উঠিয়া।
তার ছায়া সঙ্গে বুলে দুই ভাই ফিরিয়া॥
কোথাহ বুলে ফুল তুলিয়া মুরারি।
কত গলে কত কাণে কত মাথে পরি॥
তেন মতে বৃন্দাবনে বিহার গোপাল।
শ্রম ক্ষুধা পাইয়া কিছু বলে ছাওয়াল॥

(২)

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য

শ্রীকৃষ্ণরূপ ও বেণুনিনাদ

বেণু নাদে বিমোহিতা বনের হরিণী।
পতিসুখ তে'জিয়া সেবয়ে যদুমণি॥
ছাড়িল কৃষ্ণের গুণে পতি সুত দয়া।
হেন প্রভু বিহরে গোপাল রূপ হঞা॥

কুন্দ কুসুমদাম সুললিত বেশ।
ব্রজশিশু মাঝে নটবর হৃষিকেশ ॥
যখনে তোমার পুত্র করিয়া বিহার।
হরয়ে গোপীর চিত্ত নন্দের কুমার ॥
যখনে মলয় বায়ু বহে সুশীতল।
চৌদিকে বেড়িয়া রহে গন্ধর্ব কিন্নর ॥
কেহ নাচে কেহ গীত সুমধুর গায়।
হেন অপরূপ লীলা করে যদুরায় ॥
দেবকী জঠরে দ্বিজরাজ উৎপন্ন।
ওহি গোপকুলে আসি হইলা উৎপন্ন ॥
মদমত্ত গজরাজ বিহরে বিশাল।
কনক কুণ্ডলগলে দোলে বনমাল ॥
বয়ান কমলবর পূর্ণ শশধর।
গোকুলের দীন তাপ হরিল সকল ॥
এইরূপে গোপীগণ কৃষ্ণ গুণ গায়।
গীত অনুবন্ধ করি দিবস গোঙায় ॥
কৃষ্ণবিনে গোপী সবে না দেখিল আন।
গোপীনাথে নিবেদিল তনু মন প্রাণ ॥
কি কহিব গোপীকুলে প্রেমের উদয়।
ক্ষণ এক যুগ মত কৃষ্ণ বিনে হয় ॥
এই গোপী গীত যেবা ভক্তিভাবে শুনে।
প্রেম ভক্তি বাঢ়ে তার পুণ্য দিনে দিনে
জ্ঞান গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

(৩)

মাধবাচার্য

শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ

শিশুগণ সঙ্গে হরি খেলে হরষিত।
মৃত্তিকা ভক্ষণ কৈল সভার বিদিত ॥
বলভদ্র আদ্য করি সব সহচর।
যশোদার ঠাঞি গিয়া কহিল সত্বর ॥

শুনিঞা যশোদা পুত্রে আনে করে ধরি।
আঁখি পাকল করি বাক্য বলে ক্রোধ করি॥
আরে কানু কি লাগিয়া মৃত্তিকা খাইলে।
দধি দুগ্ধ থাকিতে মাটিতে মিঠা পাইলে॥
বলিতে লাগিল কৃষ্ণ সভয় নয়ন।
মৃত্তিকা খাইল হেন বলে কোনজন॥
রানী বলে তোমার যতেক সঙ্গ ভাই।
আপনি বলাই বলে তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই॥
এবোল শুনিয়া ত্রাসে বলে গোবিন্দাই।
মিথ্যা বাদ দেয় আমি মাটি নাই খাই॥
কই মাটি খাইল হের মুখ দেখ মা।
রানী বলে সত্য যদি তুমি কর হাঁ॥
বদন মেলিল প্রভু জগত আধার।
তথির ভিতরে রানী দেখিল সংসার॥

মনসামঙ্গল

(১)

বিজয় গুপ্ত

অষ্টনাগ বন্দী

তক্ষকে বলে মা করিলাম অঙ্গীকার।
আমি দংশিয়া দিব চাঁদের কুমার॥
এই কার্য করিলে যদি তোমার দুঃখ খণ্ডে।
লখীন্দর দংশিয়া দিব এই দণ্ডে॥
এতেক বলিয়া নাগ হস্ত করে জোড়া।
বায়ুরূপ ধরি নাগ আকাশে পরে উড়া॥
পাতলা সরিষা নাগ পক্ষী হেন উড়ে।
আচম্বিত গিয়া নাগ বাসরঘরে পড়ে॥
সাহের কুমারী বেহুলা নানা মায়া জানে।
বাহিরে আসিছে নাগ জানে অনুমানে॥

বেহুলা বলে কেন ভাই বাহিরে কেন বস।
কপাট খুলিয়া দেই ঘরের মধ্যে আইস॥
মোর দরশনে যদি পলাইয়া যাও।
দোহাই ধর্মের তুমি দেবীর মাথা খাও॥
বেহুলা বলে নাগ তোমার ব্রহ্মবংশজন্ম।
ব্রহ্মবংশ জন্মাইয়া কর চণ্ডালের কর্ম॥
তুমি কিনা জান নাগ আমি ছোটজন।
গুরু মোরে দিছেন মন্ত্র ভুজঙ্গ দলন॥
সেই মন্ত্র জপি যদি আপন হৃদয়।
বড বড় নাগের বিষ তবে পায় ক্ষয়॥
বন্ধুজন দেখিলে খণ্ডে মনের ব্যথা।
তোমার ঠাঁই কহি কিছু ছার বিয়ার কথা॥
বেহুলার অনুরোধ এড়াইতে নারি।
দ্বারে আসিয়া নাগ দিল গড়াগড়ি॥
বুদ্ধিতে আগল বেহুলা সাহের কুমারী।
আথে ব্যথে বেহুলা ছিল দ্বার ছাড়ি॥
দুগ্ধ কলা দিয়া সম্মুখে দিল পূজা।
চতুর্দিকে নেহালিয়া চাহে নাগরাজা॥
দুগ্ধ কলা বেহুলা ঘন ঘন লাড়ে।
খাও খাও বলিয়া নাগেরে ডাক পাড়ে॥
স্বভাবে দুখিত নাগ বায়ু খাইয়া জে।
মধুর স্বাদ পাইয়া আথে ব্যথে পে॥
আগেতে চিন্তিল বেহুলা কি হইবে পাছে।
সোনার সিন্দুক বেহুলা আনিলেক কাছে।
পূজা খেয়ে নাগরাজ মাথা হেঁট করে।
সোনার সাঁড়াশি দিয়া পেট চাপি ধরে॥
তক্ষক বলে মোর কি হবে উপায়।
লড়িতে না পারে নাগ ঘন মোড়া যায়॥
সাহের কুমারী বেহুলা কার্য জানে ভাল।
সিন্দুকে থুইয়া নাগ কপাটে দিল খিল॥

বেহুলা বলে নাগ তুই বড়ই বর্বর।
সিন্দুকে থুইয়া মুই পূজিলাম বিস্তর।
ক্ষুধায় আকুল বড় দুগ্ধ কলা খাও।
সোনার সিন্দুক মধ্যে শুইয়া নিদ্রা যাও॥
নানা মায়া জানে বেহুলা কার্য্যের জানে ফন্দি।
এইরূপে অষ্ট নাগ করিল সব বন্দী॥

(২)

কেতকাদাস ক্ষমানন্দ

লখীন্দরের মৃত্যু

প্রাণনাথ কোলে কান্দে বেহুলা নাচনী।
ঘর হৈতে শুনে তাহা সনকা বেণ্যানী॥
ক্রন্দন শুনিয়া তার শুকাইল হিয়া।
পুত্রবধূ দেখিবারে চলিল ধাইয়া॥
বেহুলা নাচনী কান্দে বড় উচ্চৈঃস্বরে।
দুর্লভ লখাই মৈল লোহার বাসরে॥
দেখিয়া বিদরে প্রাণ চক্ষে বহে পানি।
মরা পুত্র কোলে লৈয়া কান্দেন বেণ্যানী॥
পুত্রশোক দিতে বেহুলা এতদিন ছিল।
দুর্লভ লখাই মোর না জানি কি কৈল॥
হাপুতের পুত্র মোর বাছা লখীন্দর।
তোমা লাগি গড়াইল লোহার বাসর॥
কার শাপ হৈল মোরে কেবা দিল গালি।
বংশে কেহ না রহিল দিতে তিলাঞ্জলি॥
সনকা কান্দিয়া দেয় বেহুলায় গালি।
সিঁথায় সিন্দুরে তোর না পড়িল কালি॥
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি।
পায়ের আলতায় তোর না পড়িল ধূলি॥

খণ্ড কপালিনী বেহুলা চিরল দাঁতি।
বিভাদিনে পতি মৈল না পোহাল রাতি

নাড়া গিয়া ধাইয়া কয় শুন সদাগর।
লোহার বাসরে মৈল বালক লখীন্দর॥
শুনিয়া যে চাঁদ বাণ্যা হরষিত হৈল।
কান্ধে হেতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল॥
ভাল হৈল পুত্র মৈল, আর কি বিষাদ।
কানী চেঙ্গমুড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ॥
ক্রোধ হৈয়া নাড়ারে বলিছে চাঁদ বাণ্যা।
কানীর উচ্ছিষ্ট মড়া ফেল নিয়া টান্যা॥
ঝাট কর্যা কাট নাড়া, রামকলার পাত।
মৎস্য পোড়া দিয়া আজি খাব পান্তা ভাত॥
মনসার হটে তার মরে সাত পো।
নিষ্ঠুর শরীরে তার নাহি মায়া গো॥
ক্ষেমানন্দ বলে "এত মনসার মায়া।
কর গো করুণাময়ী, নায়কেরে দয়া॥"

(৩)

নারায়ণ দেব

বেহুলার পরীক্ষা

পরীক্ষা লয় বিপুলা সুন্দরী।
দুই ভাগ করি কেশ নাহি জানি পাপ লেশ
সাক্ষী হইও জয় বিষহরি॥
বোলিলেক চন্দ্রধর "সর্পে পরীক্ষা কর"
পরীক্ষা লয় সাহের নন্দিনী।
পরম কৌতুক করি সাপের মুখেতে ধরি
কাড়ি লইল মাথার যে মণি॥

বোলে বেউলা শ্বশুর গোচর।
"সর্প পরীক্ষা জিনি কাড়ি লইল মাথার মণি
আর পরীক্ষা দেয় ত সত্বর ॥"
চান্দে বলে "শুন মাও কুশাঙ্কুরে হাঁটি যাও
যশ হউক ভুবন ভরিয়া।
কুশাঙ্কুরে ক্ষুরের ধার হাঁটিয়া যাইবা পার
আর লইবা অযুত কাঞ্চনে।
যদি লইবা পরীক্ষা তবে হইব সত্যরক্ষা
যশ রইব এ তিন ভুবনে ॥"
মিলিয়া যত পণ্ডিত সুধিল কাঞ্চন যত
পরীক্ষিতে করি অগ্নি জ্বালা।
অঙ্গুরী ফেলিল তাত তার মধ্যে দিল হাত
ছানিয়া যে তুলিল বিপুলা ॥
হরষিত বিপুলা সুন্দরী।
অন্তরীক্ষে দেবগণ দেখিয়া কৌতুক মন
পদ্মা হাসে রথে ভর করি ॥
চন্দ্রধরে বোলে হাসি "কহিতে শঙ্কা বাসি
আর এক পরীক্ষা লইবার।
বান্ধি চারি হাত পায় সাগরে হাঁটিয়া যায়
ভাসে বেউলা জলের উপর ॥"
শুষ্ক পাটের গোণ ছান্দি চারি হাত পাও বান্ধি
নামে বেউলা সায়রের ঘরে।
বিপুলারে না দেখিয়া লখাই কান্দে উঠিয়া
দুই চক্ষুর জল পড়ে ধারে ॥
দুই ভাগ হইল জল বিপুলা যে নহে তল
ছুটিলেক সকল বন্ধন।
জলের উপর হাঁটি পুনি পাএত না ছোঁয় পানি
তটেত উঠিল ততক্ষণ ॥

চণ্ডীমঙ্গল

(১)

মাধবাচার্য

ফুল্লরার বারমাস্যা

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে শুন যত মোর দুঃখ।
কহিতে সে সব কথা বিদরয়ে বুক ॥
প্রচণ্ড রবির তাপে দহে কলেবরে।
ললাটের ঘর্ম মোর পড়ে ভূমি 'পরে ॥
সবিনয় বাক্য মোর শুনলো সুন্দরি।
কোন সুখের লাগি হইবা ব্যাধের নারী ॥
আষাঢ়ে রবির রথ চলে মন্দগতি।
ক্ষুধায় আকুল হইয়া লোটাই আমি ক্ষিতি ॥
ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি চারিদিকে চাই।
হেন সাধ করে মনে অন্য বনে যাই ॥
শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে ঝিমানি।
মাথা থুইতে ঠাই নাই ঘরে হাঁটু পানি ॥
শীতের কারণে গৃহে বেড়াই চারি কোণে।
মানের পত্র মাথে দিয়া বঞ্চি দুই জনে ॥
ভাদ্রমাসেতে কন্যা বিদ্যুৎ ঝঙ্কার।
হেনকালে যাই আমি মাথাতে পসার ॥
নয়নেতে জল দিয়া নদী হই পার।
বিষাদ ভাবিয়া স্মরি অর্কের কুমার ॥
আশ্বিন মাসেতে কন্যা জগৎ সুখময়।
দুর্গার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয় ॥
বীণা বাঁশী বাজায় কেহ কেহ গায় গীত।
অন্নের কারণে প্রভু সদায় চিন্তিত ॥
গিরি-সুতা-সুত মাসে শুন মোর দুঃখ।
পাড়াতে পড়শী নাই কহিবারে দুঃখ ॥

উঠিয়া দাণ্ডাইতে মোর গায়ে নাই বল।
ক্ষুধায় আকুল হয়্যা খাই বনফল ॥
অগ্রহায়ণ মাসেতে শীত অতিশয়।
জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ তনু শরীরে না সয়॥
শয়ন মৃগের চর্মে চর্মের বসন।
শীতেতে কাঁপিয়া ঘরে বঞ্চি দুই জন ॥
পৌষ মাসেতে কন্যা হেমন্ত দুস্তর।
শীতভয়ে প্রাণ কাঁপে নাহিক অম্বর ॥
অধর সহিতে ওষ্ঠ কাঁপে ঘনে ঘন।
অরণ্যের কাঠ আনি পোহাই হুতাশন ॥
মাঘ মাসেতে কন্যা গুরুয়া লাগে শীত।
লোমে লোমে বিন্ধে শীত শোষয়ে শোণিত ॥
খৈয়া বাস পরিধানে থাকি নিশাকালে।
রজনীর শীত মোর খণ্ডে রবিজালে ॥
ফাগুন মাসেতে সাজি আইল রতিপতি।
নিজ পরিবার লয়্যা সখার সঙ্গতি ॥
কামিনী করয়ে কেলি প্রভু লয়্যা পাশে।
হেন সমে যায় বীর অরণ্য প্রবাসে ॥
মধুমাসেতে কন্যা শুন মোর কথা।
রবির উত্তাপে মোর দগধয়ে মাথা ॥
দুঃখিত যে বীরমণি অন্তরে কি সুখ।
ভিন্ন রমণীর বীর নাহি চাহে মুখ ॥
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস ভণে।
উত্তর না দিলা দুর্গা ফুল্লরা বচনে ॥*

(২)

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কাননে কালকেতুর খেদ

অপরূপ মায়ামৃগ দেখি মহাবীর।
গুণহীন কৈলা ধনু সম্বরিলা তীর ॥

* বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন) হইতে সংগৃহীত।

কংসনদীর জলে বীর কৈলা স্নান।
তৃষাতে আকুল বীর করে জল পান।
পথে যাত্যে মহাবীর খায় বনফল।
মলিন বদনে চিন্তে ঘরের সম্বল॥
দুখিনী ফুল্লরা মোর আছে প্রতি-আশে।
কি বলিয়া দণ্ডাইব যেয়্যা তার পাশে॥
তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি।
শ্বশুর-ঘরের ধান্য ধারি দেড় আড়ি॥
কিরাত-পাড়াতে বসি না মেলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সহে ভার॥
বিষম সম্বল-চিন্তা মহাবীরে লাগে।
এক চক্ষে নিদ্রা যায় এক চক্ষে জাগে॥
এথাই নরক-স্বর্গ বলে ভাগবতে।
নরক ভুঞ্জিতে কালু আইল মরতে॥
সুকৃতি-পুরুষ জীয়ে সুখ-ভোগ-হেতু।
নরক ভুঞ্জিতে ক্ষিতি-তলে কালকেতু॥
ধড়ার আঁচলে মোছে লোচনের নীর।
সুবর্ণ গোধিকা পুন দেখে মহাবীর॥
কালকেতু মহাবীর করিছে তর্জন।
তোমাকে পোড়ায়্যা আজি করিব ভক্ষণ॥
যাত্রার সময় দেখি গেনু তোর মুখ।
বনে বনে বেড়ায়্যা পাইনু বড় দুখ॥
যত দুঃখ পাইনু অরণ্যে বেড়াইয়া।
নকুল বদলে তোমা খাব পোড়াইয়া॥
এমন বিচার বীর মনেতে ভাবিয়া।
বান্ধিল গোধিকা বীর জাল-দড়ি দিয়া॥
চারি পদে বান্ধি বীর ফেলিল ধনুকে।
অভয়া লম্বিত ঊর্ধ্ব-পুচ্ছ হেট-মুখে॥
ধনুকের হূলে হেম-গোধিকা বান্ধিয়া।
ঘরকে চলিল বীর বিষাদ ভাবিয়া॥

সুশীলার বারমাসিয়া

বৈশাখে বসন্ত ঋতু সুখের সময়।
প্রচণ্ড-তপন-তাপ তনু নাহি সয়॥
চন্দনাদি তৈল দিব হয়্যা সহচরী।
সামলী গামছা দিব সুবাসিত বারি॥
পুণ্য বৈশাখ মাস, পুণ্য বৈশাখ মাস।
দান দিয়া পুরিব দ্বিজের অভিলাষ॥

নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
খাওয়াব তোমাকে হে নবাত আম্ররসে॥
শীতল চন্দন দিয়া করিব বাতাস।
আমার মন্দিরে প্রভু করিবে আয়াস॥
চাঁদের উপরে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া।
হাস্য পরিহাসে যাবে রজনী বহিয়া॥
শুন প্রাণনাথ ওহে শুন প্রাণনাথ।
নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাত॥
আষাঢ়ে গর্জায় মেঘ নাচয়ে ময়ুর।
নবজলে মদে মত্ত ডাকয়ে দাদুর॥
আমার মন্দিরে থাক না চলিহ রায়।
সাল্য অন্ন ক্ষীর খাদ্য ভুঞ্জব তোমায়॥
আষাঢ় সুখ-হেতু, হে আষাঢ় সুখ-হেতু।
নিদাঘ বরিষা হিম একা তিন ধাতু॥
সংকট সময় নাথ ধারা শ্রাবণ।
সাধ লাগে দিতে অঙ্গে রবির কিরণ॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ এক-ই না জানি॥
বিদেশ ত্যজিয়া লোক আইসে বড় আশে।
কামিনী কেমতে ছাড়ি যাবে নিজ দেশে॥
প্রভু ঘরে কর বাস, প্রভু ঘরে কর বাস?
আর না করিও প্রভু বাণিজ্যের আশ॥

শুন মোর নিবেদন, শুন মোর নিবেদন ।
বিষাদ না কর প্রভু স্থির কর মন ॥

ভাদ্রপদ মাসে ঝড় দুরন্ত বাদল ।
নদনদী একাকার আট দিকে জল ॥
ডাঁস মশা নিবারিতে দিব হে মশারি ।
চামর বাতাস দিব হয়্যা সহচরী ॥
সুন্দর মন্দিরে তব করাইব বাসা ।
আর না করিহ দূর বাণিজ্যের আশা ॥

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে ।
ষোল উপচারে মেষ ছাগল মহিষে ॥
যত চাহ ধন দিব কর ভূমি দান ।
সিংহলের লোক যত সাধিব সম্মান ॥
নানা বেশ করিব সকল সহচরী ।
নাট্য গীতে গোঙাইব দিব বিভাবরী ॥
আমি বুঝাইব রাজায় আমি বুঝাইব রাজায় ।
আনাইব তোমার জননী বিমাতায় ॥

বরষা টুটিয়া নাথ আইলে কার্তিক মাস ।
দিবসে দিবসে হবে হিমের প্রকাশ ॥
তুলি পাটী পাছুড়ি করাব নিয়োজিত ।
অর্ধ রাজ্য দিব বাপে করিয়া ইঙ্গিত ॥
পুণ্য কার্তিক মাস পুণ্য কার্তিক মাস ।
দান দিয়া পূরিবে দ্বিজের অভিলাষ ॥
সকল নতুন শস্য হবে এই মাসে ।
ধান চাল্য মুগ মাস পূরিবে আভাসে ॥
রাজাকে বলিয়া দিব শতেক খামার ।
ধরাইব রাজপদ কি দুঃখ তোমার ॥
পুণ্য অগ্রহায়ণ মাস পুণ্য অগ্রহায়ণ মাস ।
বিফল জনম তার যার নাই চাষ ॥

পৌষ মাসেতে শীত যদি করে পীড়া।
তুলি পাটি দিব আর পাটের পাছড়া॥
গোঙাইব শীত প্রস্থ অষ্টম প্রকারে।
মৎস্য মাংস মধু মূলা নানা উপহারে॥
সুখে গোঙাইব হিম সুখে গোঙাইব হিম।
উজানি নগরকে বাসিবে যেন নিম॥

মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নানদান।
সুপাঠক আন্যা দিব শুনিতে পুরাণ॥
মিষ্ট পিষ্ট যোগাইব দিবসে দিবসে।
আনন্দে গোঙাইব নাথ মাঘ নিরামিষে॥
মাঘ মাসে কুতূহলে, মাঘ মাসে কুতূহলে।
সিতল যোগাব আমি বিহানে বিকালে॥
ফাল্গুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে।
তথি দোল মঞ্চ নাথ করিব নির্মাণে॥
হরিদ্রা কুঙ্কুম চুয়া করিয়া ভূষিত।
ফাগু দোলে আনন্দে গোঙাব নিত নিত॥
সখীগণ মেলিয়া আমরা গাব গীত।
আনন্দ হইয়া শুনে কৃষ্ণের চরিত॥
মধুমাসে মালয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতির মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছায়্যা শয়নে।
মধু মাসে আমোদিত গোঙাব দুজনে॥
মোহন চৈত্রমাসে, মোহন চৈত্রমাসে।
মোহন মন্দিরে রবে মোহন আবেশে॥
সুশীলার বিনয় শুনিয়া সদাগর।
হেঁট মুখে শ্রীপতি দিলেন উত্তর॥
সর্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ।
বারমাস্যা গান দ্বিজ শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ধর্মমঙ্গল

(১)

মাণিকরাম গাঙ্গুলী

মেঘ বর্ণন

আজ্ঞা পেয়ে	শর্মী হয়ে	সমীরণ মেঘং।
চলে তথি	হয়ে অতি	খরতর বেগং॥
গুড় গুড়	হুড় হুড়	করে কুল কুলং।
চারি মেঘ	চৌদিকে	বরিষয়ে জলং॥
শিলকণা	ঝনঝনা	পড়ে অনিবারং।
ভাঙ্গে ঘর	তরুবর	ঝড়ে অন্ধকারং॥
অবিরল	সদাক্ষণ	তড়িৎ প্রকাশং।
পড়ে বাজ	মহীনাশ	নির্ঘোষ নিষ্পেষং॥
ত্রিজগৎ	চমকিত	ভয়ে ভীত লোকং।
সবে কয়	বুঝি প্রায়	হইল বিপাকং॥
ভূশবার	একাকার	নদনদী খাতং।
মেঘসব	করে রব	সুখোচিত চিতং॥
হৃদি মাঝ	ধর্মরাজ	পদ পুণ্ডরীকং।
সদা ভনে	ভাবি মনে	দ্বিজ মানিকং॥

(২)

ঘনরাম চক্রবর্তী

ইছাই ঘোষের যুদ্ধযাত্রা

ভূতলে আছাড়ে ভুজ মারে মালসাট।
সাজে শত্রু সমরে সাক্ষাৎ যমরাট॥
বিরাট সমরে যেন সুশর্মার রণ।
সাজিল রাবণ কিবা বধিতে লক্ষ্মণ॥
সেই রূপ সাজন করিছে তড়বড়ি।
দড়বড় কোমর কষিছে কড়াকড়ি॥

পেটি আঁটি বাঁধিল বত্রিশ বেড় পাগে।
কষিতে কুরঙ্গ ছাল বার গজ লাগে॥
ডান পাশে বান্ধিল যুগল যমধর।
খরতর যোড়া খাঁড়া নামে দুই খর॥
বাম দিকে যুগল টাঙ্গী যম অবতার।
চকো ছুরি কাটরি কুটিল হীরা ধার॥
কষে বাঁধি কাঁকালে কালিকা করি জপ।
যার মুখে আগুন উগারে দপ্‌ দপ্‌॥
তার কাছে তূণে বান্ধে তেরশত তীর।
চক্ চক্ চিয়াড়ে পাটন পাঁচ শির॥
শিরেতে সোনার টোপ টয়ে বান্ধা তায়।
রাতুল বরণ রুচি বীর মাটি গায়॥
তড়িত জড়িত যেন জলধর জ্যোতি।
হীরামণি হার গলে কানে গজমতি॥
ধনুক বন্দুক বুকে আচ্ছাদিল ঢাল।
বান্ধিল দেবীর বাণ মূর্তিমান কাল॥
বর্ণ শিঙ্গা কাড়াপড়া টনক টেমাই।
শ্যামারূপা পদ ভাবি চলিল ইছাই॥
ঘাঘর ঘুঙ্গর ঘণ্টা নূপুরের ধ্বনি।
চলিতে চলিতে কানে কত রব শুনি॥
ঢাল মুড়ে মালট মারিছে লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে॥

অন্নদামঙ্গল

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট্ সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥

ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধক ধ্বক্ ধক্ ধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা।
কটীকট্ট সদ্যোমরা হস্তি ছালা॥
পচা চর্ম-ঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিণাকে ত্রিশূলে॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী-উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥
সহস্র সহস্র চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্প ফণা॥
বুড়া বলি তোমা সনে কই নাহি কিছু।
তুমি সে ব্যথিত হয়ে বুল পিছু পিছু॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাখিনী পেত্নিনী মুক্ত কেশে॥
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

শিবায়ন

রামেশ্বর চক্রবর্তী

বাগ্দিনীর পরিচয়

কি নাম তোমার কহ কোন গাঁয়ে ঘর।
বল বল বাগ্দিনী নাহি বাস ডর॥

মা বাপের নাম বল বল কার বেটি।
স্বামীর বয়স কত ছেলে পুলে কটি॥
ভাতারের ভাব যত জানা গেল তা।
সে হলে এমন কেন শুধু হাত পা॥
তুয়া চাঁদ মুখ চেয়ে বুক যায় ফেটে।
কীশ তেঁই হেন হাতে পরায়েছে মেঠে॥
তোমার ভাতার বুড়া বুঝিনু নিশ্চয়।
যুবা নাকি এমন যুবতী ছাড়ি রয়॥
বাগ্দিনী বলে তুমি বাসে চাও চলে
জ্বলন্ত অনলে কেন ঘৃত দেহ ঢেলে॥
বুড়ার বিদ্রূপে মোর মূর্তি হৈল কালী।
বুড়া রাক্ষস্ বুড়া বোকস্ বুড়া দেখে জ্বলি॥
শিব বলে আমি যে ব্যথিত বলে জান।
দয়া করে দুটি কথা কও নাই কেন॥
দেহ পরিচয় রামা দেহ পরিচয়।
বুড়ার ব্যগ্রতা শুনি বাগ্দিনী কয়॥
বঙ্গদেশে নিবাস শিখরপুরে ঘর।
স্বামী বুড়া দরিদ্র দোলই দিগম্বর॥
বাপের নাম হেমু দোলই সেব্য যার সৌরি।
মায়ের নাম মেনকা আমার নাম গৌরী॥
বুড়াটি বিদেশে বনিতায় নাই রুচি।
মাঠে মাঠে মাছ মারি হাটে হাটে বেচি॥
অল্প দিনে দুটি বেটা দিয়াছে গোঁসাই।
বহিন বিহীন পুত্র কার্তিক গণাই॥
পার্বতী প্রকৃত পরিচয় দিলা তবু।
আ হরে অজ্ঞান হৈলা জ্ঞানময় প্রভু॥
মায়ার মহিমা মদনের পরাক্রম।
জানাইতে জীবকে যোগেন্দ্র পাইল ভ্রম।
তরুণীর বোলে ত্রিলোচন তৃপ্ত হৈলা।
সই সই বলে সেই সেই নাম বল্যা॥

নামে নামে তামে তামে হৈল বরাবর।
সয়াকে সইয়ের দয়া চাই অতঃপর॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বৃন্দাবন দাস

নবদ্বীপ কেন্দ্র

নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেহো ভট্টাচর্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে॥

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল

লোচন দাস

নিমাই সন্ন্যাসে শচীর শোক

পুছিতে না পারে কিছু মুখে নাহি রায়।
শুনি শচী দেবী আউদর চুলি ধায়॥
আমার নিমাই কোথা থুয়্যা আইলা তুমি।
কেমনে মুণ্ডাইলা মাথা কোন্ দেশভূমি॥
কোন ছাড় সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুণ।
গোরাচাঁদে মন্ত্র দিতে না হৈল করুণ॥
অনুমতি দিল কেমনে মুণ্ডাইতে মাথা।
এ হেন সন্ন্যাসী যে তাহার ঘর কোথা॥
সে হেন সুন্দর কেশ লাবণ্য দেখিয়া।
কোন ছার নাপিত সে নিদারুণ হিয়া॥
কেমন পাপিষ্ঠ সে কেশে দিল ক্ষুর।
কেমনে বা জীব সেই হৃদয় নিষ্ঠুর॥
আমার নিমাই কার ঘরে ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মস্তক মুণ্ডায়্যা পুত্র কেমন বা হৈল॥
আর না দেখিব পুত্র বদন তোমার।
অন্ধকার হইল ঘোর সকল সংসার॥
রন্ধন করিয়া আর নাহি দিব ভাত।
সে হেন সুন্দর অঙ্গে নাহি দিব হাত॥
সুন্দর বদনে চুম্ব নাহি দিব আর।
ক্ষুধার সময় কেবা জানিবে তোমার॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের তরজা

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়া দ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥

এই মত মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমাবেশে।
উন্মাদে বিলাপ করেন রাত্রি দিবসে॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তারে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে॥
নদীয়া চলহ মাতারে কহিও নমস্কার।
মোর নামে পাদপদ্ম ধরিও তাঁহার॥
কহিও মাতারে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমা বন্দিয়ে চরণ॥
যেদিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সেদিন অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস
বাতুল হইয়া কৈল নিজ ধর্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার॥
নীলাচলে আমি আছি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ তোমা নারিব ছাড়িতে॥
গোপলীলায় পাইল যেই প্রসাদ-বসনে।
মাতাকে পাঠায় তাহা পুরীর বচনে॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে।
মাতাকে পৃথক পাঠায় আর ভক্তগণে॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা॥
আচার্যাদি ভক্তে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতার ঠাঁই আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া॥
আচার্যের ঠাঁই গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য গোঁসাই প্রভুকে সন্দেশ কহিল॥

তরজা প্রহেলি আচার্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে॥
প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি সব প্রভুকে কহিলা॥
তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর যেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা॥
জানিয়া স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল॥
প্রভু কহে আচার্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতকাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ।
আমিও বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি কিছু হইলা বিমন॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরাগমন।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ॥

গোপীচন্দ্রের পাঁচালী

ভবানী দাস

চারি রানীর দুঃখ বর্ণনা

রাগ পয়ার ছন্দ

কান্দএ অদুনা নারী কান্দএ পদুনা।
কান্দএ রতনমালা আর কাঞ্চা সোনা॥
অদুনার কান্দনে গাবীর গাব ছাড়ে।
পদুনার কান্দনে সমুদ্র উজান ধরে॥
রতনমালার কান্দনে প্রাণী নহে স্থির।
পদ্মমালার কান্দনে মেদিনী যায় চির॥
চারি নারী কান্দে রাজার গলাএ ধরিয়া।
মৈনামতি বোলে তুমি জাবে যোগী হৈয়া॥
যে দেশে জাইবা প্রিয়া সে দেশে জাইব।
ধরিয়া যোগীর বেশ সঙ্গতি থাকিব॥
তুমি সে যোগিআ রাজা আমি ত যোগিনী।
ঘরে ঘরে মাগিমু ভিক্ষা দিবস রজনী॥
ভিক্ষা মাগিয়া প্রিয়া রান্ধি দিব ভাত।
ছাড়িয়া না দিমু তোমা শুন প্রাণনাথ॥
এক সন্ধ্যা রান্ধি ভাত দুই সন্ধ্যা খিলাএমু।
হাটিতে নারিলে রাজা কোলে করি লইমু॥
রাজা বোলে কি প্রকারে হাটিয়া জাইবা।
সে পন্থে বাঘের ভয় দেখি ডরাইবা॥
খাউক বনের বাঘে তারে নাহি ডর।
তোমা আগে মৈলে হইব সাফল্য মোহর॥
জেদিন আছিলু শিশু বাপ মাএর ঘরে।
সেদিন না গেলা প্রিয়া দূর দেশান্তরে॥
[অখন] যৌবন হৈল তোমা বিদ্যমান।
তুমি যোগী হইলে প্রভু তেজিব জীবন॥
জখনে বাপের বাড়ী জাইতে চাইল আমি।
চুলে ধরি মারিবারে মোরে চাইলা তুমি॥

জে [দিন] অদুনার মাথে ছোট ছিল চুল।
সেদিন তোমার মাএ নিল পান ফুল॥
এক বৎসরের কালে নিত্য আইল গেল।
পঞ্চ বৎসরের কালে দেখি জোড়া দিল॥
সপ্ত বৎসরের কালে আসি বিভা কৈলা।
নব বৎসরের কালে মন্দিরেতে নিলা॥
তুমি সাত আমি পাঁচ এমত কালে বিয়া।
হীরামন মাণিক্য মুক্তা লক্ষ দান দিয়া॥
মোর বৈন পদুনারে পাইল বেভার।
ধনরত্ন মোর বাপে যাচিল অপার॥
সকল ছাড়িয়া আইল ভগ্নীএ আমার।
ছোটকালের বন্ধু মোরা জানিয় তোমার॥
আপনার হস্তে প্রভু তৈল গিলা দিলা।
আবের কঙ্কই দিয়া কেশ বিলাসিলা॥
লক্ষ টাকার জাদ দিলা চুল বান্ধিবার।
লক্ষ টাকার খোপা দোলে পিষ্টের উপর॥
পিন্ধিবারে দিলা প্রভু মেঘনাল সাড়ি।
জেই সাড়ির মূল্য ছিল বাইশ কাহন কৌড়ি॥
পাএতে পিন্ধাএলে রাজা সোনার নেপুর।
হাটিতে চলিতে বাজে ঝামুর জুমুর॥
নিজ হস্তে কাম সিন্দুর কপালে ভরি দিলা।
জোড় মন্দির ঘরে নিয়া রূপ রঙ্গ চাএলা॥
এ হেন দয়ায় বন্ধু কি দোষে ছাড়িলা।
হেন প্রিয়া ছাড়ি কেন বিদেশে চলিলা॥
তোমায় আমায় নষ্ট কৈল জেই জন।
নষ্ট করুক তার প্রভু নিরঞ্জন॥
আহে প্রভু গুণনিধি কি বুলিলা বাণী।
সুনিতে বিদরে বুক না রহে পরাণি॥
বনে থাকে হরিণী বনে ঘর বাড়ি।
প্রেমের কারণে কাকে কেহ না জাএ ছাড়ি॥

সর্ব দিন চরা করে বনের ভিতর।
সন্ধ্যা কালে চলি জাএ আপনা বাসর॥
হরিণা জাএ আগে আগে হরিণী জএে পাছে।
সর্ব দুঃখ পাসরএ স্বামী থাকে কাছে॥
সেই পশুর বুদ্ধি নাই তুহ্মি রাজার ঠাঁই।
এত বারে আহ্মি নারী রাজা তোহ্মারে বুঝাই॥
আঠার বৎসর হৈল তুমি অধিকারী।
এ বার বৎসর হৈল মোরা চারি নারী॥
এ বুলিয়া চারি বধূ পুরী প্রবেশিল।
ঘরে গিয়া চারি বধূ যুক্তি বিমর্শিল॥
অদুনা এ বোলে বৈন গো পদুনা সুন্দর।
সাত কাইতের বুদ্ধি আমার খড়ের ভিতর॥
নানা বর্ণে চারি বৈনে করিয়া সাজন।
রাজা ভেটিবারে চলে সহৃষ মন॥
সুনহে রসিক জন এক চিত্ত মন।
কহেন ভবানী দাস অপূর্ব কথন॥

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস

সুকুর মামুদ

চারি রানীর রাজা সম্ভাষণ

বসিয়াছে গোপীচন্দ্র সুবর্ণ পালঙ্কে।
চারি রানী সম্মুখে দাঁড়ায় রঙ্গ ভঙ্গে॥
রানীকে দেখিয়া রাজা না তুলিল মুখ।
অন্তরে ভাবিয়া রানী মনে পাল্য দুখ॥
চারি রানীর মধ্যে অদুনা প্রধান।
যোড় হাতে কহে কথা স্বামী বিদ্যমান॥
অদুনা বলেন শুন প্রভু গুণমণি।
স্ত্রী লোকের স্বামী বিনে বিফল জীবনী॥
নারীকুলে জন্ম যার নাহি প্রাণপতি।
চন্দ্র বিনে দেখে যেন অন্ধকার রাতি॥

জল বিনে মৎস্যের জীবনের নাহি আশ।
স্বামী বিনে নারীকুলের সকলি বিনাশ॥
জিউ বিনে শরীরের নাহিক উপায়।
স্বামী বিনে নারীর যে মিথ্যারূপ হয়॥
এই চারি যুবতী ছাড়ি যাউবে সন্ন্যাসে।
স্বামী বিনে নারীর দুঃখ শুন বার মাসে॥
শোন শোন ওরে স্বামী নারীর দুঃখের কথা।
স্বামী বিনে নারীগণের যতেক অবস্থা॥
কাতিক মাসেতে স্বামী নির্মল রয় রাতি।
দিবা নিশি মিলে যারা ঘরে লয়ে পতি॥
যৌবনকালেতে নারী ভাবে রাত্র দিন।
স্বামী বিনে নারীগণের সদাই মলিন॥
অঘ্রাণ মাসেতে স্বামী হেমন্তের ধান।
যাহার স্বামী ঘরে তার যৌবনের গুমান॥
নানা উপহারে স্বামী খায় পঞ্চ গ্রাস।
যার স্বামী ঘরে তার যৌবনের বিলাস॥
পৌষ মাসেতে স্বামী পৌষা আন্ধারি।
স্বামী ও যুবতীর যৌবন হয় মহা ভারি॥
যার স্বামী ঘরে তার মদন বিলাসী।
আন্ধার ঘরে দেখি যেন পূর্ণিমার শশী॥
মাঘ মাসেতে স্বামী অতিশয় শীত।
স্বামীর কারণে নারী সদাই চিন্তিত॥
লেপ লিয়ালি আর যত আভরণ।
স্বামী বিনে নাহি নারীর শীতের উড়ন॥
ফাগুন মাসেতে স্বামী কোকিলের রব করে।
স্বামীর কারণে নারী ফাফর খায়ে মরে॥
পশু পক্ষ কাকাতুয়া আর ময়না শুক।
স্বামীকে পাইয়া করে নানান্ কৌতুক॥
চৈত্র মাসেতে স্বামী লিত নিবারিণী।
স্বামী আসে স্নান করে নারী সোহাগিনী॥

স্বামী বিনে নারীগণের কিসের গঙ্গাস্নান।
যুবতীর সম্বল নারী আর নাহি ধন॥
বৈশাখ মাসেতে স্বামী ভহ ভহ ঘরণী।
নারীর যৌবন জ্বলে বিরহ অগণি॥
ধন সম্পৎ নারীর মনে নাহি লয়।
শৃঙ্গার বিনে নারীর বাধিছে হৃদয়॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে স্বামী কৃষাণের ধান।
ইন্দ্রার জল বিনে জমি থাকেন দুখান॥
স্ত্রী পুরুষে ঘর করে বিধির সৃজন।
স্বামী বিনে নারীর যৌবন সব অকারণ॥
আষাঢ় মাসে স্বামী নিসাড়ে পোহায় রাতি।
স্বামীর কোলে থাকে নারী বড় ভাগ্যবতী॥
ভাগ্যবতী নারী যার স্বামী আছে ঘরে।
কমলেত মধুপান করেত ভ্রমরে॥
শ্রাবণ মাসেতে স্বামী যমুনার তরঙ্গ।
গঙ্গা ও সাগর দুহে হয় এক সঙ্গ॥
সংসারে তরিব স্বামী বরষার জলে।
যুবতী পুড়িয়া মরে মদন অনলে॥
ভাদ্র মাসেতে স্বামী পাকিয়া পড়ে তাল।
স্বামী বিনা যুবতীর যৌবন মহাকাল॥
যুবতীর যৌবন প্রভু তরল সাঁতার।
স্বামী থাকিলে বিরহ সাগর করে পার॥
আশ্বিন মাসেতে স্বামী চণ্ডিকার পূজা।
যার স্বামী ঘরে সেই নারী চতুর্ভুজা॥
স্বামীর কারণে সবে পূজে চণ্ডিকারে।
অভাগীর স্বামী তুমি যাবে দূরান্তরে॥
নব যৌবন প্রভু নিবেদেয় কালে।
যুগী হয় প্রাণের নাথ এই ছিল কপালে॥
স্বামীর নিকটে রানী এই কথা বলি।
ফেলায় গায়ের বসন বুকের কাচুলি॥

যুগী হবে প্রাণের নাথ কি ধন পাবে নিধি।
এ সুখ সম্পদ তোমার বঞ্চিত হইল বিধি।
কান্দিয়া অত্তনা কহে রাজার চরণে।
নারীর যৌবন প্রভু স্বামীর কারণে
পতি বিনে নারী যেন ধুতুরার ফুল।
তাঁতির বাড়ীর কাপড় নয় যে ধুবির বাড়ী দিব।
ধুবির বাড়ীর কাপড় নয় যে ভাজিয়া পরিব॥
অন্ন ব্যঞ্জন নয় যে খাইব বসিয়া।
ধানের বাড়ীর সেন্দুর নয় যে রাখিব কৌটায় পুরিয়া॥
অষ্ট অলঙ্কার নয় যে পেটারি ভরিব।
ধন সম্পদ নয় যে মোহর বান্ধিব॥
স্বামী বিনা নারীর যৌবন কি দিয়া রাখিব।
এ রূপ যৌবন নয় যে কার বাড়ীতে যাইব॥
কার বাড়ীতে যাব আমরা যাব কার বাড়ী।
স্বামী থাকিতে আমরা জীয়ন্তে হব আঁড়ী॥
এতেক সুনিয়া রাজা বদন তুলিল।
অদুনার গায়ে রাজা নিজ বস্ত্র দিল॥

আরাকানের মুসলমান কবির কাব্য

আলাওল

(১)

পদ্মাবতী

সরোবরে আসিয়া পদ্মিনী উপস্থিত।
খোপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকুলিত॥
সুগন্ধী শ্যামল-ভার ধরণী ছুঁইল।
চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেড়িল॥
কিম্বা মেঘারম্ভ-যোগে হইল অন্ধকার।
বিধুন্তুদ আসিল না চন্দ্র গ্রাসিবার॥
দিবস সহিতে সূর্য হইল গোপন।

চন্দ্র তারা লইয়া নিশি হৈল প্রকাশন ॥
ভাবিয়া চকোর-আঁখি পড়ি গেল ধন্ধ ।
জীমূত সময় কিবা প্রকাশিত চন্দ ॥
হাস্য সৌদামিনী-তুল্য কোকিল-বচন ।
ভুরু যুগ ইন্দ্রধনু শোভিত-গগন ॥
নয়ন খঞ্জন দুই সদা কেলি করে ।
নারাঙ্গী জিনিয়া কুচ সগর্ব আদরে ॥
সরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি ।
পদ-পরশন-হেতু করয় লহরী ॥
আপাদ লম্বিত কেশ কস্তূরী সৌরভ ।
মোহ-অন্ধকার মন-দৃষ্টি পরাভব ॥
অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর ।
শ্যামতা সৌষ্ঠব কার বহে সমসর ॥
ত্রিগুণ সঞ্চারে বেণী ভুবন-মোহন ।
এক গুণে দংশিতে পারয় ত্রিভুবন ॥
বিরাজিত কুসুম-গ্রথিত মুক্তা-হার ।
সজল জলদ-মধ্যে তারকা-সঞ্চার ॥
স্বর্গ হৈতে আসিতে যাইতে মনোরথ ।
সৃজিল অরণ্য-মধ্যে মহাশুদ্ধ পথ ॥
সেই পন্থে বাটওয়ার বৈসে অনুদিন ।
কুটিল অলকা-পাশে ব্যক্ত রক্ত-চিন ॥
কিবা কবরীর মাঝে স্বর্ণ-রেখাকার ।
যমুনার মাঝে যেন সুরেশ্বরী-ধার ॥
জন্মান্তের বাঞ্ছা-সিদ্ধি হৈতে সহসাত ।
ত্রিবলি উপরে যেন ধরিছে করাত ॥
কিবা মুখচন্দ্র আঁখি-অরুণে দেখিয়া ।
ত্রাসে ফাটিয়াছে কিবা তিমিরের হিয়া ॥
কার শক্তি আছে সেই পন্থ যাইবার ।
রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ণ অসিধার ॥
কদাচিৎ কেহ যদি যায় গম্য-আশে ।

মন বন্দী হয় তার অলকার ফাঁসে ॥
ভাগ্যের উদয়-স্থলী ললাট সুন্দর।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর ॥
বালক চন্দ্রিমা অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন।
মোহন ললাট অতি ভাগ্য-বিধি-চিন ॥
কি মতে বলিব ভাল তুলনা সে অঙ্গ।
সকল অঙ্ক চন্দ্রমা ললাট নিষ্কলঙ্ক ॥
কুহু রাহু করে চন্দ্রে আলোক-গরাস।
মোহন ললাটে চন্দ্র সদত প্রকাশ ॥
ক্ষণেক আলোক চন্দ্র ক্ষণেক বিদিত।
প্রশস্ত ললাটে চন্দ্র সদা প্রকাশিত ॥
মৃগমদ তিলক সুন্দর চারিপাশ।
চন্দ্রমা উপরে রাহু মিহির গরাস ॥
স্বেদ বিন্দু কপালতে উদয় যখন।
মুকুতা আসিল কিবা ভ্রাতৃ-সম্ভাষণ ॥
যাহার ললাটে পূর্ণ ভাগ্যের উদয়।
সেই ললাটে ত হইব সংযোগ নিশ্চয় ॥

কামের কোদণ্ড ভুরু অলকা সন্ধান।
যাহারে হানয়ে বালা লয় যে পরাণ ॥
ভুরুভঙ্গ দেখি কাম হইল অতনু।
লজ্জা পাই তেজিল কুসুম শরধনু ॥
ভুরু চাপে গুণাঞ্জন বাণকটাক্ষ।
ত্রিভুবন শাসিল করিয়া তাহে লক্ষ্য
কদাচিৎ গগনে উদিলে ইন্দ্রধনু।
ভুরু-ভঙ্গী দরশনে লুকায় নিজ
ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল ॥

(২)

সতী ময়নাবতী বা লোরচন্দ্রাণী

দৌলত কাজী

(ক)

ময়নাবতী ও মালিনী দূতীর উক্তি-প্রত্যুক্তি—

মালিনীর উক্তি :

তোর দুঃখ দেখি মুঞি মরি যাম,
বোলে ছুরি দেও বাণী।
মালতী ভোমরা যেন সমাগম,
চারু ছৈলা দেওঁ আনি॥ ধ্রু॥
দেখ ময়নাবতী প্রথম আষাঢ়,
চৌদিকে সাজে গম্ভীর।
বধুজন প্রেম ভাবিতে পন্থিক
আইসএ নিজ মন্দির॥
যায় ঘরে কান্ত, সব সোহাগিনী
পূরএ মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা তামসী-রজনী,
নির্জন সঙ্কেত ঠাম॥
দারুণ ডাউক দাদুরী ময়ূর
চাতকে নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুণিতে শ্রবণে বিরহিণী
ছোহএ মনে মদন॥
যাবতে বয়স কেলিকলারস
পূরএ মনোরথ জানি।
হঠ-পরিপাটি মান উপরোধ
চাতুরী তেজ কামিনী॥
বৃদ্ধ হৈলে নারী যুবকের বৈরী,
ফিরি তাকে না পুছারি।
যাইব যৌবন নিশির স্বপন
জীবন দিবস চারি॥

হরি মধুপতি মান রসবতী
মতি-ভোর তোর ছাড়ি।
অবধি অন্তর ফিরি না পুছল
আর তোর কি বড়াই ॥
শুনহ উকতি, করহু ভকতি
মানহ সুরতি রাই।
নাগর সুজন মিলাইয়া দেওঁ,
রাধার কোলে কানাই ॥
কহেন্ত দৌলত, সতী সৎপথ
না ত্যজে যাবৎ প্রাণ।
নস্বর নায়ক রস বাণিজার
শ্রীযুত আশরফ খান ॥

ময়নাবতীর উত্তর :

আএ ধাত্রি কুজনি কি মোক শুনাঅসি,
বেদ-উকতি নহে পাঠ।
লাখ উপাএ মেটিতে কো পারএ
যো বিধিলিখন ললাট ॥
মালিনী বোলসি অনুচিত বাণী।
ধরম ন ছোঅতি, তেজিঅা সংমতি
লোর-প্রেম করা আসি হানি ॥ ধ্রু ॥
মোহোর সুনাঅর গুণের সায়র
মধুর মুরতি বেশ।
সো মধু তেজিয়ে কৈছে বিখ পানাও
ভাল ধাত্রি কহ উপদেশ ॥
তুহি বর পাপিনী পাপ শুনাঅসি,
ধরম করাঅসি বাম।
পাতক ঘাতক ধাত্রি মোর চিন্তসি,
জাতিকুল করহ নির্নাম ॥

দুরন্ত দুরতি দূতীপনা দূর করু
চিন্তহ মোহোর কল্যাণ।
কাজী দৌলতে ভণে, দাতা মনোভব মনে
শ্রীযুত আশরফ খান॥

(খ)

শ্রাবণ মাসের বিরহ:

মালিনী কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর॥
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর।
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর॥
মদন-অসিক জিনি বিজলীর রেহা।
থরকএ যামিনী কম্পয় মোর দেহা॥
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল।
আন পুরুষ নহে লোর-সমতুল॥
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ।
কোথায় গোময়-কীট কোথায় মধুপ॥
গরল সদৃশ পরপুরুষের সঙ্গ।
দংশিয়া পলায় যেন এ কালভুজঙ্গ॥
তাহা সনে পালএ যে প্রেমের অঙ্কুর।
থির নহে জাতি পিরীতি দুহুঁ কুল॥
তেঞি ঋতু মানিএ আওএ লোর।
ন তু জীবন যে মরণ-সম মোর॥
তছু পএ সাজএ শাওন রস-আশ।
অবিরত কান্তা ন ছোড়ে কান্ত-পাশ॥
বিরহ পীড়ারি ধনী জয়পতি নাহা।
লস্কর নায়কমণি রসগুণ-গাহা॥

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

(১)

নদেরচাঁদ ও মহুয়া

কলসী করিয়া কাঙ্কে মহুয়া যায় জলে।
নত্থার চান ঘাটে গেল সেইনা সইন্ধা কালে ॥
"জলভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ ॥"
"শুন শুন ভিনদেশী কুমার বলি তোমার ঠাঁই।
কাইল বা কইছিলা কথা আমার মনে নাই ॥"
"নবীন যৈবন কইন্যা ভুলা তোমার মন।
এক রাতিরে এই কথাটা হইলা বিস্মরণ ॥"
"তুমি ত ভিনদেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি ॥"
"জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসিমুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥
কেবা তোমার মাতা কইন্যা কেবা তোমার পিতা।
এই দেশে আসিবার আগে পূর্বে ছিলা কোথা ॥"
"নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভসুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই ॥
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইরা মরি ॥
এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোনজন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা ॥
মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে করছ ঘর সুখেতে বান্ধিয়া ॥"
ঠাকুর বলে—"কইন্যা তোমার স্থানে বান্ধা হিয়া।"
মিছা কথা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া ॥"
"কঠিন তোমার পিতামাতা কঠিন তোমার প্রাণ।
এই যইবন তোমার যায় অকারণ ॥

কঠিন তোমার পিতা মাতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবনকালে নাহি দিছে বিয়া ॥"
"কঠিন আমার পিতা মাতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া ॥"
"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর ॥"
"কোথায় পাইবাম কলসী কন্যা কোথায় পাইবাম দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি ॥"

—মহুয়া গীতিকা

(২)

মলুয়ার বিদায়

ঘাটেতে আছিল বান্ধা মনপবনের নাও।
দুপুরিয়া কালে কন্যা নাওয়ে দিল পাও ॥
ঝলকে উঠে ভাঙা নাও সে পানি।
কতদূরে পাতাল পুরী আমি নাহি জানি ॥
উঠুক উঠুক আরো জল নায়ের বাতা বাইয়া।
বিনোদের ভগ্নী আইল জলের ঘাঠে ধাইয়া ॥
"শুন শুন বধূ ওগো কইয়া বুঝাই তরে।
ভাঙা নাও ছাইড়া তুমি আইস মোদের ঘরে ॥"
"না যাইব ঘরে আর শুনহে ননদিনী।
তোমার সবের মুখ দেইখ্যা ফাটিছে পরানী ॥
উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙা নাও।
জন্মের মত মলুয়ারে একবার দেইখ্যা যাও ॥"
দৌইড়া আইল শাশুড়ী আউলা মাথার কেশ।
বস্ত্র না সম্বরে মাও পাগলিনী বেশ ॥
"শুনগো পরাণ বধূ কইয়া বুঝাই তরে।
ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার ফিইরা আইস ঘরে

ভাঙা ঘরে চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরে বাতি।
তোমারে না ছাইড়া থাকিবাম এক দিবা রাতি ॥"
"উঠুম উঠুক উঠুক পানী ডুবুক ভাঙা নাও।
বিদায় দেও মা জননী ধরি তোমার পাও ॥"
ভাঙা নায়ে উঠল পানি করি কলকল।
পারে কান্দে হাউড়ী নাও অর্ধেক হইল তল ॥
একে একে দৌইড়া আইল গর্ভ সোদর ভাই।
জ্ঞাতি বন্ধু আইল যত লেখা জোখা নাই ॥
পঞ্চ ভাই যে ডাইক্যা কয় সোনা বইনের কাছে।
"ভাঙা নায়ে উইঠ্যা বইন কোন কার্য আছে ॥
বাপের বাড়ী যাইতে সোয়াদ কও সত্য করিয়া।
পঞ্চ ভাইয়ে লইয়া যাইব সোনার পানসী দিয়া ॥"
"না যাইবাম না যাইবাম ভাই আর সে বাপের বাড়ী।
ভাইয়ের কাছে বিদায় মাগে মলুয়া সুন্দরী ॥
উঠুক উঠুক উঠুক জল ডুবুক ভাঙা নাও।
মলুয়ারে রাইখ্যা তোমরা আপন ঘরে যাও ॥"
বাতা বইয়া উঠে পানি ডুবে ভাঙা নাও।
"দৌইড়া আস চান্দ বিনোদ দেখতে যদি চাও ॥"
দৌইড়া আইস্যা চান্দ বিনোদ নদীর পাড়ে খাড়া।
"এমন কইর‍্যা জলে ডুবে আমার নয়ন তারা ॥
চান্দ সুরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই।
জ্ঞাতিবন্ধু জনে আমি আর ত না চাই ॥
তুমি যদি ডুব কন্যা আমায় সঙ্গে নেও।
একটিবার মুখ চাইয়া প্রাণের বেদন কও ॥
ঘরে তুইল্যা লইবাম তোমায় সমাজে কাজ নাই।
জলে না ডুবিও কন্যা ধর্মের দোহাই ॥"

—মলুয়া গীতিকা

শাক্তপদাবলী

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টী কি মাটির বালা।
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে?
শুনেছি মার বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে?
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্রসূর্য আর হুতাশন,
কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে?
অশিব নাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালী?
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে॥

—রামপ্রসাদ সেন

২

কেবল আশার আসা ভবে আসা আসা মাত্র সার হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ও মা মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেল॥
মা খেলবি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতল।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো।
এবার সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে কোলে নিয়ে চলো॥

—রামপ্রসাদ সেন

৩

মা আমায় ঘুরাবে কত, কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত॥
মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা আমি কি ছাড়া জগত?

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥

—রামপ্রসাদ সেন

৪

আমি কি দুখেরে ডরাই ?
দুখে দুখে জনম গেল আর কত দুখ দেও দেখি তাই ॥
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই ॥

—রামপ্রসাদ সেন

৫

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জীবন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা ॥
কালীর নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মনরে আমার) শক্ত বেড়া
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না ॥
অদ্য অব্দ শতান্তে বা বাজাপ্ত হবে জান না
এখন আপন ভেবে (মনরে আমার) যতন করে
চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা ॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সেঁচনা।
ওরে একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা ॥

—রামপ্রসাদ সেন

৬

মজিল মোর মন ভ্রমরা, কালীপদ-নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
দেখ সুখ দুঃখ সমান হ'লো, আনন্দ সাগর উথলে॥
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এতদিনে
দেখ, পঞ্চতত্ত্ব প্রধানমত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

৭

দোষ কারো নয় গো মা
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড় রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ
পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ।
সে কূপ ব্যাপিল, কালরূপ জল, কাল মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণি ত্রিগুণধারিণি
বিগুণ করেছি স্বগুণে;
কিসে এ বারি নিবারি
ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে।
বারি ছিল চক্ষে ক্রমে এল বক্ষে
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে
তবে তরি, চরণ তরী দিলে ক্ষেমঙ্করি করি ক্ষমা॥

—দাশরথি রায়

৮

কালীপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তে ছিল,
কলুষের কু-বাতাস পেয়ে, গোঁত্তা খেয়ে পড়ে গেল
মায়া-কান্না হল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি,
দারা-সুত কলের দড়ি, ফাঁসি লেগে ফেঁসে গেল।

জ্ঞান-মুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে
মাথা নেই সে আর কি উড়ে ? সঙ্গের ছ'জন জয়ী হলো।
ভক্তিডোরে ছিল বাঁধা, খেলতে এসে লাগলো ধাঁধা
নরেশচন্দ্রের কাঁদা হাসা, না আসা এক ছিল ভাল

—নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

আগমনী

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে ?
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথা গেল হে
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু বদনে ॥
মনের তিমির নাশি উদয় হইল আসি
বিতরে অমৃত রাশি সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গিরি হে
ধৈরয না ধরে মম জীবনে ॥
আর শুন অসম্ভব—চারদিকে শিবারব হে,
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে ॥
কমলাকান্তের বাণী পুণ্যবতী গিরিরাণী গো,
যে রূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে।
ও পদপঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী গো
হর হৃদি-মাঝে রাখে অতি যতনে ॥

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

বিজয়া

১০

ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান ॥
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত,
আপনি হইয়ে হত বধ রে পরের প্রাণ ॥

প্রফুল্ল কমলবরে সচন্দন লয়ে করে,
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার চরণে করিব দান ॥
মোরে হৈয়ে শুভোদয় নাশ দিনমণি ভয়,
যেন না সহিতে হয় রে শিবের বচন বাণ ॥
হেরিয়ে তনয়া মুখ, পাসরিলাম সব দুঃখ
আজি সে কেমন সুখ হতেছে স্বপন জ্ঞান।
কমলাকান্তের বাণী শুন ওগো গিরিরানি
লুকায়ে রাখ না মাকে হৃদয়ে দিয়ে স্থান ॥

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

পাঁচালী

দাশরথি রায়

১

এক বিশ্ব-নিন্দুকের বিবরণ

বিশ্ব নিন্দুক একজন গিরিপুরে করি ভোজন
বিরাশি সিক্কার ওজন মতে।
এক মোট বস্ত্র বাঁধিয়ে ভৃত্যের মস্তকে দিয়ে
ব্যস্ত হয়ে গমন করেন পথে ॥
তারে দেখি যত্ন করে এক জন জিজ্ঞাসা করে
ভোজনের কেমন পারিপাট্য।
শুনলেম ভোজনের ভারি যশ দ্রব্য নাকি নানা রস
বস্ত্র নাকি করেছেন পট্ট ॥
বিশ্বনিন্দুক হেসে কয় তুমিও যেমন মহাশয়
তারি কর্মে তারপ—ও মোর দশা।
সংসারটা ভারি আঁটা মহা প্রেত সে গিরি বেটা
মিন্‌সে হতে মাগী দ্বিগুণ কসা ॥
করেছে একটা কর্ম সাড়া বামুনে দেন সোনার ঘড়া
লাক দুই তিন সেই বা কটা টাকা।
আঠার পোয়া করে ওজন গড়ে তাতে ক সের বা জল ধরে
স্বপ্‌ড়ো সোনা—তাই বা কোন পাকা ॥

বাহিরে চটক খরচ হাল্‌কি ভোজেও বেটার ভোজের ভেল্‌কি
যে খেয়েছে সেই পেয়েছে টের।
পাকী হল বড় মান্য পাক করেছেন পরমান্ন
আধ পোয়া চাল দুগ্ধ ষোল সের॥
ফলার করেছেন পাকা কলাগুলা তার আধ পাকা
একটা নাই মর্তমান সবগুলো কুলপুত।
তিন পোয়া বেড় করেছে লুচি না করিলে ত্রিশ কুচি
আহার করিতে নাই যুত॥
সন্দেশগুলো সব মিছরি পাকে তাতে কখন মিষ্টি থাকে
দ'লো না দিলে জলো হয়ে যায়।
চিনিগুলো সব ফুট সাদা খড়ি মিশান বুঝি আধা
এত ফরসা চিনি কোথায় পায়॥
মোণ্ডাগুলো সব ফাটা ফাটা ক্ষীর গুলো আটা আটা
খির কিচ বাধায় ক্ষীর খেতে।
সকল দ্রব্যই ফাঁকিতে কেনা ধেনো গরুর দুধের ছানা
বড় দুঃখ পেয়েছি পাত পেতে॥
দেখিলাম বেটার সকলি ফাঁকি বামুন বড় ষাটি লক্ষি
ইহার বাড়া হয় যদি কান কাটি।
সকলি বিষয়ে ন্যূনকল্প কেবল পাহাড়ে গল্প
মেটে জাঁকে ফেটে যাচ্ছে মাটি॥

—শিববিবাহ

২

স্বভাবগুণ

খলের স্বভাব অন্তরে বিষ, মুখে বলে মিষ্টি।
লোভীর স্বভাব চিরকাল পরদ্রব্যে দৃষ্টি॥
মানীর স্বভাব, নিজ দুঃখের কথা পরে কন না।
অভিমানী লোকের স্বভাব, তুচ্ছ কথায় কান্না॥
নারীর স্বভাব গুপ্তকথা পেটে রাখা দায়।
ডাইনের স্বভাব ছেলে দেখলে ঘন দৃষ্ট চায়॥

দাতার স্বভাব 'নাই' বাক্য নাহি মুখে।
হিংস্রকের স্বভাব পর সুখে মরে মনোদুঃখে॥
কৃপণের স্বভাব ক্ষুদ্র দৃষ্টি খুদটি ধরে টানে।
বালকের স্বভাব খাদ্য দ্রব্য দেবতারে না মানে॥
বাতুলের স্বভাব মিছে কথায় চারিদণ্ড বকে।
বৈদ্যের স্বভাব কিছু কিছু অহঙ্কার রাখে॥
জলের স্বভাব নীচবিনে উর্ধ্বগামী হয় না।
পাষাণের স্বভাব শরীরে কভু দয়ামায়া রয় না॥

—আগমনী (১)

৩

চুপে চুপে কর্ম করার দোষ

দেখ চুপে চুপে রাবণ করল রামের সীতা হরণ।
একেবারে হইল তার সবংশে মরণ॥
চুপে চুপে ইন্দ্র গিয়া গৌতমের স্ত্রী হরে।
সহস্র লোচন হইল কত দুঃখের পরে॥
চুপে চুপে চন্দ্র হতে বুধ ঠাকুরের জন্ম।
দেশ জুড়ে কলঙ্ক হইল করিয়া কুকর্ম॥
চুপে চুপে রামের ফল খেয়ে হনুমান।
গলায় আঁটি লেগে রইল যায় যায় প্রাণ॥
চুপে চুপে অনিরুদ্ধ ঊষা হরণ করে।
বন্ধন দশায় ছিলেন পড়ে বানের কারাগারে॥
চুপে চুপে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কেটে।
অশ্বথামা অপমান হইল অর্জুন নিকটে॥
চুপে চুপে রঘুনাথ বালি রাজারে বধে।
নিজ বধের বর শেষে দিলেন অঙ্গদে॥
চুপে চুপে সূর্যদেবে দিয়া আলিঙ্গন।
কুন্তী দেবী দিয়াছেন পুত্রবিসর্জন॥
চুপে চুপে রাবণের মূর্তি লিখে ভূমে।
জানকী গেলেন বনে বঞ্চিত হয়ে রামে॥

চুপে চুপে কচ গেলেন বিদ্যা শিক্ষা করতে।
মেরে তার মাংস খেল মিলি সব দৈত্যে ॥
চুপি চুপি কোম্পানীর নোট জাল করে।
রাজ কিশোর দত্ত জন্মাবধি গেলেন জিঞ্জিরে ॥
চুপে চুপে প্রতাপচন্দ্র রাজ্য ছেড়ে গিয়ে।
শেষে আর দখল পান না আছেন ভেকো হয়ে ॥

—বামন ভিক্ষা

কবিগান

১

অক্রূর সংবাদ

মহড়া। একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত
কে আনিল রথ গোকুলে।
রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে ॥
অক্রুর সহিত কৃষ্ণ কেন রথে
বুঝি মথুরাতে চলিলে।
রাধারে চরণে ত্যজিলে
রাধানাথ কি দোষ রাধার পাইলে ॥

খাদ। শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্যভাব শুন হে মাধব
তোমার প্রেমের প্রয়াসী ॥

১ চিতেন। নিশাভাগ নিশি যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপী সকলে ॥

পড়েন। দিয়ে বিসর্জন কুলশীলে ॥

ফুঁকা। এতেই হলাম দোষী তাই তোমায় জিজ্ঞাসি,

মেলতা। এই দোষে কি হে ত্যজিলে ॥

অন্তরা। শ্যাম যাও মধুপুরী নিষেধ না করি
থাক হরি যথা সুখ পাও।
একবার হাস্য বদনে বঙ্কিম নয়নে
ব্রজ গোপীর পানে ফিরে চাও ॥

২ চিতেন। জনমের মত শ্রীচরণ দুখানি
হেরিছে নয়নে শ্রীহরি।

পড়েন। আর হেরিব আশা না করি ॥

ফুঁকা। হৃদয়ের ধন তুমি গোপীকার,

মেলতা। হৃদে বজ্র হানি চলিলে ॥

—হরু ঠাকুর

২

বিরহ

মহড়া। সখি এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয় ॥
সুহৃদ-ভঞ্জন, লোক গঞ্জন
কলঙ্ক ভাজন হ'তে হয় ॥

১ চিতেন। এমন পীরিতি করি যাতে তরি, দুদিক।
ঐহিক আর পারত্রিক।
শ্রীনন্দ-নন্দন দুঃখ রঞ্জন,
সদা রাখি মন তাঁরি পায়।

অন্তরা। অমিয় ত্যজে, গরলে মজে, উপজে কি সুখ।
কলঙ্ক ঘোষণা জগতে, মরণ হতে অধিক ॥

২ চিতেন। হৃদয় মন্দির মাঝে, রসরাজে বসায়ে,
দেখিব আঁখি মুদিয়ে ॥
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে
কলঙ্ক বিচ্ছেদ নাহি ভয় ॥

৩ চিতেন ধ্বজ বজ্রাংকুশ পদ সে নীরদ হইতে
জাহ্নবী হলেন যাহাতে।
সেই কৃপা জলে মন ডুবালে
কালেরে করিব পরাজয় ॥

অন্তরা। কমলজ জন সেবিত ধন অরুণ চরণ।
মনের তিমির বিনাশে পাইলে কিরণ ॥
৪ চিতেন। হৃদে আছে শতদল সে কমল লুটিবে।
প্রেম পীযূষ ঘটিবে ॥
মনোমধুব্রত হ'য়ে যেন রত সেই নামামৃত সুধা খায়।
অন্তরা। অমিয় আর গরল দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে।
নয়ন দিয়েছেন বিধাতা দেখিয়ে ভক্ষিতে ॥
ত্যজিবে সে সুধা রস কেন বিষ ভক্ষিবো।
কলুষ-কূপে ডুবিব ॥
থাকিতে নয়ন অন্ধ যেই জন
পেয়ে প্রেমধন সে হারায় ॥

—রাম বসু

বাউল গান

১

এ দেশেতে এই সুখ হোলো আবার কোথা যাই না জানি।
পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি ॥
কার বা আমি কে বা আমার,
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার,
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি ॥
আর কিরে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়াল চাঁদের দয়া হবে,
কতদিন এই হালে যাবে
বহিয়ে পাপের তরণী ॥
কার দোষ দিব এ ভুবনে,
হীন হয়েছি ভজন গুণে,
লালন বলে কতদিনে
পাব সাঁইএর চরণ দুখানি ॥

—লালন ফকির

২

কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে।
দেখ সে আপনি বাজায় আপনি মজে সেই রবে॥
নামটি না-শরিকালা
সবার শরিক সেই একেলা
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা
আপনি খাবি যায় ডুবে॥
ত্রি জগতে যে বায় রাঞা
তার দেখি ঘর মনে ভাঙা
হায়রে মজার আজব রঙা
দেখায় ধনি কেনে ভাবে।
আপনে চোরা আপন বাড়ী
আপনে সে লয় আপন বেড়ী
লালন বলে এ লাচাড়ি
কই না, আজি চুপে চাপে॥

—লালন ফকির

৩

কথা কয়রে
দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনমভর মেলে না॥
খুঁজি তারে আসমান জমি
আমারে চিনিনে আমি
একি বিষম ভুলে ভ্রমি—
আমি কোন্ জন সে কোন্ জনা
রাম রহিম সে কোন জন,
মাটি কি পবন জল কি হুতাশন,
শুধাইলে তার অন্বেষ।
মূর্খ দেখে কেউ বলে না॥

হাতের কাছে হয়না খবর,
কি দেখতে যাও দিল্লী লাহোর,
সিরজসাঁই কয়, লালনরে তোর
সদায় মনের ভ্রম যায় না ॥

—লালন ফকির

৪

সে বড় আজব কুদরতি।
আঠার মোকামের মাঝে
ওর জলছে একাই রূপের বাতি।
কে বোঝে কুদরতি খেলা—
জলের মধ্যে অগ্নিজালা
জানতে হয় সেই নিরালা
ওরে নীরেক্ষীরে আছেন জ্যোতি।
চুনিমণি লাল জহরা
সেই বাতি রয়েছে ঘেরা
তিন সময় তিন যোগ সে ধরে
যে জানে সে মহারতি ॥
থাকতে বাতি উজলময়,
দেখনা যার বাসনা হৃদয়
লালন বলে, কখন কোন সময়
ওর অন্ধকার হয় বসতি ॥

—লালন ফকির

৫

অনুরাগে গাছ কাটলেই কি গাছি হওয়া যায়।
ও যে ঘোলা রসে বীজ মরে না,
গাছি রাগ করে রস ঢেলে ফেলায় ॥
প্রেমের গাছি হয় যেজন
ও সে মনদড়া দিয়ে গাছ করে বন্ধন ;

তীক্ষ্ণ দায়ে
হৃদয় ভেদিয়ে
ফটিক রসের বহায় প্লাবন।
ও সে মনের সুখে রস জ্বালায়ে মিছরি বানায়॥
অধম যাদুবিন্দু কয়, কুবীর গোঁসাই সে রস পায়।
আমার ভাঁড়ের ঘোলা রস যে
ওঠে গেঁজে
ও সে রসে বীজ মরে না, মিছরি হয়না,
ঘুটতে ঘুঁটতে জীবন যায়॥

—যাদুবিন্দু

শব্দসূচী

অঘাসুর ১০৭
অচমিয়া, অহমিয়া ৬
অতিথি (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ২১১
অতীন্দ্রিয়বাদ ২১৫
অতুনা (গোবিন্দচন্দ্রের গান) ১৩৫
অদ্ভুতাচার্য ৮৫
অদ্বৈত আচার্য ৯৬, ১০১
অদ্বৈতপ্রকাশ—ঈশান নাগর ১০১
অদ্বৈতমঙ্গল—হরিচরণ দাস ১০১
অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস (বড়ু চণ্ডীদাস দ্র) ৭
অনার্য জাতি ১৪, ৬০, ১২৯
অনার্য-মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ১২০
অনার্য-সংস্কৃতি ১২১
অনিরুদ্ধ (পৌরাণিক চরিত্র) ৫১
অনিরুদ্ধ (মহাভারতকার) ১৮৬
অন্তঃস্থ ধ্বনি ৬
অন্নদা ৮০, ১৬৭, ১৬৯, ১৭২, ১৮২
অন্নদা-পূজা ১৭০
অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র ৬১, ১২২, ১৬৭-১৭৩, ১৮২, ১৮৬
অন্নদামঙ্গল-এর তিনটি খণ্ড ১৬৭
অন্নদা-মহিমা ১৭০
অন্নদা-মূর্তির বিবর্তন ১৬৯
অন্নপূর্ণা ১৬৭, ১৭০-১৭৩, ১৭৫; ১৮৭ ১৮৮, ১৯০; অন্নপূর্ণা কর্তৃক ব্যাসের ছলনা ১৭১; অন্নপূর্ণা পরিকল্পনা ১৭০; অন্নপূর্ণা-মন্দির-প্রতিষ্ঠা, কাশীতে ১৭৩; অন্নপূর্ণা-মূর্তিতে নব আবির্ভাব ১৭০; অন্নপূর্ণা-রূপকল্পনা ১৭৩
অন্নপূর্ণামঙ্গল-মানসিংহ (অন্নদামঙ্গল) ১৬৭
অপদেশ-প্রবাহ ১৭
অপভ্রংশ ৫, ৬, ৮, ১৩, ২৩, ৪৪, ৪৫
অপভ্রংশ-রচনাবলী ১৩
অপিনিধান, অপিনিহিতি ৮
অপিনিহিত স্বরধ্বনি ১০
অপূর্ব কথন—ভবানী দাস ১৩৯
অবহট্ট ৯, ১৩, ২৩, ২৫, ২৬, ৩০, ৪৪, ৪৮; অবহট্ট-মিশ্রিত ব্রজবুলি ৪৪; অবহট্ট-রচনাবলী ১৩
অভয়া ৮০, ১৬৭
অভয়ামঙ্গল—দ্বিজ রামদেব ৮০
অভিনন্দ ১৬
অভিশ্রুত স্বরধ্বনি [Umlaut] ১০
অভিসার (বৈষ্ণব-পদাবলী) ৪৬, ১২৭
অমরকোষ ৭
অমর প্রবাহ (সদুক্তিকর্ণামৃত) ১৭
অমিত (শেষের কবিতা) ২১২
অমিত্রাক্ষর ছন্দ ২০৩
অমিশ্র পয়ার ছন্দের উদ্ভব ৮
অর্ধতৎসম শব্দ ১১
অর্ধমাগধী প্রাকৃত ৪, ৫
অর্ধমাগধীয় (ভাষা) ৪
অলঙ্কার-গ্রন্থ ১১০
অলঙ্কার, হিন্দু ১৫৫
অল্পপ্রাণ ধ্বনি, সন্নিকৃষ্ট ১০
অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন-ধ্বনি ৫
অষ্টমহাগণতত্ত্ব—পিঙ্গলাচার্য ১৫৫
অসমীয়া ১, ৭
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ২৫
অস্টেন, জেন ১৯১
অস্ট্রিক জাতি ১, ৩
অস্ট্রেলিয়া ১
অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের উপভাষা ১২
অহমীয়া, অচমীয়া ৬

আইভানহো (চরিত্র) ২০৫
আইভানহো—স্কট ২০৪
আইহন-পত্নী ৪০
আউলচাঁদ ১৩০
আক্ষেপানুরাগ ১১৫
আগমনী গান ১২৩, ১২৭, ১২৮
আদিখণ্ড (চৈতন্যচরিতামৃত) ১০৩
আদি মঙ্গলকাব্য ১৮৮
আদিযুগ, বাংলাভাষার ৮
আদিরস, বিদ্যাসুন্দরে ১৭৬
আদিস্বর-লোপ ৮
আধুনিক বাংলাসাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ১৯৫
আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র ২০৫, ২০৬
আন্ধা বন্ধু (গীতিকা) ১২৬

আবদুল সুকুর মহম্মদ ১৩৫, ১৩৯, ১৪০
আমেরিকা ১২
আয়না বিবি (গীতিকা) ১৬৪
আয়রজ সুত্ত ৪
আয়ুর্বেদ ১৪৭
আয়ুর্বেদ-চিকিৎসাশাস্ত্র ১৫৫
আরবী ৭, ১০, ১১, ১৪৪, ১৫৬
আরাকান ১৪২ ; আরাকান-রাজ ১৪৩, ১৪৬ ; আরাকান-রাজবংশ ১৪৩ ; আরাকান-রাজসভা ১৪৩ ; আরাকান রাজ্য ১৪৩, ১৪৬ ; আরাকানের বৌদ্ধ রাজগণ ১৪৩ ; আরাকানের মুসলমান কবিগোষ্ঠী ১৪২
আর্য ৬০ ; আর্যগণ ১ ; আর্য-দিগ্বিজয়ী ও উপনিবেশ-স্থাপনকারিগণ ৩ ; আর্যধর্ম ৫১, ৫২, ১২০ ; আর্য-প্রভাবের তিনটি ধারা ৩ ; আর্যভাষা (উদীচ্য) ৩, ১০, ১১ ; আর্য-ভাষা, তৃতীয় ও শেষ প্রবাহ ৫ ; আর্যভাষা, নব্যভারতীয় ১ ; আর্যভাষা, মধ্য-ভারতীয় ৪ ; আর্য-সংস্কৃতি ৪, ৫১
আর্যসপ্তশতী—গোবর্ধন আচার্য ২১
আলাউদ্দিন, আলাউদ্দিন খলজি, সম্রাট ১৫৪, ১৮৩
আলাওল ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ৫৫৬
আলিবর্দি ১৮৩, ১৮৪
আশরফ খাঁ, লস্কর-উজির ১৪৪, ১৪৫
আশুতোষ দাস, ডঃ ৮০
আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ ৭০, ৭৩
আশ্চর্যচর্যাচয় ৩১
আসাম ৩৫, ৪৪

ইউরোপ ১১, ২০৬
ইউরোপীয় দার্শনিক তত্ত্ব ২০৯
ইউলিসিস (ইলিয়াড) ২০৩
ইংরাজ-রাজত্ব-প্রতিষ্ঠা ১৯৫
ইংরাজী ভাষা ১১
ইংলণ্ড ১৮১, ২০৯
ইছাই ঘোষ ৬৫, ৬৬, ৭৬
ইন্দ্রাণী পরগনা (বর্ধমান) ৮৬
ইয়ংবেঙ্গল ১৯৬
ইরানীয় শব্দ, প্রাচীন ১১
ইলিয়াড ২০০, ২০২, ২০৩
ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ১৪৪

ঈশান নাগর ১০১
ঈশ্বর গুপ্ত ২৭
ঈশ্বরপুরী, শ্রী ৯৪
ঈশ্বরী পাটনী ১৭২-১৭৪, ১৮৭

উগ্রচণ্ডী দেবী ৬৯
উচ্চাবচ প্রবাহ ১৭, ২০
উজ্জ্বলনীলমণি—রূপ গোস্বামী ১১০
উড়িষ্যা ৩৫, ৪৪
উত্তরবঙ্গের কথ্যভাষা ১২
উদীচ্য (আর্যভাষা) ৩
উদ্ধব ১০৭
উপজাতীয় উপভাষা ১
উপনিষদ ১৫, ৩১, ৬১, ৯৮, ১৩৪
উপভাষা ১, ৯, ১৩
উপভাষা, পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ৩৯
উমা ১২৩, ১৭০
উমাপতি ধর ১৭, ২১
উমাপতি মিশ্র ৯
উমিচাঁদ ১৮৩, ১৮৪
উর্দু ১৪৪

ঋগ্‌বেদ ১২০
ঋণাত্মক (বিদেশী) শব্দ ১১

একচক্রা, একচাকা ৩
একাবলী ছন্দ ৮
এনটনি ফিরিঙ্গী ১৩১
এনামুল হক, ডঃ ১৩৭
এলিজাবেথীয় যুগ ১৭৯

ঐতরেয় আরণ্যক ৩

ওড়িয়া ভাষা ১, ৬, ৭
ওয়াজিদ আলি শাহ্, নবাব ২২
ওলন্দাজ ভাষা ১১

কংস ১২২
কংসবধ ১০৭
কঙ্ক ও লীলা (ময়মনসিংহ-গীতিকা) ১৬১
কচ ও দেবযানী (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ২০৯
কণ্‌হ গোআল ২৫
কদলীনগর ১৩৬

কদলীপত্তন ১৩৪, ১৩৬
কদলীরাণী ১৩৮
কবিকঙ্কণ খেতাব ৬২
কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ১১৯
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ৮, ২৭, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৭৮-৮০ ১১৯, ১৭৪, ১৮১, ১৮৭, ১৮৯
কবি কর্ণপুর ৯৯, ১০০
কবিগান ১৩১, ১৩২
কবিগানের তিনটি স্তর ১৩১
কবিশেখর (শেখর রায়) ১১৩
কবিরঞ্জন (বাঙালী বিদ্যাপতি) ৪৮, ১১৩
কবীন্দ্র দাস ১৩৫
কবীন্দ্র পরমেশ্বর ৮৫, ৮৬
কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় (সুভাষিতরত্নকোষ) ১৬
কমলাকান্ত (শাক্তপদকর্তা) ১২৩
কমলাকান্তের দপ্তর—বঙ্কিমচন্দ্র ২০৮
কমলারাণীর গান (গীতিকা) ১৬৪
করুণ রস ১৯৯, ২০৩
করুণা (চর্যাপদ) ৩১
কর্ণসেন ৬৬
কর্ণাট ২৫
কর্তভজা গান ১২৯
কর্তভজা (পাঁচালি) ১৩২
কর্পূর (লাউসেনের ভ্রাতা) ৬৮
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৩
কলিকাতার কথ্যভাষা ১২
কলিঙ্গ ৬৫ ; কলিঙ্গরাজ ৬৫, ৭৫ ; কলিঙ্গরাজ্য ৫৯, ৮০ ; কলিঙ্গরাজ্য-প্লাবন ৮০ ; কলিঙ্গা ৬৬, ৭৬
কাজি দৌলত, কবি ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৫২, ১৫৩
কাজির দুরবস্থা (মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল) ১৭২
কাজির দুর্দশা (মনসামঙ্গল) ৫৮
কাটোয়া ৯৫
কাঁদরা (বর্ধমান) ১১৪
কাদম্বরী ১৪
কানাড়া ৬৬, ৭৬
কানা হরি দত্ত ৫৩, ৭০, ৭১
কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মার তাম্রশাসন ১৪
কায়সাধনা ১৩১, ১৪০, ১৮৬ ; কায়াসাধনা ১৩৭, ১৯১
কালকেতু ৫১, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৬৫, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ১৭১, ১৮৭, ১৮৯
কালকেতু-উপাখ্যান ৫৯, ৭৫
কালকেতুর নগরপত্তন-পালা ৬৩
কালকেতুর নগর-প্রতিষ্ঠা ৭৫
কালনাগিনী ৭৫
কার্লাইল ২১৫
কালিকা, কালিকাদেবী ১৬৭, ১৭২, ১৮৯, ১৯০
কালিকামঙ্গল (অন্নদামঙ্গল) ১৬৭
কালিদাস, কবি ২২, ৪৬
কাজী ৪৫, ১২১-১২৩, ১৭০, ১৯৪
কালু ডোম ৬৬, ৭৬, ৭৭
কাশী ১৬৮, ১৭০, ১৭৩, ১৮৭
কাশীখণ্ড ১৭০
কাশীদাসী মহাভারত ৮৬, ৮৮
কাশীরাম দাস ৮, ৮৬-৮৮, ৯০, ৯১' ১০৬
কাহিনী-কাব্য ৫০
কাহ্নপাদ ৩২
কীর্তিপতাকা—বিদ্যাপতি ৯, ৩০, ৪৫
কীর্তিবিলাস (নাটক)—যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ১৯৭
কীর্তিলতা—বিদ্যাপতি ৯, ৩০, ৪৫
কুক্কুরীপাদ ৩২
কুচবিহার (কোচবিহার) ১৩৪
কুন্তী ৮৯
কুবীরচাঁদ, বাউল ১৩০
কুমুদরঞ্জন (মল্লিক), কবি ২
কুমুদিনী (যোগাযোগ) ২১২
কুম্ভকযোগ ৩৩
কুরু ২৪
কুরুক্ষেত্র ১০৫
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ৮৬, ৯০
কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধবৃত্তান্ত ২০১
কুলীনকুলসর্বস্ব (নাটক)—রামনারায়ণ ১৯৭
কৃচ্ছ্র কায় সাধন ৪
কৃত্তিবাস, কৃত্তিবাস ওঝা ৮, ১৬, ৩৯, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৯০, ৯১, ১০৬, ২০১
কৃত্তিবাসী রামায়ণ ৩৯, ৮৩-৮৬, ৮৮
কৃষ্ণ ; শ্রীকৃষ্ণ ১৫-১৭, ১৯, ২০, ২৩-২৫, ২৮, ৪০, ৪১, ৪৭, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৫-৯৮, ১০২, ১০৭, ১১০, ১১৩, ১১৪, ১১৬, কৃষ্ণ-তত্ত্ব ১০৬ ; কৃষ্ণ-শ্যাম-রূপ ১১৫ ;

কৃষ্ণ-প্রেমলীলা-কাহিনী ১০৫ ; কৃষ্ণ-বলরাম ৯৬ ; কৃষ্ণ-বিষয়ক পালা (পাঁচালি) ১৩২ ; কৃষ্ণমঙ্গল ৮২, ৯৭ ; কৃষ্ণলীলা ১৪, ২৪, ৮৬, ৮৭, ৯৭, ১০০, ১০২, ১০৬, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৬ ; কৃষ্ণলীলা, মহাভারতীয় ৮৭ ; কৃষ্ণের মথুরাগমন ১০৭
কৃষ্ণকান্তের উইল—বঙ্কিমচন্দ্র ২০৭
কৃষ্ণকুমারী (নাটক)—মধুসূদন ১৯৮
কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা (নদীয়ার মহারাজা) ১২২ ১৬৭, ১৬৮, ১৭৮, ১৮২, ১৯৪
কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা ১৭৮
কৃষ্ণচৈতন্য, শ্রী ৯৪
কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৯৫-৯৭, ৯৯, ১০১, ১০৪-১০৮
কৃষ্ণনগর ১৯৪
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী – রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ৯৭
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ৭২
কেনারাম ডাকাত ১৬৪
কেশব ভারতী ৯৪
কেশব সেন (সেন-রাজবংশীয়) ১৭
কৈলাস বসু ৮৫
কোল-গোষ্ঠী ১, ৩, ৫
কোষগ্রন্থকার-গোষ্ঠী, পাশ্চাত্ত্য ১৮০
কৌরব ৯০, ২০২
কৌরব-পাণ্ডব ২০২
কৌষিকী ১৭০
ক্লাইব ১৮৪, ১৯২
ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি ১১৫
ক্ষুধিত পাষাণ (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ২১১
ক্ষীরোদপ্রসাদ ১২৩, ১৯৮

খণ্ড কবিতা ২১, ১১০
খণ্ডকাব্য ১৫
খণ্ডিতা নায়িকা ১৪৮
খুলনা ১২
খুল্লনা ৫৯, ৭৭ ৭৮
খৃষ্টানধর্ম ১৯৬
খৃষ্টান-মিশনারীদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ ১৯৫
খেতুরি বৈষ্ণব-সম্মেলন ১১৪

গঙ্গা ২৬, ৪৫, ৭৮, ৮০, ১০৯, ১৭১ ; গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম ২৬ ; গঙ্গা-স্তুতি ৪৫
গঙ্গাদাস (ছন্দোমঞ্জরী-প্রণেতা) ২৫
গঙ্গাদাস (মহাভারতকার) ৮৬
গঙ্গা-দুর্গার সপত্নী-কোন্দল ৭৮
গঙ্গারাম, বাউল ১৩০
গঙ্গারাম (মহারাষ্ট্র-পুরাণ-প্রণেতা) ১৯১-১৯৩
গজলক্ষ্মী ৭৫
গড় মান্দারণ ২০৫
গণদেবতাত্রয় ৫২
গণেশ-বন্দনা (দেবখণ্ড, অন্নদামঙ্গল) ১৭০
গদাধর পণ্ডিত ৯৬
গয়াধাম ৯৪
গাজী-বিজয়—শেখ ফয়জুল্লা ১৩৭
গাথা, গাথাকাব্য ১৫৭-১৫৯
গাথাসপ্তশতী—হাল ২৪, ৩৭
গান্ধারী ৮৯
গান্ধারীর আবেদন—রবীন্দ্রনাথ ২০৯
গালিভার ১২৭
গালিভারস্ ট্র্যাভেলস্ ১২৭
গিরিশচন্দ্র (ঘোষ, নাট্যকার) ১২৩, ১৯৮
গীতগোবিন্দ—জয়দেব ১৫, ১৭, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৮ ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৪, ৯২
গীতা ৬১, ১০৫
গীতিকবিতা ৯৭, ১১৬, ১২০, ১২৬, ১২৭, ১৭৬, ১৯০
গীতিকা ১৫৭, ১৫৯, ১৬৬
গীতিকাব্য ১৭
গুজরাট ৭৬
গুণরাজখাঁ খেতাব ৬২
গুণরাজখান মালাধর বসু ৮, ৩৯, ৯৭, ১০৬, ১০৮
গুপ্তরাজবংশের সমকালীন লিপি ১৪
গুরুবাদ ১৩১
গুরুসত্য-গান ১২৯
গুহক চণ্ডাল ৮৮
গোদা, মাছ-মারা (মনসামঙ্গল) ৭৫, ৭৬
গোপালবিজয়—দেবকীনন্দন সিংহ ৯৭
গোপীচন্দ্র ১৩৫, ১৩৯, ১৪০
গোপীচন্দ্র-আখ্যান ১৩৯
গোপীচন্দ্র-নাটক ১৩৯
গোপীচন্দ্র-পালা ১৩৮
গোপীচন্দ্রের গান (বা ময়নামতীর গান) ১৪০
গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস (বা ময়নামতীর গান) ১৩৯
গোপীচাঁদ ১৪০
গোবর্ধন, গোবর্ধন আচার্য ১৭, ২১

গোবিন্দ ঘোষ ১১১, ১১২
গোবিন্দচন্দ্র, রাজা ১৩৫, ১৪০
গোবিন্দচন্দ্রের গান (বা ময়নামতীর গান) ১৩৪
গোবিন্দচন্দ্রের গীত—দুর্লভ মল্লিক ১৩৯
গোবিন্দদাস ১০১, ১১৩, ১১৫
গোবিন্দদাস কবিরাজ ৯
গোবিন্দদাসের কড়চা ১০১
গোবিন্দমঙ্গল—দুঃখী শ্যামদাস ৯৭
গোবিন্দরাম (ধর্মমঙ্গল-এর কবি) ৬৮
গোবিন্দলাল (কৃষ্ণকান্তের উইল) ২০৭
গোরক্ষবিজয় ১৩৭, ১৩৮
গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর গান ১৮৬
গোরক্ষবিজয়—বিদ্যাপতি ১৩৭
গোরা (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ২১২
গোরা (চৈতন্যদেব) ১০৫
গোল্‌ড্‌স্মিথ ১৭৯
গোহারি-রাজপুর ১৪৮
গৌড় ১, ৮৩, ১৪৩
গৌড়ী ৬
গৌড়ীয় ২৬
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ৯৫
গৌড়েশ্বর ৬৫, ৬৭, ৮৩
গৌর ৯৬ ; গৌরচন্দ্রিকা ১১১ ; গৌর-নিতাই ৯৬ ; গৌরলীলা ১১১
গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গদেব ৯৩, ৯৮ ১০৩, ১১১, ১১৩ : গৌরাঙ্গ-জীবনী ১১২ ; গৌরাঙ্গ-নাগরলীলা ১১২ ; গৌরাঙ্গ-নাগরীভাব ১০৩ ; গৌরাঙ্গদেবের লীলা-মাধুরী ১১২ : গৌরাঙ্গলীলা ৯৩, ১১০, ১১২ ; গৌরাঙ্গের বাল্য-লীলা ১১২
গৌরী ১৭, ৫৫, ৮১, ১৭০
গ্রন্থরচনার কারণ-বর্ণনা (মঙ্গলকাব্য) ৫০
গ্রীক-ট্রোজানের যুদ্ধবৃত্তান্ত ২০১
গ্রীক নাট্যাদর্শ ১৯৮
গ্রীক বীরকুল ২০২
গ্রীক শব্দ (বাংলা ভাষায়) ১১
গ্রীস ২০০

ঘনরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী ৮, ৬৮
ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ ১১৫
ঘরে বাইরে (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ২১২

চট্টগ্রাম ১২, ৮০, ৮৬, ১৪৩, ১৪৪
চট্টগ্রাম-বিজয় ১৪৩
চট্টগ্রামের কথ্যভাষা ১২
চণ্ডী, চণ্ডীদেবী ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৭২, ৭৬-৮১, ১২১, ১৬৯, ১৭২, ১৮৭, ১৮৮
চণ্ডী, কবিকঙ্কণ—মুকুন্দরাম ৮, ১১৯
চণ্ডী, মার্কণ্ডেয় ১২১
চণ্ডীদাস ৯, ৩৭, ৪৬, ৮৪, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬
চণ্ডীদাস, অনন্ত বড়ু ৭
চণ্ডীদাস, দীন ১১৬
চণ্ডীদাস, বড়ু ৭, ১৩, ১৪, ২০, ২৫, ২৮, ২৯, ৩৭, ৩৯-৪৩, ৪৫, ৪৬, ৯২, ১১০
চণ্ডী-পূজা ১২১
চণ্ডীমঙ্গল ৮, ৫০, ৫১, ৫৬, ৬৫, ৬৬, ৬৯, ৭৫-৮০, ৯৭, ১০০, ১২১, ১৬৭, ১৬৯
চণ্ডীমঙ্গল—কবিকঙ্কণ ৮, ১১৯
চণ্ডীমঙ্গল—দ্বিজ মাধব ৬৫
চণ্ডীর উদ্ভব-রহস্য ৫৪
চতুর্দশপদী কবিতাবলী—মধুসূদন ১৯৮-১৯৯, ২০৩
চতুষ্পদী পয়ার ছন্দ ৮
চন্দ্রশেখর (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র ২০৫
চন্দ্রশেখর (বৈষ্ণব-পদকর্তা) ১১৫
চন্দ্রাণী (সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী) —কাজি দৌলত ১৪৮, ১৪৯, ১৫২
চন্দ্রাবতী (ময়মনসিংহের মহিলা-কবি) ৮৫
চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষা ১২
চম্পতি রায় (বৈষ্ণব-পদকর্তা) ৪৮
চর্যা ৩১, ৩২
চর্যাকারগণ ৩২, ৩৪-৩৬
চর্যাগীতি ৮
চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ৩১
চর্যাপদ ১৩, ২৬, ২৯-৩৭, ৩৯, ৪২, ১১৬, ১২৯, ১৩৪, ১৩৬, ১৮৬
চর্যাপদকর্তা ৩১
চর্যাপদাবলী ৩১, ১২৯
চর্যাপদের তিব্বতীয় অনুবাদ ৩২
চসার, কবি ২৫
চাটু-প্রবাহ (সদুক্তিকর্ণামৃত) ১৭
চাণূর-বধ ২৯

চাঁদ, চাঁদ সদাগর ৬৯, ৭১-৭৭
চান্দবিনোদ ১৫৮
চার অধ্যায় (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ২১২
চিকন গোয়ালিনী ১৫৮
চিত্রাঙ্গদা—রবীন্দ্রনাথ ২০৯
চিত্রাঙ্গদা (মহাভারত) ৮৯
চীনা ভাষা ১১, ১২
চীনা শব্দ, বাংলা ভাষায় ১২
চেঙ্গিস খাঁ ১৯২
চৈতন্যচন্দ্রোদয় (নাটক)—কবি কর্ণপুর ৯৯
চৈতন্যচরিতামৃত (চৈতন্য-জীবনী)—কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৯৫, ৯৬, ৯৯, ১০১, ১০৪
চৈতন্যচরিতামৃত (মহাকাব্য)—কবি কর্ণপুর ৯৯
চৈতন্যদেব ; চৈতন্য, শ্রী ২৩, ৩৯, ৪৩, ৪৭-৪৯, ৬১, ৬২, ৬৯, ৮৪, ৮৫, ৮৮, ৯১-৯৫, ৯৭-১০৬, ১০৮, ১১০-১১২, ১৯৩, ২০১ ; চৈতন্য-গোষ্ঠী ৮৪ ; চৈতন্য-জীবন ১০০ ; চৈতন্য-জীবনী ৪৯, ৯৫, ১০০, ১০৬ ; চৈতন্য-জীবনীকারগণ ৯৮, ৯৯, ১০১, ১১৩ ; চৈতন্য-জীবনী-সাহিত্য ৮ ; চৈতন্যতত্ত্ব ১০৪-১০৬ ; চৈতন্যতত্ত্ব-ব্যাখ্যা ৯৬ ; চৈতন্যধর্ম ১৫, ৬৯, ৯২, ৯৬, ১০৬, ২০১ ; চৈতন্যধর্মতত্ত্ব ৪৭, ১০০ ; চৈতন্য-পরবর্তী যুগ ৪৩ ; চৈতন্য-পূর্ব যুগ ৩১, ৯৮, ১০৬ ; চৈতন্য-পূর্ব যুগের ভক্তিবাদ ৯৮ ; চৈতন্য-প্রেমতত্ত্ব ৯৯ ; চৈতন্য-প্রেমধর্ম ১৮, ৬৯, ৮৫, ৯৬ ; চৈতন্য-যুগ ২৪, ৯৩, ৯৭, ১০৬ ; চৈতন্য-লীলা ২৪, ৯১, ৯৬, ৯৭, ১০০-১০৫, ১০৮, ১১০, ১১২, ১২৭ ; চৈতন্যের অবতার-তত্ত্ব ১১২ ; চৈতন্যোত্তর কবিগণ ৪৯, ১১১ ; চৈতন্যোত্তর পদাবলী ১১০ ; চৈতন্যোত্তর পদাবলী ১১০ ; চৈতন্যোত্তর পদাবলী-সাহিত্য ৪৫ ; চৈতন্যোত্তর যুগ ৯৩, ৯৮, ১০৬, ১১০ ; চৈতন্যোত্তর শ্রেষ্ঠ পদকর্তাগণ ১১৩
চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবন দাস ৬৯, ১০০, ১০২
চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ ৮৪, ১০১
চৈতন্যমঙ্গল—লোচন দাস ১০১, ১০৩
চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীশ্রী ৯, ২৩
চৌতিশা ৫১, ১২১

ছন্দোমঞ্জরী—গঙ্গাদাস ২৫
ছাতনকুমার (সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী, দ্বিতীয় খণ্ড) ১৫০
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ১৮৫
ছুটি খাঁ ৮৬, ৮৭, ১৪২

জগৎ শেঠ ১৮৩, ১৮৪
জগৎ সিংহ ২০৫
জগজ্জীবন ঘোষাল ৭২, ৭৩
জগদানন্দ দাস ৯, ১১৫
জগন্নাথদেব ৯৫
জগা কৈবর্ত, বাউল ১৩০
জয়দেব ১৪, ১৭-১৯, ২১, ২৩, ২৯, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৪, ৪৮, ৯২, ৯৮, ১১০
জয়দেব-পূর্ব কৃষ্ণকথা ১৪
জয়া ১৭০
জয়ানন্দ ৮৪, ১০১-১০৪
জাতিচিহ্ন-রূপে নাগের মর্যাদা ৫৪
জাপানী ভাষা ১১, ১২
জাপানী শব্দ, বাংলা ভাষায় ১২
জারি গান ১২৯, ১৩৩
জালন্ধরিপাদ ১৪০
জাহাঙ্গীর, বাদশাহ ১৬৮, ১৭২, ১৭৫, ১৮২
জিন, মহাবীর ৪
জীব গোস্বামী ৯৬
জীবন মৈত্র ৭৩
জীবনী-কাব্য ৯৭
জুলিয়েট ১৪৮
জেন অস্টেন ১৯১
জৈন ৪, ১২৯
জৈনধর্ম ৪ ৫১
জ্ঞানদাস ৯, ১১৩-১১৫
জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর ৯
জ্যোতিষ, জ্যোতিষ-বিদ্যা ১৪৭, ১৫৫

টপ্পা (কবিগান) ১৩২
টীকাসর্বস্ব (অমরকোষের টীকা) ৭
টোটেম [Totem] ৫৪
টোডরমল ১১৯
ট্রাজেডি ১৯৮
ট্রোজান বীরকুল ২০২

ডবাক ১
ডাক ২৬

ডিরোজিও ১৯৬
ডোম ৩২
ডোম-পুরোহিত ৬৭
ডোম্বীপাদ ৩২
ড্রাইডেন ১৭৯

ঢাকা ১২
ঢাকা-বিক্রমপুরের কথ্যভাষা ১২

তৎসম শব্দ ১১
তদ্ভব শব্দ ১১
তন্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র ৫২, ৫৪, ৫৫, ১২১, ১২৫ ; তন্ত্র-উপাসনা ১২১ ; তন্ত্র-জ্ঞান ৩১ ; তন্ত্র-সাধনা ১২১, ১৩৬
তন্ত্রবিভূতি ৭৩
তমলুক ৩
তর্কশাস্ত্র ৫৫
তর্জাগান ১২৯, ১৩১, ১৩৩
তাতারী ভাষা ১১
তান্ত্রিক যোগসাধনা ৩১
তান্ত্রিকতা, বৌদ্ধ ৩৪, ১৮৬
তান্ত্রিকতা, হিন্দু ১৮৬
তাম্রলিপ্ত ৩
তারাচরণ শিকদার ১৯৭
তারাপদ ('অতিথি' গল্প—রবীন্দ্রনাথ) ২১১
তিব্বত-ব্রহ্মণ গোষ্ঠী ২, ৩, ৫, ১১
তিলোত্তমা ২০৫
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—মধুসূদন ২০৪
তুর্ক বিজেতা ২১
তুর্কী ৩৭ ; তুর্কী-আক্রমণ ৭, ১৬, ৩৭, ৫১, ৫২, ৬০, ৭১ ; তুর্কী-আমলে সংস্কৃত-অনুশীলন ৩৭ ; তুর্কী-উপদ্রব ৩০ ; তুর্কী-জাতি ৩৭ ; তুর্কী-বিজয় ১৩, ২১, ৩৭, ৩৮, ৭০ ; তুর্কী ভাষা ১১ ; তুর্কী-রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ৩৭ ; তুর্কী শাসকগণ ৮৭
তোহফা—আলাওল ১৪৪, ১৪৫
ত্রিপদী ৮, ১২
ত্রিপুরা ১২

দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ ১৭০
দক্ষালয়-যাত্রা, সতীর ১৭০
দশরথ ৮৯
দশাবতার ১৭
দর্শন ১৫
দর্শন, হিন্দু ৩১, ৩৫
দাক্ষিণাত্য ২২, ৯৪, ১৮৩
দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, চৈতন্যদেবের ১০১
দানখণ্ড ৪৩, ৪৬
দাশরথি রায় ১২৩, ১৩২, ১৩৩
দাশরথি রায়ের পাঁচালি ১২৩
দাস ১
দিব্য চেতনা ১১৬
দিব্য লীলা ১১০
দিব্য লীলা-প্রকটন ৯৮
দিব্যোন্মাদ ৯৫, ১০০, ১০৪
দিল্লী ১৭২, ১৮২, ১৮৩
দিল্লীর রাষ্ট্রবিপ্লব ১১৯
দীন চণ্ডীদাস ১১৫
দীনবন্ধু (বৈষ্ণব-পদকর্তা) ১১৫
দীনবন্ধু (মিত্র) ১৯৮
দীনেশচন্দ্র সেন, আচার্য ৭৩, ৮৫
দুঃখী শ্যামদাস ৯৭, ১০৬
দুর্গা ৪৫, ৬৪, ৭৮, ১২৩, ১৩৫, ১৬৯
দুর্গেশনন্দিনী (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র ২০৪
দুর্বলা দাসী (চণ্ডীমঙ্গল) ৭৭
দুর্যোধন ২০৩
দুর্লভ মল্লিক ১৩৫, ১৩৯, ১৪০
দুষ্টকাজি ১৫৮
দূতকাব্য ২২
দেওয়ান মদিনা (গীতিকা) ১৬৫
দেওয়ান রঘুনাথ ১২৩
দেবকীনন্দন সিংহ ৯৭
দেবখণ্ড ৫৬, ৫৯, ৮৯, ১৭০
দেবতত্ত্ব ৭৩
দেবতত্ত্ব-অধ্যায় (মঙ্গলকাব্য) ৬৪
দেবদেবী, পৌরাণিক ৫১
দেবদেবী-বন্দনা ৫৫
দেবদেবী, শাস্ত্র ৪৫
দেববাদ ৭২
দেবভাষা ১৭, ২০, ২৩, ২৪
দেবী চৌধুরাণী (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র ২০৫, ২০৬
দেবীসূক্ত (ঋগ্বেদ) ১২০
দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৬৪
দেশজ, দেশী শব্দ ১০

দোহাকোষ (অবহট্ট) ২৬
দোহাকোষ—কৃষ্ণাচার্য ৮
দোহাকোষ—সরোজবজ্র ৮
দৌত্য (বৈষ্ণব-পদাবলী) ১২৭
দৌলত কাজি, কবি ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৫১, ১৫২, ১৫৩
দ্রাবিড়-উপাদান, বাংলা ভাষায় ৩
দ্রাবিড়-গোষ্ঠী ৫
দ্রাবিড়বর্গ ৩
দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠী ৩, ১১
দ্রাবিড়ীয় ভাষা-গোষ্ঠী ৩
দ্রৌপদী ৮৯, ৯১
দ্বিজ বংশীদাস, কবি ৭২, ৮৫
দ্বিজ মাধব ৬৫, ৭৯, ৮০ ৯৭
দ্বিজ রামদেব ৮০, ৯৭
দ্বিজ লক্ষ্মণ ৮৫
দ্বিজেন্দ্রলাল (রায়) ১৯৮
দ্বিপদী ৮
দ্বিরুক্ত শব্দ ১০

ধনপতি ৫৯ ৭৫-৭৭ ৭৯, ৮০
ধনপতি-আখ্যান ৭৫
ধর্ম ধর্মরাজ ৬৮, ৭৬
ধর্ম, পৌরাণিক হিন্দু ৩২
ধর্ম, বৌদ্ধ তান্ত্রিক ৩৩
ধর্ম, হিন্দু ৩১, ৩২
ধর্মঠাকুর ৩৯, ৫০, ৫২, ৫৮, ৬০, ৬৫, ৬৭, ৬৮
ধর্মপাল ৬৫
ধর্ম-পূজা ৬৫
ধর্ম বিরোধ, মঙ্গলকাব্যে ১৭১
ধর্মমঙ্গল ৫৬, ৬৫-৬৮, ৭৬
ধর্মমঙ্গল—গোবিন্দরাম ৬৮
ধর্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্তী ৮, ৬৮
ধর্মমঙ্গল—নরসিংহ ৬৮
ধর্মমঙ্গল ময়ূর ভট্ট ৫৬, ৬৮
ধর্মমঙ্গল—মানিকরাম গাঙ্গুলী ৮, ৬৮
ধর্মমঙ্গল—রূপরাম ৬৮
ধর্মমঙ্গল—সহদেব ৬৮
ধর্মমঙ্গল—সীতারাম দাস ৬৮
ধর্মমঙ্গল—হৃদয়রাম ৬৮
ধার-শিলালিপি ২৫
ধোয়ী, কবি ২২

নজরুল ইসলাম ১২৩
নদীয়ার মহারাজা (কৃষ্ণচন্দ্র) ১২২, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৮, ১৯২, ১৯৪
নদের চাঁদ (মহুয়া, ময়মনসিংহ-গীতিকা) ১৬৩
নন্দকুমার ১২৩
নন্দ রায় ১৩৩
নবকুমার ২০৭
নবদ্বীপ ১২, ১৬, ২২, ৫৭, ৯৩, ১০০, ১১৩
নবদ্বীপ-লীলা ১১১
নবদ্বীপ-শান্তিপুরের কথ্যভাষা ১২
নবীনচন্দ্র (সেন) ১৯৩
নবীন যুগ, আর্যভাষার ১০
নব্যন্যায় ৯৪
নব্যভারতীয় আর্যভাষার পূর্বশাখা ৬
নরখণ্ড (মঙ্গলকাব্য) ৫০, ৬৯
নরমেইখলা, রাজা (আরাকান) ১৪৩
নরসিংহ ওঝা ৬৮, ৮৩
নরহরি চক্রবর্তী ৯
নরহরি ঠাকুর ৯৬, ১১৫
নরহরি সরকার ৯, ১১১, ১১২
নরোত্তম দাস ৯৬, ১১২
নলরাজা ৭৫
নসরত শাহ ১৪২
নাট্যগীতি ৩৫
নাড়াজোল ৩
নাথ, নাথধর্ম ৪, ১৩৭, ১৩৯
নাথ-গীতি ১৮৬
নাথ-গীতিকা ১৩৬
নাথ-ধর্মতত্ত্ব ১৮৬
নাথ-যোগী ১৩৯
নাথ-সাহিত্য ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৪০, ১৬৫
নাথ-সাহিত্য (প্রবন্ধ)—সুখময় মুখোপাধ্যায় ১৩৭
নাথ-সাহিত্যের উদ্ভব ১৩৪
নাদির শাহ ১৯২
নারদ ৪১
নারায়ণ ৩, ১৭, ৪০
নারায়ণ দেব ৭১, ৭২
নিগ্রন্থ নাথপুত্র ৪
নিতাই ৯৬

নিতাই বৈরাগী ১৩১
নিত্যানন্দ ৯৬, ১১৩
নিত্যানন্দ আচার্য (অদ্ভুতাচার্য) ৮৫
নিত্যানন্দ দাস ৮৬
নিত্যানন্দ-শাখা ১১৩
নিমচাঁদ ১৯৮
নিমাই ৯৩
নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃকপুত্র ৪
নির্বাণ-আনন্দ ৩২
নিষাদ ১
নীলাচল ৯৪
নীলাচল-লীলা ১০০
নীলাম্বর ৫১
নুরুন্নেহা ও কবরের কথা (গীতিকা) ১৬৫
নেতাই কুটনী ১৫৮
নেপাল ৩০, ১৩৯
নেপাল-দরবার ৩০
নৈরাত্মা ৩৩
নোয়াখালি ১২
নোয়াখালি-ত্রিপুরার কথাভাষা ১২
নৌকাখণ্ড ৪৩, ৪৬
নৌকাবিলাস ২৮
ন্যায়, ন্যায়শাস্ত্র ৯, ৯৩

পদকর্তা, চর্যা ৩১
পদরত্নাকর ১১৫
পদরসসার ১১৫
পদাবলী ৯, ১০, ৪০, ৪৫, ৪৮, ৯৭, ৯৮, ১১০, ১১২, ১২৪, ১২৫
পদাবলী-বিদ্যাপতি ৩০
পদাবলী, বৈষ্ণব ৯, ২৭, ২৮, ৪০, ৪২, ৪৫, ৪৮, ৫৩, ৭৯, ৮৪, ৯২, ১০৫, ১১০, ১৫৪
পদাবলী-রচয়িতা-গোষ্ঠী ১১১
পদাবলী-সাহিত্য ৪২, ৪৪, ১০৪-১০৬, ১০৯-১১২, ১১৫, ১১৬, ১২২
পদাবলী-সাহিত্য, চৈতন্যোত্তর ৪৫
পদাবলী-সাহিত্য-সৃষ্টি ৯৫
পদামৃত-সমুদ্র ১১৫
পদ্মনা ১৩৫
পদুমাবৎ, পদ্মাবৎ—মালিক মহম্মদ জয়সী ১৪৪, ১৫৩
পদ্মলোচন, বাউল ১৩০
পদ্মানদী ৮৩
পদ্মাবতী (কাব্য)—আলাওল ১৪৪, ১৫৩
পদ্মাবতী (নাটক)—মধুসূদন ১৯৮
পদ্মিনী (পদ্মাবতী) ১৫৩, ১৫৪
পবন দূত—ধোয়ী ২২
পয়ার ছন্দ ৮, ৪২
পরকীয়া-প্রেম ১১৩, ১১৪
পরমতত্ত্ব ১৩৬
পরমানন্দ গুপ্ত ১১১
পর-সংগঠন ১০
পরাগত ৮
পরাগল খাঁ ৮৫, ৮৬, ৮৭, ১৪২
পরাগলী মহাভারত ৮৬
পরেশবাবু (গোরা) ২১২
পর্তুগীজ ভাষা ১১
পলাশির যুদ্ধ (কাব্য)—নবীনচন্দ্র সেন ১৯৩
পলাশী ১৮৫
পলাশীর যুদ্ধ ১৬৮, ১৮৫, ১৮৮, ১৯২
পশ্চিমবঙ্গ ৪
পশ্চিম রাঢ় ৩৯
পাঁচালি—দাশরথি রায় ১২৩
পাঁচালি-গান ১৩২ ; পাঁচালি-গীত ১০১, ১৩১ ; পাঁচালির পালা-বিভাগ ১৩২ ; পাঁচালী, পাঁচালী-কাব্য ৫০, ৫৫, ৭১, ১৩৩
পাগ্লা শাহ্, ফকির ১২৯
পাঠান-আমল ৮৭
পাঠানশাহী ৬১
পাঠান সুলতান, বাংলার ১৪৩
পাণিনি ২
পাণ্ডব ৮৬, ২০২
পাণ্ডব-বিজয়—কবীন্দ্র পরমেশ্বর ৮৬
পানিহাটি ১০৮
পারস্য ভাষা ১৪৪
পার্শী, পারসী (ফারসী ভাষা) ১০, ১১, ২১, ১৪৪, ১৫৬, ১৬৮
পার্বতী ৫৫, ৬৯, ৮১
পাল-রাজগণের শাসন ১
পাল-রাজত্ব ৩৩
পাশ্চাত্ত্য মরমিয়া কবিগণ ১৫৩
পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রবর্তন ১৯৫
পিঙ্গলাচার্য ১৫৫
পুতনা ১০৭

পুরাণ ১৮, ২২, ২৭, ৩৭, ৪০, ৪৫, ৫০, ৫৪-৫৬, ৬৪, ৬৯, ৭৪, ৯৭, ৯৮, ১১৬, ১৩৪, ১৪৭, ১৫৯, ১৬৭, ১৭০, ১৭১, ১৯০, ১৯৩, ১৯৪ ; পুরাণ-কাহিনী ২০, ৭১ , পুরাণ-চর্চা ২৩ ; পুরাণ-চেতনা ১৫, ১৬, ১৫৯ ; পুরাণ-সংস্কৃতি ১৫
পুরীধাম ৯৪
পুরুষপরীক্ষা—বিদ্যাপতি ৯, ৪৫
পূর্ববঙ্গ ১৬, ৮৩, ১৫৭, ১৬০
পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ১৫৭, ১৬১, ১৬৫
পূর্ববঙ্গের উপভাষা ১২
পূর্বভারত ৪, ৪৮
পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ১
পূর্বী উপভাষা ১০
পূর্বী হিন্দী ৯
পৃথ্বীরাজ ২০৫
পেঁড়ো গ্রাম ১৬৮
পেটার শ্মিড্ট [Pater Schmidt] ২
পোপ ১৭৯
পোর্টুগীজ জলদস্যু ৮০
পৌণ্ড্রবর্ধন ৩
পৌরাণিক চেতনা ৩৮, ৩৯, ৪২, ৫৩, ৯৭, ১২৯, ১৫৯
পৌরাণিক দেবদেবী ৫১
পৌরাণিক ধর্ম ৩৮
পৌরাণিক ভক্তিবাদ ১৩০
পৌরাণিক ভাবাদর্শ ১৫২
পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ৩২
প্রগত ৮
প্রজা-উৎপীড়নের চিত্র (মুকুন্দরাম) ১১৯
প্রতাপাদিত্য ১৬৮, ১৭২
প্রথম যুগের গদ্যচর্চা ১৯৫
প্রহসন ১৯৮, ২০৭
প্রাক্-তুর্কীবিজয় যুগ ২৯
প্রাকৃত ৫, ১১, ১৩, ২১, ২৩, ২৬, ৩০
প্রাকৃত-অপভ্রংশ ২৬, ৩৮, ৪২
প্রাকৃত খণ্ডকবিতা ৩৭
প্রাকৃতজ শব্দ ১১
প্রাকৃত-পৈঙ্গল ২৬-২৮, ৩০
প্রাকৃত-পৈঙ্গলে কৃষ্ণকথা ২৮
প্রাকৃত-পৈঙ্গলে কৃষ্ণবন্দনা ২৮
প্রাকৃত-রচনাবলী ১৩
প্রাকৃত-শব্দ ১১
প্রাকৃত-সাহিত্য ২২
প্রাগ্-দ্রাবিড়-প্রাগার্য উপভাষা ৩
প্রাগ্-দ্রাবিড়-প্রাগার্য-গোষ্ঠী ১১
প্রাগ্-দ্রাবিড়-প্রাগার্য-জাতি ১
প্রাগৈতিহাসিক যুগ ৩
প্রাচীন যুগ, আর্যভাষার ১০
প্রান্তিক (ভাষা) ১০
প্রেমধর্ম, চৈতন্যদেবের ১৮, ৬৯, ৯৫, ৯৬
প্রেমভক্তিধর্ম ১০৫
প্রেমসাধনতত্ত্ব, বৈষ্ণব ১৫২

ফকির পাঞ্জু শাহ্ ১৩০
ফকির লালন ১৩০
ফয়জুল্লা শেখ ১৩৫, ১৩৭
ফরাসী-বিপ্লব ১৮০
ফরাসী ভাষা ১১
ফারসী (ভাষা) ৭, ১০, ১১
ফার্সী-সাহিত্য ১৬৮
ফিল্ডিং ১৭৯
ফুলিয়া ৮৩
ফুল্লরা (চণ্ডীমঙ্গল) ৫১, ৭৭, ১৭১
ফেরাঙ্গি ৮০
ফ্রান্স ১৮১

বংশীদাস, দ্বিজ ৭২, ৮৫
বংশীবদন ১১১, ১১২
বখতিয়ার খিলজি ২৯
বগধ (মগধ) ৩
বগুড়া জেলা ৫
বঙ্কিমচন্দ্র ২৭, ১৮৪, ১৯৮, ২০৩-২০৯, ২১৫
বঙ্গ, বঙ্গদেশ ১, ৪, ২৯, ৪৪, ৯৪
বঙ্গ, বঙ্গাল (চর্যাপদ) ৩৩
বঙ্গ ও বিহার বিজয়, বখতিয়ার কর্তৃক ২৯
বটুদাস ১৬
বড়াই, বড়াই বুড়ী ৪০, ৪১
বড়ায়ি
বড়ু চণ্ডীদাস ৭, ১৩, ১৪, ২০, ২৫, ২৮, ২৯, ৩৭, ৩৯-৪৩, ৪৫, ৪৬, ৯২ ১১০
বনমালী ওঝা ৮৩
বন্দনা (মঙ্গলকাব্যের প্রথম অংশ) ৫৩
বরিশাল ১২
বরিশাল ও বাখরগঞ্জের উপভাষা ১২
বরেন্দ্রী ৯

বর্গীদের নারীনিগ্রহ ১৯২
বর্গীর ধ্বনি ৬
বর্গীর হাঙ্গামা ১৮৩
বর্ধমান ৮৬, ১১৪
বর্ধমানপুরী ৪
বলরাম দাস ৯, ১১৩
বলাকা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ২১০
বল্লাল সেন ১৭
বাউল ১২৯ ; বাউল কবি ১৩৩ ; বাউল গান, গীত, সঙ্গীত ১২৯-১৩১, ১৬৫ ; বাউলধর্ম ১৩০ ; বাউল-সাধক ১৩০ ; বাউল-সাধনা ১৩০
বাঁকুড়া ১২
বাঁকুড়ার কথ্যভাষা ১২
বাঁকুড়া শুশুনিয়া লিপি ১৪
বাংলা ৪
বাংলা উপভাষা ১০ ; বাংলা কাব্য ৪২ ; বাংলা বৈষ্ণব-সাহিত্য ৪৪ ; বাংলা ভাষা ১, ৩, ৬, ১২, ২৩, ৪২ ; বাংলা ভাষার উদ্ভব ১, ৭, ২৪ ; বাংলা ভাষার মধ্যযুগ ৮ ; বাংলায় ব্রজবুলি-সাহিত্য ৯ ; বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ ১৮৬
বাংলা প্রাচীন সাহিত্যের কালক্রম—সুখময় মুখোপাধ্যায় ৮৩
বাংলার পাঠান-সুলতান ১৪৩
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪
বাখরগঞ্জ ১২
বাঙলা
বাঙলা, বাঙলা দেশ ৩, ৫, ৯, ৪৪
বাঙালী ৪
বাঙালী বিদ্যাপতি (কবিরঞ্জন) ৪৮, ১১৩
বাঙালী বৈষ্ণব-সমাজ ৯৬
বাঙ্গালা
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন ২৫, ১৩৭, ১৩৯
বাঙ্গালী ৪
বামন (সতী ময়না) ১৪৮, ১৪৯
বারমাসী (চণ্ডীমঙ্গল) ৭৭
বারমাস্যা (চৈতন্যমঙ্গল) ১০৩
বারমাস্যা (মঙ্গলকাব্য) ৫১
বারাখা ৭২
বারোমাস্যা (সতীময়না) ১৫০, ১৫২
বার্ক ৬০
বার্গস ২১০
বাল্মীকি ৮৪, ৮৫, ৮৮, ১৯৯-২০১
বাল্মীকি-রামায়ণ ৮৪, ৮৫, ৮৮
বাসরঘরে সর্পদংশনে চাঁদের মৃত্যু ৬৯
বাসলীগণ ৭
বাসুদেব ঘোষ ৯৬, ১১১, ১১২
বিক্রমপুর ১২
বিজয় গুপ্ত ৮, ৬৩, ৭১, ৭২
বিজয়ার গান ১২৩, ১২৭, ১২৮
বিজ্ঞান-চেতনা ১৮০
বিদেশী (ঋণাত্মক) শব্দ ১১
বিদ্যা (বিদ্যাসুন্দর) ১৪৮, ১৬৮, ১৭৬
বিদ্যাপতি ঠাকুর ১৮, ৯১, ২৯, ৩০, ৩৭, ৪৪-৪৯, ৮৪, ৯২, ৯৮, ১০৬, ১১০, ১১২, ১১৩, ১৩৭, ১৪৬, ১৫১ ; বিদ্যাপতির কাল ৪৪ ; বিদ্যাপতির পদাবলী ৩০, ৪৮, ৯২ ; ঐ স্বরূপ-নির্ণয়ের মানদণ্ড ৪৮
বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যান ১৬৮ ; বিদ্যাসুন্দর কাহিনী ১৪৮, ১৪৯, ১৭২, ১৭৩, ১৭৮
বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল (অন্নদামঙ্গল)—ভারতচন্দ্র ১৬৭, ১৭৩, ১৭৬
বিধবা-বিবাহ (পাঁচালি) ১৩২
বিপর্যয় (ধ্বনি-পরিবর্তন) ৭, ৮
বিপ্রকর্ষ (ঐ) ৭, ৮
বিপ্রদাস পিপ্পলাই ২৮
বিভীষণ ৮৯
বিমলা (ঘরে বাইরে) ২১২
বিরহ (কবিগান) ১৩১
বিরহ (পদ্মাবতী—আলাওল) ১৫৪
বিরহ (পাঁচালি) ১৩২
বিরহ (বৈষ্ণব-পদাবলী) ৪৫-৪৭, ১২৭
বিরহতত্ত্ব ১৫৪
বিরহ-পর্যায়ের পদ ৪৬
বিরহের পদ ৪৭
বিশ্বকর্মা ১৩৭
বিশ্বভারতী ১৩৭
বিশ্বম্ভর মিশ্র ৯৩
বিশ্বরূপ-প্রদর্শন ১০৭
বিষবৃক্ষ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র ২০৭
বিষমচ্ছেদ ১০
বিষহরি ৬৯, ১০০
বিষ্ণু ৫৪, ১৭০

বিষ্ণুদাস (মনসামঙ্গলের কবি) ৭২
বিষ্ণুদাস আচার্য ১০১
বিষ্ণুপদ ৭৯, ৮০
বিষ্ণু পাল (মনসামঙ্গলের কবি) ৭৩
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ৯১, ১০৩
বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা ১০৩
বিহার ২৯, ৬৯
বিহার-বিজয় ২৯
বিহারী (ভাষা) ৬
বীভৎস রস ১৭৭
বীরভূম ১২
বীরভূমের কথ্যভাষা ১২
বীররস ১৯৯, ২০৩
বীরাঙ্গনা-কাব্য—মধুসূদন ১৯৮, ২০৩
বুদ্ধনাটক ৩৫
বুদ্ধলীলা ৩৫
বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ৬০
বৃন্দাবন, বৃন্দাবনধাম ২৫, ৯৪, ৯৬, ১০১, ১০২, ১৫১
বৃন্দাবন দাস ৬৯, ১০০
বৃন্দাবন-লীলা ১৮, ২৬, ৯১, ১১১, ১১৯
বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী ৯৬
বেকন ১৭৯
বেদ ৩০, ৫৪, ৯৮, ১০৮, ১৮৬
বেদব্যাস ৮৮, ১০০
বেদান্ততত্ত্ব-প্রতিপাদন ১৯৫
বেহুলা ৫১ ৬৬, ৬৯, ৭৩, ৭৪, ১২৮, ১৭১
বৈদিক ধর্ম ১৫, ৫১
বৈদিক ভাবাদর্শ ৫২
বৈষ্ণব-কবি ১২৪, ১৩৩, ১৫৩, ১৬২, ১৯০ ; বৈষ্ণব-কবিতা ১৪, ১২২, ১২৭, ১৩২, ১৯১ ; বৈষ্ণব-কাব্য ৪৯ ; বৈষ্ণব-চরিতকারগণ ১৯৩ ; বৈষ্ণব-তত্ত্ব ৪৯, ১০৩, ১১২, ১১৩ ; বৈষ্ণব-দর্শন ৯৬, ১০১ ; বৈষ্ণবধর্ম ১৬, ৪৭, ৯৫, ৯৬, ১০১, ১০২, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১২০, ১২৩, ১২৯ ; বৈষ্ণব-ধর্মতত্ত্ব ১১৬ ; বৈষ্ণবধর্মের ভক্তি-সাধনা-ধারা ১১৫ ; বৈষ্ণব-পদ ৪৪, ১৬২ ; বৈষ্ণব-পদকর্তা ৪৫ ; বৈষ্ণব-পদাবলী ৯, ২৭, ২৮, ৪০, ৪২, ৪৫, ৪৮, ৫৩, ৭৯, ৮৪, ৯২, ১০৫, ১১০, ১১৬, ১১৭, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১৩১, ১৪০, ১৫৪, ১৬২ ; বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্য ৪৮, বৈষ্ণব-প্রেমতত্ত্ব ১৩০ ; বৈষ্ণব-প্রেম-সারনাতত্ত্ব ১৫২ ; বৈষ্ণব-ভক্তিবাদ ১০৫ ; বৈষ্ণব-ভাবধারা ৪৫, ১১০ ; বৈষ্ণব-ভাব-সাধনা ৯৬, ১২৭, বৈষ্ণব-ভাবাদর্শ ৪৯, ৭৬ ; বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র ১১০ ; বৈষ্ণব-শাস্ত্র ৪০ ; বৈষ্ণব-সমাজ, বাঙালী ৯৬ ; বৈষ্ণব-সাধক ৯৬, ১২৭, ১৩০ ; বৈষ্ণব-সাহিত্য ২৭, ১১৫, ১১৯
বোধিচিত্ত ৩৩
বোলান গান ১২৩
বৌদ্ধ ৩৭, ৫১, ৬০, ১২৯ ; বৌদ্ধতত্ত্ব ৩৬ ; বৌদ্ধতন্ত্র ১৭ ; বৌদ্ধতান্ত্রিকতা ৩৪, ১৮৬ ; বৌদ্ধ-তান্ত্রিকধর্ম ৩৩ ; বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ভাবাদর্শ ৫২ ; বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজযান ৩২ ; বৌদ্ধ-দর্শন ৩১ ; বৌদ্ধধর্ম ১৬, ১৮, ৫১, ৫৪, ৫৮, ৬০, ৭২ ; বৌদ্ধমত ৩২ ; বৌদ্ধরাজবংশ, আরাকান ১৪৫ ; বৌদ্ধ-রাজাদের আমল ৫২ ; বৌদ্ধ-শূন্যবাদ ১৫ ; বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ৩১ ; বৌদ্ধ-সহজযান ৩২ ; বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ ১৫
ব্যাকরণশাস্ত্র ৯
ব্যাধ ৩২
ব্যাস, ব্যাসদেব ৮৮, ১০০, ১৭১, ১৭৪, ১৯৯, ২০০, ২০২
ব্রজনাথ ১৩২
ব্রজপুরী, ব্রজপুরীয় (ভাষা) ৬, ৯, ১০ ; ব্রজপুরীয় উপভাষা ৯
ব্রজবুলি ৮, ৯, ৪৪, ৪৮, ১১২, ১১৩, ১৫০ ; ব্রজবুলি-পদ ৪৮ ; ব্রজবুলি-সাহিত্য ৮, ৯ ; ব্রজবুলি সাহিত্য-চর্চা ৯
ব্রজ রায়, পাঁচালিকার ১৩৩
ব্রজলীলা ১৪
ব্রজাঙ্গনা কাব্য—মধুসূদন ১৭৬
ব্রহ্মজ্ঞান ৭৪
ব্রহ্মদেশ ১৪৩
ব্রহ্মরাজ ১৪৩
ব্রহ্মা ১৭০
ব্রাত্য, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ১
ব্রাহ্মণ্যধর্ম ১৭, ৫১
ব্রাহ্মধর্ম ১৯৭
ভক্তপ্রসাদ ২০৭

ভক্তিবাদ ৩৮, ৩৯, ৫২-৫৩, ৬১, ৯৬, ৯৮, ১০৫, ১১০, ১৭৩
ভক্তিবাদ, পৌরাণিক ১৩০
ভক্তিবাদ, বৈষ্ণব ১০৫
ভক্তিবাদ, হিন্দু ১৪৭
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—রূপ গোস্বামী ১১০
ভক্তিশাস্ত্র ৮৮
ভদ্রার্জুন—তারাচরণ শিকদার ১৯৭
ভগ্ন তৎসম শব্দ ১১
ভবদেব ভট্ট-প্রশস্তি ১৫
ভবানন্দ, ভবানন্দ মজুমদার, রাজা-ই-ফরমান ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৮৭
ভবানী দাস (গোবিন্দচন্দ্রের গীত-প্রণেতা) ১৩৫, ১৩৯, ১৪০
ভবানী দাস (রামায়ণ-রচয়িতা) ৮৫
ভবানী-বিষয়ক গান (কবিগান) ১৩১
ভরত ৮৯
ভলটেয়ার ১৮০
ভাগবত ১৮, ২৪, ৪০, ৬৯, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০৫-১০৯
ভাগবত-উপাখ্যান ১০৮; ভাগবত-তত্ত্ব ৯৮; ভাগবত-ধর্ম ২৩; ভাগবতের অনুবাদ ৯৮, ১০৬; ভাগবতের টীকা ৪৩; ভাগবতের বঙ্গানুবাদ ১০৬; ভাগবতের যুগ ১০৮
ভাটিয়ালি গান ১২৯, ১৩৩
ভাটুক ঠাকুর ১৫৮
ভাঁড়ু দত্ত ৬৫, ৭৭, ১৮৯
ভাবসম্মিলন ৪৫-৪৭, ১১৩, ১২৭
ভারতচন্দ্র, রায়গুণাকর ২৭, ৬৮, ৭৮, ৮০, ১২২, ১৫৩, ১৬৭-১৭৮, ১৮২, ১৮৬-১৯০, ১৯৪
ভারামল্ল ৭২
ভাস্করপরাভব (বা মহারাষ্ট্র-পুরাণ)—গঙ্গারাম ১৯১
ভাস্করবর্মা, কামরূপ-রাজ ১৪; ঐ তাম্রশাসন ১৪
ভীমসেন রায় (নাথ-সাহিত্যের কবি) ১৩৪
ভীষ্ম ২৪
ভুরশুট পরগণা ১৬৮
ভুসুকুপাদ, বৌদ্ধাচার্য ৩৩
ভেলুয়া (ময়মনসিংহ-গীতিকা) ১৬৫
ভোজপুরিয়া, ভোজপুরী (ভাষা) ৬
ভোজবর্মা ১৪, ঐ তাম্রশাসন ১৪
মইশাল বন্ধু (গীতিকা) ১৬১
মগধ ৩, ৩৫
মগধরাজগণ ১৪৩
মগহী (মাগধী) ৬
মঙ্গলকথার অর্থ ৫০
মঙ্গলকাব্য ১৩, ১৪, ২৭, ২৯, ৩৯, ৫০, ৫২-৫৮, ৬০-৬৪, ৬৬-৬৮, ৭০, ৭১, ৭৮-৮২, ৯২, ৯৭, ১১৫, ১১৬, ১১৯, ১২১, ১২৯, ১৩৮, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ১৭৪-১৭৬, ১৮১, ১৮২, ১৮৬, ১৮৮, ১৯০, ১৯৪
মঙ্গলকাব্য, আদি ১৮৮; মঙ্গলকাব্য-ধারা ৮০, ৮১, ১৬৯, ১৮২, ১৮৬; মঙ্গলকাব্য-ভারতচন্দ্র ১৮৮; মঙ্গলকাব্য-যুগ ১৬৭; মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি-কাল ৫৫; মঙ্গল-কাব্যের উদ্ভব ৫১; মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি ৫১; মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ ৫০; মঙ্গলকাব্যে স্ত্রী-দেবতার প্রাধান্য ৫২
মঙ্গলচণ্ডী ৫৯, ১০০, ১৬৭
মঙ্গলা, কদলীরানী ১৩৮
মণিহারা (ছোটগল্প)—রবীন্দ্রনাথ ২১২
মণীন্দ্রমোহন বসু, অধ্যাপক ৮৫
মথুরা ৭, ১০৭
মদন বাউল ১৩০
মধুর রস ১৯৯
মধুসূদন, মাইকেল ৮৯, ১৭৬, ১৯৭-২০৪, ২০৭, ২১৫
মধ্যপর্ব, মধ্যযুগ (আর্যভাষার) ১০
মধ্যযুগ ৮, ৯, ৫৭, ৫৯, ৭২, ১২৮, ১৪২, ১৪৫, ১৪৯, ১৫৩, ১৭২, ১৮৩, ১৮৫
মধ্যযুগীয় সাধুসন্ত ১৩১
মধ্যলীলা, চৈতন্যদেবের ৯৪
মধ্যা (বাংলার উপভাষা) ৯, ১০
মনসা ৩৯, ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬৬, ৬৯-৭৫, ৮৯, ১২১, ১৭২, ১৮৮
মনসা-চরিত্র ৬০
মনসা-বিজয়—বিপ্রদাস পিপলাই ৮
মনসামঙ্গল ৮, ৫১, ৫৪, ৫৬, ৬৩, ৬৯, ৭০-৭৬, ৮৯, ১০০, ১২১, ১২৮, ১৪৯
মনসামঙ্গল—কানা হরি দত্ত ৭০, ৭১

মনসামঙ্গল—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ৭২
মনসামঙ্গল—জগজ্জীবন ঘোষাল ৭২, ৭৩
মনসামঙ্গল—জীবন মৈত্র ৭৩
মনসামঙ্গল—তন্ত্রবিভূতি ৭৩
মনসামঙ্গল—দ্বিজ বংশীদাস ৭২
মনসামঙ্গল—নারায়ণ দেব ৭১, ৭২
মনসামঙ্গল—বিজয় গুপ্ত ৮, ৭২
মনসামঙ্গল (মনসাবিজয়)—বিপ্রদাস পিপ্পলাই ৮
মনসামঙ্গল—বিষ্ণু পাল ৭৩
মনসামঙ্গল, বিহারে প্রচলিত ৬৯
মনসামঙ্গল—ষষ্ঠীবর দত্ত ৭৩
মনসার জন্ম ৬৯
মনসার পূজা ৬০, ৭৩, ৭৪, ১২১
মনের মানুষ ১২৯, ১৩০
ময়নাগুড়ি ৩
ময়নামতী (ময়নামতীর গান) ১৩৪, ১৩৫, ১৪০, ১৪১
ময়নামতী, ময়না (সতী ময়না) ১৪৮, ১৫০, ১৫২
ময়নামতীর গান ও গোরক্ষবিজয় ১৮৬
ময়নামতীর গান (বা গোপীচন্দ্রের গান) ১৪০
ময়নামতীর গান (বা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস) ১৩৯
ময়নামতীর গান (বা গোবিন্দচন্দ্রের গান) ১৩৪
ময়মনসিংহ ১২, ৭২, ১৫৭
ময়মনসিংহ-অঞ্চলের কথ্যভাষা ১২
ময়মনসিংহ-গীতিকা, মৈমনসিংহ-গীতিকা ৮৫, ১২৮, ১৫৭, ১৬১, ১৬৫
ময়ূর ভট্ট ৫৬, ৬৮
মরমিয়া-অনুভূতি ১৩০
মরমিয়া-কবিগণ, পাশ্চাত্ত্য ১৫৩, ২১০
মরমিয়া-সাধনতত্ত্ব ১৫৪
মহম্মদ ১৪৭
মহম্মদ টুগলক ১৮৩
মহম্মদ-প্রশস্তি (সতী ময়না) ১৪৭
মহম্মদের বন্দনা (ঐ) ১৪৭
মহাকাব্য ৬৭, ১৯৯, ২০০-২০৪
মহাজ্ঞান ১৩৬
মহানন্দ ৩১
মহাপ্রভু, শ্রী ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩
মহাপ্রভুর দেবমূর্তি (চৈতন্যভাগবত) ১০২
মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন-ধ্বনি ৫, ৬, ১০
মহাবীর জিন ৪
মহাভারত ৩, ৮, ৬৯, ৭৫, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯০, ১০৫, ১০৯, ১৪৩, ১৬৯, ১৭৪, ২০০, ২০২, ২০৩
মহাভারত—অনিরুদ্ধ ৮৬
মহাভারত—কবীন্দ্র পরমেশ্বর ৮৫, ৮৬
মহাভারত—কাশীরাম দাস ৮৬, ৮৮
মহাভারত—গঙ্গাদাস ৮৬
মহাভারত—নিত্যানন্দ দাস ৮৬
মহাভারত—পরাগলী (কবীন্দ্র পরমেশ্বর-রচিত) ৮৬
মহাভারত—বেদব্যাস ৮৫, ৮৮
মহাভারত—রঘুনাথ ৮৬
মহাভারত—রামচন্দ্র খাঁ ৮৬
মহাভারত—শ্রীকর নন্দী ৮৬
মহাভারত—ষষ্ঠীবর ৮৬
মহাভারত, সংস্কৃত ৮৫
মহাভারত—সঞ্জয় ৮৫
মহাভারত-অনুবাদ-আরম্ভ ৮৫
মহামদ পাত্র (ধর্মমঙ্গল) ৬৭, ৭৪
মহামন্ত্রী ভবদেব ভট্ট-প্রশস্তি ১৪
মহামাত্য দুর্মাদন ৫
মহামায়া (চরিত্র) ২১১
মহামায়া (শক্তিদেবী) ৫৫, ৬৫, ১২৩
মহারাষ্ট্রপুরাণ (বা ভাস্করপরাভব)—গঙ্গারাম ১৮৬, ১৯১, ১৯৪
মহাসুখ ৩১
মহাস্থানগড়-লিপি ১৪
মহাস্থানগড়-শিলালিপি ১৪
মহুয়া (চরিত্র) ১৬৩
মহুয়া (গীতিকা) ১৬০, ১৬৩, ১৬৪
মাইকেল (মধুসূদন দত্ত) ২১৫
মাগধী (মগহী) ৬
মাগধী প্রাকৃত ৫
মাগন ঠাকুর ১৪৪
মাণিকচন্দ্র (গোপীচন্দ্রের গান) ১৪০
মাণিক দত্ত (চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি) ৫৬, ৭৮
মাণিকরাম গাঙ্গুলী (ধর্মমঙ্গল-এর কবি) ৮, ৬৮
মাণ্ডলিক শাসনকর্তা ১৬
মাৎস্যন্যায় ৬৩
মাতৃকল্পনা ৫৪ ; মাতৃচেতনা ১১৫ ; মাতৃতন্ত্র ৫৫, ১২০ ; মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ১২০ ; মাতৃ-দেবতা ১১৯ ; মাতৃপুজা ১৮৮ ; মাতৃআধান্ত

১২০ ; মাতৃশক্তি ৭৫, ১২১, ১২৩ ; মাতৃশক্তি-উপাসনা ১২০ ; মাতৃশক্তির আরাধনা ৫৪ ; মাতৃশক্তির যুগ্মরূপের সমন্বয় ১২৩ ; মাতৃসাধনা ১২৩, ১৯১
মাত্রামূলক ছন্দ ৮
মথুর-বিরহ ৪৫, ৪৬-৪৭
মাধব আচার্য, মাধবাচার্য (বৈষ্ণব কবি) ৯৭, ১০৬-১০৮
মাধব ঘোষ (বৈষ্ণব কবি) ১১১, ১১২
মাধব, দ্বিজ (ঐ) ৬৫, ৭৯, ৯৭
মাধুর্য-লীলা ১৩৭
মান (বৈষ্ণব-পদাবলী) ৪৫, ১০৮, ১১৩, ১২৭
মানকুণ্ড ৬
মানসিংহ ১১৯, ১৬৮, ১৭২, ১৭৫, ১৭৭
মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল—ভারতচন্দ্র ১৬৭
মানসিংহ-বাহিনী ১৭২
মানসী (কাব্য)—রবীন্দ্রনাথ ২০৯
মামুদ শরিফ, ডিহিদার ১৮২
মায়া (চণ্ডীমঙ্গল) ৫১
মারফতী গান ১২৯, ১৩০
মারাঠা-দস্যু ১৫২, ১৮৪
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ১২১
মালদহ ৭৮
মালয়ী ভাষা-গোষ্ঠীমালয়ী শব্দ ১২
মালাধর বসু, গুণরাজ খান ৮, ৩৯, ৯৭, ১০৬, ১০৮
মালিক মহম্মদ জয়সী (পদুমাবৎ-প্রণেতা) ১৪৪, ১৫৩
মালিনী (কৃত্তিবাস-জননী) ৮৩
মালিনী (রতনা : সতী ময়না) ১৫০-১৫২
মিথিলা ৯, ১৯, ৩০, ৪৪, ৪৭, ৪৮
মিথিলা-অধিপতি ৩০
মিথিলা-রাজসভা ১৯
মিল্‌টন ২০০
মিলন (বৈষ্ণব-পদাবলী) ৪৫, ১২৭
মিশ্র পয়ার-ছন্দের উদ্ভব ৮
মিশ্র প্রাকৃত ৫
মীনচেতন (বা গোরক্ষবিজয়) ১৩৪, ১৩৬
মীননাথ, সিদ্ধাচার্য ১৩৪, ১৩৬
মীমাংসা গ্রন্থ ১১০
মীর কাশিম ১৮৪
মীর জাফর ১৮৩, ১৮৪
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ ৮, ২৭, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৭৮, ৭৯, ৮০, ১১৯, ১৭৪, ১৮৬, ১৮৭
মুণ্ডা-গোষ্ঠী ১, ৩, ৫
মুরশিদকুলি খাঁ ১২১, ১৮১-১৮৩
মুরশিদাবাদ ১৮১, ১৮২
মুরারি গুপ্ত (বৈষ্ণব-কবি) ৯৯, ১০০, ১১১, ১১২
মুর্শিদী গান ১৩০
মুসলমান-অধিকার ৫৫
মুসলমান ডিহিদার ৬৩, ১৮২
মুসলমান নবাব ৬৩
মুসলমান-বিজয় ২৬, ৩৮, ৩৯, ৫৬, ৫৭, ৬০
মুসলমান বৈষ্ণব-কবি ১১৬
মুসলমান-রাজত্বকাল ৪
মুসলমান-রাজশক্তি-প্রতিষ্ঠা ৫২
মৃণালিনী (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র ২০৫
মেঘদূত—কালিদাস ২২, ৪৬
মেঘনাদবধ কাব্য—মধুসূদন ১৯৮, ২০১
মেদিনীপুর ১২
মেদিনীপুরের কথ্যভাষা ১২
মেনকা (শাক্তগীতি) ১২৮
মৈথিল ভাষা ৪৮
মৈথিলী ৬, ৯, ৪৪, ১০৭
মৈথিলী অপভ্রংশ (ব্রজবুলি) ৪৪
মৈমনসিংহ, ময়মনসিংহ ১২, ৭২, ১৫৭
মৈমনসিংহ-অঞ্চলের কথ্যভাষা ১২
মৈমনসিংহ-গীতিকা, ময়মনসিংহ-গীতিকা ৮৫, ১২৮, ১৫৭, ১৬১, ১৬৫
মোগল-শাসন ১১৯
মোগল-সাম্রাজ্য ৬১
মৌর্য-সম্রাট্‌গণ ৫
ম্যাথিউ আর্ন্‌লড ১৮০
ম্রাঅঙ্‌ ৩

যক্ষ ২২
যম ১৩৫
যমুনা ২১, ২৫, ১০৯
যশোদা ২৪
যশোহর ১২
যশোহর-খুলনার কথ্যভাষা ১২
যাদবেন্দু, বাউল ১৩০
যুক্তিবাদ ৫৭, ১৮০
যুগ্ম প্রয়োগ ১০
যুধিষ্ঠির ৯০
যোগশাস্ত্র ১৪৭

যোগসাধনা, তান্ত্রিক ৩১
যোগসাধনা, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ১৩৪
যোগান্ত পুঁথি (বা যোগীর পুঁথি)
—সুকুর মহম্মদ ১৩৯
যোগাযোগ (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ২১২
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ১৯৭

রংপুর ১৩৪
রক্তকরবী (নাটক)—রবীন্দ্রনাথ ১২২
রঘুনন্দন গোস্বামী ৮৫
রঘুনাথ দাস ৯৬
রঘুনাথ, দেওয়ান ১২৩
রঘুনাথ ভট্ট ৯৬
রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ৯৭, ১০৬, ১০৮
রঘুনাথ, মহাভারতকার ৮৬
রঘুনাথ শিরোমণি ৯৪
রতন সেন (পদ্মাবতী-আলাওল) ১৫৩, ১৫৪
রতনা মালিনী (সতী ময়না) ১৫০, ১৫১, ১৫২
রতিবিলাপ ১৭০, ১৭৭
রতিশাস্ত্র ১৫০
রবীন্দ্রনাথ ৯, ২৭, ৫৬,
৫৮, ১২২, ১২৩, ১৩০, ১৭৭,
১৯৮, ২০৯, ২১০-২১৩, ২১৫
রসতত্ত্ব ১০৫, ১১২
রসশাস্ত্র, বৈষ্ণব ১১০
রসিক রায়, পাঁচালিকার ১৩৩
রাঈ (রাই : ছন্দোমঞ্জরী) ২৫
রাজসিংহ (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র ২০৬
রাজ-ই-ফরমান (ভবানন্দ) ১৬৮, ১৭১,
১৭২, ১৭৪, ১৮৭, ১৯৪
রাঢ় ১, ৪, ১৫, ৬৫-৬৭, ১১৬
রাঢ়, পশ্চিম ৩৯
রাঢ়াপুরী ৪
রাঢ়ী (বাংলার উপভাষা) ৮, ১০
রাধা, শ্রী ৭, ১৮, ২৫, ৪০, ৪১,
৪২, ৪৫, ৪৭, ৯৫, ১১০, ১১৬
রাধাকৃষ্ণ ১৮, ৪১, ৪৫, ৪৭, ১১০, ১২১;
রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী ১৩; রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী, গৌড়ীয় ৪০; রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী, পৌরাণিক ৪০; রাধাকৃষ্ণ-প্রেম ২৪, ৪০, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৯২, ১০২, ১৩৮; রাধাকৃষ্ণ-প্রণয় ১৯; রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনী ৪৩; রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা ১৭, ১৯, ২৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৭৪, ৯২, ১১৯, ১২০, ১৩০, ১৪৩; রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাত্মক রসতত্ত্ব ১০৫; রাধাকৃষ্ণ-বিরহ ৪৭; রাধাকৃষ্ণ-লীলা ২৮, ৩৯, ৯৬, ১১০; রাধাকৃষ্ণের যুগলতত্ত্ব ৯৬
রাধা-চরিত্র ৪১
রাধামোহন, বৈষ্ণব-পদকর্তা ১১৫
রাধিকা, শ্রী ১৯, ১২৪
রাবণ ৮৯, ২০১
রামকৃষ্ণ রায়, শিবায়ন-ধারার প্রবর্তক ৮১, ৮২
রামগিরি ২২
রামচন্দ্র, রাম ১৬, ৮৮-৯০, ৯২,
১০২, ২০১
রামচন্দ্র খান ৮৬
রামচরিত—অভিনন্দ ১৬
রামচরিত—সন্ধ্যাকর নন্দী ১৬
রামদেব, দ্বিজ ৮০, ৯৭
রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৯৭
রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদ সেন ১২৩, ১২৭,
১৩৮, ১৭৮, ১৮৬, ১৯০, ১৯১
রামপ্রসাদী সুর ১২৩, ১৯১
রাম বসু, কবিয়াল ১৩১
রাম-বিষয়ক পালা (পাঁচালি) ১৩২
রামমোহন রায়, রাজা ১৮৫, ১৯৫
রামরসায়ন—রঘুনন্দন ৮৫
রাম-রাবণের যুদ্ধকাহিনী ২০১
রামলক্ষ্মণ ১০২, ২০১
রামশংকর দত্ত (রামায়ণের কবি) ৮৫
রামানন্দ ঘোষ (ঐ) ৮৫
রামানন্দ বসু (বৈষ্ণব-পদকর্তা) ১১১, ১১২
রামানন্দ, রায় ৯৯, ১১২
রামায়ণ ৬৯, ৮৩-৯০, ১০৫, ১০৯,
১৪৩, ১৪৯, ১৭৪, ২০০, ২০১
রামায়ণ—অদ্ভুতাচার্য ৮৫
রামায়ণ—কৃত্তিবাস ৩৯, ৮৩-৮৬, ৮৮
রামায়ণ—কৈলাস বসু ৮৫
রামায়ণ—চন্দ্রাবতী ৮৫
রামায়ণ—দ্বিজ লক্ষ্মণ ৮৫
রামায়ণ—ভবানী দাস ৮৫
রামায়ণ—রঘুনন্দন গোস্বামী ৮৫
রামায়ণ—রামশংকর দত্ত ৮৫
রামায়ণ—রামানন্দ ঘোষ ৮৫
রামায়ণ—হরেন্দ্রনারায়ণ ৮৫
রামেশ্বর ভট্টাচার্য ৮১

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ২৭, ৬৮, ৭৮, ৮০, ১১২, ১৫৩, ১৬৭-১৭৮, ১৮২, ১৮৬-১৯০, ১৯৪
রায় বসন্ত (বৈষ্ণব পদকর্তা) ৪৮
রায় রামানন্দ (ঐ) ৯৯, ১১২
রায়শেখর (ঐ) ৪৮
রাসলীলা ১০৭
রাসু নৃসিংহ, কবিয়াল ১৩১
রিচার্ডসন ১৭৯
রুদ্ররস ১৭৭
রুসো ১৮০
রূপকথা ১৫৭, ১৫৮, ১৯২ ; রূপকথা-ধর্মী গাথা ১৭৮ : রূপকথা-ধর্মী সাহিত্য ১৫৮
রূপ, রূপ গোস্বামী ৯৬, ১১০
রূপরাম (ধর্মমঙ্গলের কবি) ৬৮
রূপোন্মাদ ১০৫
রেবেকা (আইভানহো) ২০৫
রোওয়েনা (ঐ) ২০৫
রোমান্টিক ভাব-কল্পনা ১৮০
রোমিও ১৪৮
রোমিও-জুলিয়েট ১৪৮
রোসাঙ্গ ১৪৫, ১৪৬
রোসাঙ্গ-রাজ ১৪৭, ১৫১
রোসাঙ্গ-রাজসভা ১৪৫

লক্ ১৭৬
লক্ষ্ণৌ-এর শেষ নবাব (ওয়াজিদ আলি) ২২
লক্ষ্মা ৮৯, ১০২
লক্ষ্মণ, দ্বিজ (রামায়ণ-রচয়িতা) ৮৫
লক্ষ্মণ সেন ৪, ১৬, ১৭, ১৯, ২২, ৩০
লক্ষ্মী ৪০, ১৭০, ১৮৭
লক্ষ্মী দেবী (শ্রীচৈতন্য-পত্নী) ৯৪
লক্ষ্মীন্দর ৬৯
লখাই (লখীন্দর) ৬৯, ৭৬
লখাই ডোমনী ৬৫
লখীন্দর ৫১, ৬৬, ৭৩-৭৬, ১৭১
লঙ্কাযুদ্ধ ১৬, ৯০
লহনা (চণ্ডীমঙ্গল) ৭৭, ৭৮
লাউসেন (ধর্মমঙ্গল) ৬৫-৬৮, ৭৬
লাঢ় (রাঢ়) ৪
লাবণ্য (শেষের কবিতা) ২১২
লালন ফকির (বাউল) ১৩০
লিঙ্গানুসারী কাব্যগঠন ৭
লীলাকীর্তন ৯৫
লুই, চতুর্দশ ১৮০
লোকনিরুক্তি ১০
লোকসঙ্গীত ১২৯
লোকসাহিত্য ১৩৯, ১৫৭
লোচন দাস (বৈষ্ণব-কবি) ১০১-১০৩, ১১৩
লোর (সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী) ১৪৭, ১৪৯, ১৫২
লোর-চন্দ্রানী (ঐ)—দৌলত কাজি ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৫১
লোর-চন্দ্রানীর আখ্যান (ঐ) ১৫৪

শক্তি ১২০ , শক্তিপূজা ৬৯, ১১৯ ; শক্তি-সাধনা ১২৫ ; শক্তি-সাধনার প্রবণতা ১১৯
শচী-বিলাপ ১১২
শচীশ (চার অধ্যায়) ২১২
শবর ৩২
শবরপাদ ৩২
শব্দমিশ্রণ ১০
শরণ (লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি) ১৭
শর্মিষ্ঠা (নাটক)—মধুসূদন ১৯৮
শশিশেখর (বৈষ্ণব-মহাজন) ১১৫
শাক্ত কবিগোষ্ঠী ১২৪-১২৮, ১৩৩ ; ১৩৮ ; শাক্ত কবিতা ১৪, ১২৭ ; শাক্ত গীতি ১২৩ ; শাক্ত-তান্ত্রিক ভজন-পদ্ধতি ১৩০ ; শাক্ত দেব-দেবী ২৫ ; শাক্তধর্ম ১১৩ : শাক্ত পদাবলী ৫৩, ৭৪, ১১৫, ১১৬, ১২০-১২২, ১২৪-১২৭, ১৩১, ১৩২, ১৯০, শাক্ত পদাবলীর উৎস ১২১ ; শাক্ত সাধক ১২৮ ; শাক্ত সাধনা ১৩২
শান্তিপুর ১২
শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ ২০
শাহ সুজা ১১৯, ১৪৬
শিব ১৫, ১৬, ৫০, ৫৫, ৫৭-৫৯, ৬৪, ৬৯, ৭২, ৭৩, ৮১, ৮২, ১৩৫, ১৭০, ১৭৩, ১৭৪ : শিবঠাকুর ৫০, ৫৭ ; শিব-চরিত্র ৮১, ৮২ ; শিব-বিষয়ক পালা (পাঁচালি) ১৩২ ; শিব-মঙ্গল ৮১, ৮২ ; শিবমাহাত্ম্য ১৪ ; শিবের ধ্যানভঙ্গ-চেষ্টা ১৭০ ; শিবের পরিণয় (শিবায়ন—অন্নদামঙ্গল) ১৬৮ ; শিবের পুনর্বিবাহ ১৭০ ; শিবের ভিক্ষা সংগ্রহ ১৭০ শিবদুর্গা ৬৪, ১৭০, ১৭১,

১৭৭, ১৯০ ; শিব-পার্বতীর বিবাহ ৫৫, ৬৯
শিব, পৌরাণিক ৮১, ৮২
শিব, লৌকিক ৮১, ৮২
শিবানন্দ সেন (বৈষ্ণব-কবি) ১১২
শিবায়ন ৮১
শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র ১৬৮
শিবায়ন—রামকৃষ্ণ রায় ৮১, ৮২
শিবায়ন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য ৮২
শুঁড়ি ৩২
শুভঙ্করীর আর্যা ২৬
শূন্যতা ৩১, ৩৩ ; শূন্যতা-বোধ ৩১ ; শূন্যবাদ বৌদ্ধ ১৫
শৃঙ্গার-প্রবাহ (সদুক্তিকর্ণামৃত) ১৭, ১৯
শৃঙ্গার রস ১৯, ২১, ৪৮
শেখ ফয়জুল্লা (নাথ-সাহিত্যের কবি) ১৩৫, ১৩৭
শেখর দাস (বৈষ্ণব-পদকর্তা) ৯
শেখর রায় (রায়শেখর) ঐ ১১৩
শেরিডান ১৭৯
শেষের কবিতা (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ২১২
শৈবধর্ম ১৬
শ্যাম ১২৩, ১৩১
শ্যামদাস, দুঃখী (গোবিন্দমঙ্গল-প্রণেতা) ৯৭, ১০৬
শ্যামদাস সেন (নাথ-গীতিকার কবি) ১৩৫
শ্যামরায়ের পালা (গীতিকা) ১৬২
শ্যামা ১২৩, ১২৫
শ্যামা-সঙ্গীত ১২২, ১২৫
শ্রীঈশ্বর পুরী ৯৪
শ্রীকর নন্দী (মহাভারতকার) ৮৬
শ্রীকৃষ্ণ ১৫, ১৭, ২৮, ৪০, ৪২, ৮৭, ৯০, ৯৩, ৯৬, ৯৮, ১০৭, ১১৩, ১১৫, ১১৬
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বড়ু চণ্ডীদাস ৭, ১৫, ২০, ২৫, ৩৭-৪৩, ৪৫, ৯২
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র ১৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৯৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত—কবি কর্ণপুর ৯৯
শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী ৮৬, ৯৭
শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী (কবিরাজ) ৯৫, ৯৬, ৯৯, ১০১, ১০৪-১০৬
শ্রীকৃষ্ণবিজয়—মালাধর বসু ৩৯, ৯৭, ১০৬
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—কৃষ্ণদাস ৯৭
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—মাধব আচার্য ৯৭
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ১১৩, ১১৬
শ্রীখণ্ড ৪৮, ১১৩ ; শ্রীখণ্ড-গোষ্ঠী ১১৩
শ্রীগৌরাঙ্গদেব ৯৩, ৯৮
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম ১৪৩, ১৫১
শ্রীচৈতন্য ২৩, ৪৭, ৮৪, ৯১-৯৬, ১০১, ১০৪-১০৬, ১০৮, ১১০-১১২, ১২৯, ১৯৩, ২০১
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৯৫, ৯৬, ৯৯, ১০১, ১০৪, ১০৭
শ্রীচৈতন্যলীলা ১০৫ ; শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনী ৯২ ; শ্রীচৈতন্যের দীক্ষা-গ্রহণ ৯৪ ; শ্রীচৈতন্যের দ্বৈতরূপ ২৩
শ্রীধর দাস (সদুক্তিকর্ণামৃত-সংকলয়িতা) ১৬, ২১
শ্রীনিবাস আচার্য ৯৬
শ্রীবাচস্পতি কবি ১৫
শ্রীবাস পণ্ডিত ৯৬
শ্রীমন্ত, সদাগর (চণ্ডীমঙ্গল) ৭৫, ৭৭, ১৭১
শ্রীমন্ত মজলিস ১৪৫
শ্রীমন্ত সোলেমান ১৪৫
শ্রীমহাপ্রভু ৯৯
শ্রীরাধা ৪২
শ্রীরাধিকা ১৯
শ্রীরামপাঁচালি—কৃত্তিবাস ৮৩
শ্রীরামমঙ্গল-পাঁচালি—কৃত্তিবাস ৮, ৮৩
শ্রীসুধর্ম, আরাকান-রাজ ১৪৩, ১৪৭
শ্রীসোলেমান ১৪৫, ১৪৬, ১৫১
শ্রীহট্ট ১২
শ্রীহট্ট-অঞ্চলের কথ্যভাষা ১২

ষড়্ গোস্বামী ৯৬
ষষ্ঠীবর (মহাভারতকার) ৮৬
ষষ্ঠীবর দত্ত (মনসামঙ্গল-এর কবি) ৭৩
ষষ্ঠীবর সেন (?) ৭৩

সংক্ষেপিত শব্দ ১০
সংস্কৃত ৩, ১১, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২৩, ২৬, ৩০, ৩৭, ৪৫, ১৩৭ ; সংস্কৃত চর্যাপদের সমকালীন ১৩
সংস্কৃত কাব্য ১৬, ৩৭, ৪২, ৪৬, ৪৭ ; সংস্কৃত কাব্যাদর্শ ২০ , সংস্কৃত খণ্ডকবিতা ৩৭ ; সংস্কৃত নাট্যাদর্শ ১৯৮ ; সংস্কৃত পুরাণ ৪৩ ; সংস্কৃত শব্দ ১১ ; সংস্কৃত সাহিত্য ২০, ৩৭, ৩৮, ১৬৮

সখীসংবাদ (কবিগান) ১৩১, ১৩২
সঙ্করধ্বনি ৮
সতী ১৫৯, ১৬৮, ১৭০ ; সতীর দক্ষালয়-যাত্রা ১৭০ ; সতীর দেহত্যাগ ১৬৮, ১৭০
সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী—কাজি দৌলত ১৪৭
সত্যনারায়ণ ১১৬
সত্যপীর ১১৬, ১৩৭
সত্যপীরের পাঁচালি—শেখ ফয়জুল্লা ১৩৭
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৭৭
সদুক্তিকর্ণামৃত—শ্রীধর দাস ১৬, ১৭, ২০, ২৬, ৩০, ৩৭
সনাতন গোস্বামী, শ্রী ৪৩ ৯৬
সন্ধ্যাকর নন্দী ১৬
সন্ধ্যাভাষা ৩২, ১২৯
সন্নিকৃষ্ট অল্পপ্রাণ ধ্বনি ১০
সন্ন্যাসগ্রহণ, গৌরাঙ্গের ১১২
সপ্তপয়কর—আলাওল ১৪৪, ১৪৫
সভাপর্ব (মহাভারত) ৩
সমাক্ষর (লোপ) ৭, ১১
সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জমাল—আলাওল ১৪৪, ১৪৫
সমীভবন ৮
সরফরাজ খাঁ ১৮৩
সরস্বতী (দেবী) ১৭০
সরস্বতী (নদী) ১০৯
সরোজবজ্র ৮
সর্পদেবী ৭৪
সর্পপূজা ৬০
সর্বানন্দ বন্দ্যঘটী ৭
সহজবাদ ৩১ ; সহজযান ৩১, ৩২ ; সহজযান, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ৩২ ; সহজ সাধনা ১৩০
সহজিয়া-তত্ত্ব ৩২ ; সহজিয়াবাদ ১২৯ ; সহজিয়া-মতবাদ ১১৩ ; সহজিয়াযান, বৌদ্ধ ৩২ ; সহজিয়া-সঙ্গীত ১৬৫ ; সহজিয়া-সাধনা ১৩৬
সহদেব (ধর্মমঙ্গল-এর কবি) ৬৮
সাঁওতাল-হাঙ্গামা ১৬৪
সাজাহান, বাদশাহ ১৪৬
সাধন-সঙ্গীত .২৯
সাধ্যসাধন তত্ত্ব ৯৯
সাবিত্রী ১৫৯
সায়েস্তা (খাঁ) ১১৯
সারদা (চণ্ডীদেবী) ৮০
সারি গান ১২৯, ১৩৩
সাহিত্যপ্রকাশিকা, প্রথম ভাগ (বিশ্বভারতী) ১৩৭
সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ ১৮৬
সিংহল, সিংহল-রাজ ৭৭
সিঙ্গিগ্রাম (বর্ধমান) ৮৬
সিদ্ধাগণ ১৩৫, ১৪০
সিদ্ধাচার্যগণ, বৌদ্ধ ১৫, ৩৩, ১২৯
সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদ ৩৩
সিরাজউদ্দৌলা, নবাব ১৮৩, ১৮৪
সীতা ৮৯, ৯০, ১৪৯
সীতাকুণ্ড ৬
সীতাগুণকদম্ব—বিষ্ণুদাস আচার্য ১০১
সীতা দেবী (অদ্বৈত-পত্নী) ১০১
সীতারাম (উপন্যাস)—বঙ্কিমচন্দ্র ২০৫
সীতারাম দাস (ধর্মমঙ্গল-এর কবি) ৬৮
সুইফ্‌ট্‌ ১৭৯
সুকুমার সেন, ডঃ ২৫, ১৩৭, ১৩৯
সুকুর মহম্মদ, আবদুল ১৩৫, ১৩৯, ১৪০
সুখময় মুখোপাধ্যায়, শ্রী ৮৩, ১৩৭
সুন্দর (বিদ্যাসুন্দর) ১৪৮, ১৬৮, ১৭৬, ১৭৭, ১৯৪
সুন্দর বন ৩
সুজা, শাহ ১১৯, ১৪৬
সুফীধর্ম ১৩০, ১৫২ ; সুফী-ধর্মমত ১০০
সুব্‌ভভূমি ৪
সুভদ্রা (মহাভারত) ৮৯
সুভাষিতরত্নকোষ (কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়) ১৬, ২৬
সুভাষিতাবলী (পদ্মাবতী-আলাওল) ১৫৫
সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত ৭৩
সুলতান মামুদ ১৯২
সুশীলা (সিংহল-রাজকন্যা) ৭৭
সুহ্ম, সুহ্মদেশ ১, ৪, ২২
সূর্য, সূর্য-বন্দনা ১৭০
সূর্যমুখী (বিষবৃক্ষ) ২০৮, ২১৫
সৃষ্টিতত্ত্ব (মঙ্গলকাব্য) ৫৫
সৃষ্টিপ্রকরণ (ঐ) ৬৪
সেকেন্দরনামা—আলাওল ১৪৪, ১৪৫
সেনবংশ ৪, ১৭, ৩৩, ৫৭ ; সেন-রাজগণ ৫১ ; সেন-রাজগণের শাসন ১৪ ; সেন-রাজত্ব ৫১ ; সেনশাসন ১৬
সৈয়দ মহাম্মদ ১৪৫
সৈয়দ মুছা ১৪৫

সোনার গাঁ ১৬
সোলেমান, শ্রী ১৪৫, ১৪৬, ১৫১
স্কট ২০৪
স্টুয়ার্ট-বংশীয় রাজতন্ত্র-যুগ ১৭৯
স্টুয়ার্ট, রাজা ১৭৯
স্মৃতি, স্মৃতিশাস্ত্র ৯, ৩৭, ৩৮, ৪৫, ৭৮
স্বপ্নদর্শন (পদ্মাবতী—আলাওল) ১৫৫
স্বরভক্তি ৭, ৮
স্বরসংগতি ৮, ১০
স্বরাগম ৮
স্বর্ণগোধিকা (চণ্ডীমঙ্গল) ৫৫, ৭৫

হব্‌স্‌ ১৭৯
হর ১৭, ৪৫, ৮০, ৮১, ১৭১
হর-গৌরী ১৭, ৪৫ ; হর-পার্বতী ৮১
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ৩০
হরি ১৮, ২৯, ১৭১
হরিচরণ দাস (বৈষ্ণব-কবি) ১০১
হরি দত্ত, কানা (মনসামঙ্গল-এর কবি) ৫৬, ৭০, ৭১
হরি হোড় (অন্নদামঙ্গল) ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৮৭
হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী (ধর্মমঙ্গল) ৬৭
হরু ঠাকুর, কবিয়াল ১৩১, ১৩২
হরেন্দ্রনারায়ণ (রামায়ণ-রচয়িতা) ৮৫
হাওড়া জিলা ১২, ১৬৮
হাওড়া-হুগলীর কথ্যভাষা ১২
হাড়ি ১৪
হাড়িপা, সিদ্ধযোগী ১৪০
হার্মাদ জলদস্যু ১৪৬
হাল ২৪
হাস্যরস ১৭৯
হিন্দী ১৪৪
হিন্দু ৩৭, ৬০
হিন্দু-উৎপীড়ন ১০০
হিন্দু কলেজ ১৯৬ ; ঐ প্রতিষ্ঠা ১৯৬
হিন্দু তান্ত্রিকতা ১৮৬
হিন্দু-তান্ত্রিক ভাবাদর্শ ৫২
হিন্দু-দর্শন ৩১, ৩৫, ১২৯
হিন্দু-দেবদেবী ৮০
হিন্দুধর্ম ১৬, ৩১, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৫৮, ৫৯, ৬৯, ৮৭, ৮৯, ১২৯, ১৯৬
হিন্দুধর্ম, তান্ত্রিক ৬০
হিন্দু-পুরাণ ১৫২
হিন্দুধর্ম, পৌরাণিক ৩২, ৬০
হিন্দুধর্ম-পৌরাণিক ধর্ম ১৩৫
হিন্দু-বৌদ্ধ-বিদ্বেষ ৩৮
হিন্দু ভক্তিবাদ ১৪৭
হিন্দু-সাধনপ্রক্রিয়া ৩১
হিমালয় ৩০, ১৭০
হীরা ২০৮
হীরা মালিনী ১৫০, ১৭৮, ১৮৯
হুগলী ১২
হুসেন শাহ, সুলতান ৭১, ৮৫, ১৪২
হৃদয়রাম (ধর্মমঙ্গল-এর কবি) ৬৮
হেস্টিংস ৬০
হোমার ১৯৯, ২০০, ২০২
হোসেন শাহ্‌ ১৪২
হ্যাপ্‌লোলজি [Haplology : সমাক্ষর লোপ] ১১